TGPA—18-7-97—48,000+54,000—J. C. No. 5446+6426

রানীকাহিনী

সুভাষ সমাজদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

RANIKAHINI

By

SUBHAS SAMAJDAR

RS. FORTY ONLY

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ

গৌতম রায়

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন

কলকাতা ৭০০০১২

৪০ টাকা

ফুল ('পুষ্প')

কল্যাণীয়াসু

দাদাভাই'

রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।

—রবীন্দ্রনাথ

কৈফিয়ত

রাজা রাণীর কাহিনীর প্রতি মানুষের কৌতুহল স্মরণাতীত কালের। কিন্তু রাজা রাণীরা কি শুধু কিংবদন্তি আর রূপকথাতেই সজীব হয়ে আছে, মাটির এই পৃথিবীর কোন দেশে কি আজও আছে রাজা কি রাণী? ইতিহাসে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ধূসর ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের তুলে এনে রূপকথার রহস্যময় দুর্গ থেকে রাজা রাণীদের উদ্ধার করে তাদের একান্ত অন্তরঙ্গ জীবনের কোন ইতিবৃত্ত কি লেখা যায় না—এই চিন্তা যখন মনের ভেতরে আনাগোনা করছিল ঠিক তখন এল পরিবর্তনের পূজাসংখ্যায় লেখার সাদর আমন্ত্রণ। বর্তমান এই গ্রন্থটি প্রকাশের শুভমুহূর্তে মনে পড়ছে পরিবর্তনের সম্পাদক স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি আমার মনে এই বিষয়টি নিয়ে লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। আলোচ্য এই গ্রন্থে আছে শুধু ইংল্যাণ্ডের তিন রাণীর জীবনকাহিনী। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, যিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বর্তমানে সমাসীন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর স্বর্ণযুগখ্যাতা চিরকুমারী রাণী প্রথম এলিজাবেথ। এই তিন রাণী—তিন মানবী, কারো জায়া, কারো জননী, কারো বা প্রেয়সী। গভীর মানবতাবোধ, মহত্ত্ব ও উদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের পাতাগুলো আলো করে বিরাজ করছেন। ন্যাশানাল লাইব্রেরীর অনেক দুষ্প্রাপ্য (Rare) বই ও পুরনো পত্রপত্রিকার স্তূপ ঘেঁটে রাণীদের ব্যক্তিগত জীবনের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। ইত্যাদি প্রকাশনীর অনুজপ্রতিম পবিত্র মুখার্জী, ন্যাশানাল লাইব্রেরীর আরতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অশ্বিনী মণ্ডল এবং রণজিৎ সরকার অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন, তাঁদের সেই সহৃদয়তাকে গতানুগতিক ধন্যবাদ দিয়ে খর্ব করতে পারব না। নমস্কারান্তে—

সুভাষ সমাজদার

গভীর রাত্রি।

স্তব্ধ নির্জন বনভূমি। দূরে-বহুদূরে কালিঢালা দিগন্তের কোল থেকে গা টেনে টেনে চাঁদ উঠছে। আর ধীরে ধীরে ফিকে জ্যোৎস্নার আলোয় মায়াময় হয়ে উঠছে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য।

থেকে থেকে ভেসে আসছে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চিৎকার। শোনা যাচ্ছে হায়েনার শুকনো খটখটে হাসির শব্দ। আর একটু পরেই চাঁদ আরও উপরে উঠে আসবে। জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলো অবারিত করে দেবে বনভূমির অপরূপ শোভা। আর তখুনি তারা নিশিরাতের আলো-ছায়া গায়ে মেখে গাছ-গাছালির আড়াল থেকে একে একে বেরিয়ে আসবে—আসবে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার আর বুনো হাতীর দল। নেচে নেচে আসবে হরিণের ঝাঁক। কেনিয়ার অ্যাবারডেয়ারের এই ঘন জঙ্গলে গরিলা কি হিপোপটেমাস দেখতে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

নির্জন রাত্রির আলো-আঁধারিতে জন্তুজানোয়ারের খেলা দেখবেন বলেই তিনি বসে আছেন। বসে আছেন ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী। তাঁর দীঘল দেহে স্বাস্থ্য আর যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। তাঁর টলটলে গভীর নীলাভ চোখ দুটো ঢাকা আছে ফিল্ড গ্লাসে। পরনে রঙীন স্ল্যাকস। গায়ে হলুদ রঙের সার্ট।

তিনি একটি খুব উঁচু ডুমুর গাছের ওপরে মাচায় বসে আছেন অধীর আগ্রহে। মাচার নিচেই গভীর জঙ্গলের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে সাগানা নদী। চারিদিকের মেটে মেটে অন্ধকারে নদীর সংকীর্ণ রূপালী রেখা ভোঁতা ছুরির মত ঝিকমিক করছে।

এই জলাশয়ে-ই তারা আসতে ভালবাসে। আসে। বিশেষ করে চাঁদনী রাত্রে। নদীতে নেমে জল খায়। জল তোলপাড় করে খেলা করে। কিন্তু—

প্রহরে প্রহরে রাত বাড়ছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় থৈ থৈ করছে। কিন্তু তারা কোথায়? তবে কি তিনি আসবেন বলেই তারা—এসব ভাবতে ভাবতেই নিচের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল। আর মড় মড় শব্দ করে গাছপালা ভেঙে দুমড়ে বেরিয়ে এল একটি দুটি নয়—ছেচল্লিশটি বুনো হাতী।

লাইট—প্লী—জ—জঙ্গলের ঘন অন্ধকারের ভেতর থেকে চাপা উত্তেজিত

কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল অনেকগুলো সার্চ লাইট। আলোয় আলোময় হয়ে উঠল সেই দূর প্রসারিত নিবিড় অরণ্য।

হঠাৎ জোরালো আলোর ঝলকে হাতীগুলো হকচকিয়ে গেল। আর কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে যখন দেখল কোথাও তার কোন শত্রু নেই—শুধুই আলোয় ঝলমল করছে বনপ্রান্তর তখন তারা একে একে হেলেদুলে এগিয়ে এল। আর তারপরেই ঝাঁকে ঝাঁকে কতরকমের বন্যজন্তু যে সেই আলোয় আলোময় বনপ্রান্তরে এসে খেলা করতে লাগল তা বলে শেষ করা যায় না। ৮

সেই অসামান্য সুন্দরী যুবতী খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এক সঙ্গে এত অজস্র আর অগণন জন্তুজানোয়ার কখনো কোথাও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। সাগানা নদীর ধারে সেই গহন আরণ্যক পরিবেশে জন্তু-জানোয়ারদের খেলা দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। আর একটু একটু করে অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর বাবার গম্ভীর মুখখানা। অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বললেন এই দৃশ্য বাবা দেখলে যে কী খুশি-ই হতেন। চোখ দুটোকে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে নিয়ে গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ এক ঝাঁক বেবুন ঠিক সেই তরুণীর সামনে এসে নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লাগল। তিনি তাদের দিকে কতগুলো মিষ্টি লাল আলু ছুঁড়ে দিলেন। তারা খুশিতে ডগোমগো হয়ে কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল।

আবার ঘনজঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে দারুণ আলোড়ন তুলে এল আরও একদল বুনো হাতী। এল গুটি কয়েক গণ্ডার। অদূরে বড় বড় গাছের নীচে ঘন জমাট অন্ধকারে বাঘের হিংস্র দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে।

তীব্র একটা অস্থিরতায় তাঁর হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল। সারা দেশে মেয়েদের ভেতরে রাইফেল ছোঁড়ায় তাঁর আর কোন জুড়ি নেই। অত্যন্ত নিখুঁত-ভাবে ডবল ব্যারেলের রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তিনি অনেক শিকারও করেছেন।

শুধু কি শিকার? খুব তেজী ওয়েলার কি আরবি ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন মাইলের পর মাইল। ঘোড়ায় চড়ায় খুব ওস্তাদ জকিরাও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। ক্লাইম্বিং বা পাহাড়ে ওঠাও তার দারুণ নেশা। বরফের উপরে পা ফেলে ফেলে তিনি একেবারে পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতে পারেন কিন্তু—

যত নেশাই তাঁর থাক, যত শখই তাঁর হোক, এখানে তাঁর হাত পা বাঁধা। এখানে তিনি গভীর শ্রদ্ধা আর সম্মানের এক সুরক্ষিত দুর্গে বন্দিনী। তিনি যাই করুণ না কেন, অ্যাবারডেয়ারের এই বনে শিকার করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। শোভনও নয়। কেন না—

তিনি কেনিয়ার মাননীয়া রাজ অতিথি। তাই বাধ্য হয়েই অত্যন্ত নিরীহ আর অসহায় দর্শকের মত ডমুরগাছের মগ ডালে বসে বসে জানোয়ারদের অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ দু চোখ ভরে দেখতে লাগলেন।

সেদিন সেই গভীর রাত্রে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বসে আবার তাঁর বাবার কথা মনে হল। কেন যে আজ বার বার তাঁকে মনে পড়ছে! তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ শিকারী। শিকারের কথায় তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীব্র উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর আগেই এই আফ্রিকার কোন ফরেস্টে একটা পাগলা হাতী শিকার করেছিলেন। সেই হাতীর দুটো বড় বড় দাঁত এখনো শোভা পাচ্ছে তাদের বসার ঘরে। শুধু কি হাতী! সেই ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে সাজানো রয়েছে থরে থরে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রঙের চামড়া—বাঘের, সাপের, হরিণের, গোসাপের—এসবই তাঁর বাবার অসামান্য শিকার-নৈপুণ্যের কীর্তি! একসঙ্গে এত জন্তুজানোয়ার দেখলে তিনি কি নিজেকে সংযত রাখতে পারতেন?

পেরিয়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষ হয়ে আসে রাত। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই সেই তরুণীর। সার্চ লাইটের আলোয় আলোকোজ্জ্বল সেই অরণ্যে জন্তু-জানোয়ারের বিচিত্র সমাবেশের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন। কিন্তু—

তিনি জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন না—বেশ কয়েক জোড়া চোখের সতর্ক দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে। দূর বিদেশের মহামান্যা অতিথি! হঠাৎ কোন বিপদ-আপদ না হয়। তাই তাঁর অলক্ষ্যে তাঁকে ঘিরে এই বিনিদ্র প্রহরা। কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন জানোয়ারের খেলা শখ করে কিছুক্ষণ দেখেই তিনি ঘুমুতে যাবেন। কিন্তু—

কী আশ্চর্য! সারা রাত জেগে ঠায় বসে উনি জানোয়ারের খেলা দেখতে লাগলেন। চোখের ফিল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, দূরে সাগানা নদীর ধারে ঘনসবুজ ঘাসের জমির ওপরে এক ঝাঁক রাজহংস নিজেদের ভেতরে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। সেই বিচিত্র আর অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। কিন্তু—

এ কী! যুদ্ধে যে রাজহাঁসটা হেরে গিয়েছে, সে অমন এক পা এক পা করে পিছু হটছে কেন? হাঁসটি কি তাহলে আহত হয়েছে! এসব কথা ভাবতে ভাবতেই সেই জখমী হাঁসটা জলের ধারে গিয়ে শুয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। হাঁসটার প্রাণের স্পন্দন কি স্তব্ধ হয়ে গেল! অজানা একটা ব্যথায় তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠল। আর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, কাল সকালেই তিনি হাঁসটির খোঁজে লোক পাঠাবেন। কিন্তু—

তিনি জানতেন না। কল্পনাও করতে পারেননি এর চেয়ে অনেক—অনেক গুণে বড় একটা আঘাত তার জন্যে অপেক্ষা করছে--

হ্যালো—ডার্লিং—একটি উচ্ছ্বসিত ভরাট গলার আওয়াজে চমকে উঠলেন সেই রূপসী তরুণী।

হাউ স্ট্রেঞ্জ! তুমি বনের জন্তুজানোয়ার দেখতে দেখতেই রাত ভোর করে দিলে। বলতে বলতেই সস্নেহে তাঁর পিঠে হাত রাখলেন দীর্ঘকায় এক যুবক। তাঁর খাড়া নাকে লম্বা ধারালো মুখের রেখায় রেখায় কঠোর পৌরুষের আভাস।

তুমি ঘরে যাবে না?

চলো—

দুই

পূবের আকাশে ভোরের রেখা।

অ্যাবারডেয়ারের নিবিড় বনভূমির জমাট অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। শুরু হয়েছে গাছে গাছে পাখিদের একটানা ঐকতান।

তাঁরা দুজন।

দুজন হাতে হাত রেখে খুব সন্তর্পণে ধীর পায়ে এলেন সেই ডুমুর গাছের বিশাল মাচারই এক পাশে একটি সুদৃশ্য কুটিরে।

ট্রিটপস।

তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর প্রীতির উপহার হিসেবে কেনিয়াবাসীরাই তৈরি করে দিয়েছে গাছের ওপরে এই কটেজ—ট্রিটপস্!

সারা রাত জেগেছো। এখন একটু বিশ্রাম করবে না?

বলছো কি তুমি! তাঁর গভীর নীল দুটো চোখে মিষ্টি হাসি ঝিকিয়ে উঠল। স্নিগ্ধ আর মৃদু কণ্ঠে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বললেন সেই তরুণী, কেনিয়াতে আজই আমাদের শেষ দিন—ঘরে বসে রেস্ট নিয়ে দিনটাকে নষ্ট করে দেব—

রিয়েলি অ্যামেজিং তাঁর সঙ্গী পুরুষটি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হেসে হেসে বললেন, তোমার এই স্পোর্টিঙ স্পিরিটের জন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে—বলেই কেমন মোহাচ্ছন্ন চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

ঠুন—ঠুন—স্মৃতির কপাটে কড়া বাজতে থাকে। আস্তে আস্তে দরজা খুলে যায়। আর সেই ঘরের অন্ধকারের গহ্বর থেকে ভেসে আসে এক একটা দৃশ্য—কেমন ঝাপসা। ম্লান। বিবর্ণ।

আর সময়ের ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে এই ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর ভেতরে এক হাস্যোচ্ছ্বল কিশোরীর আদল ফুটে ওঠে। প্রথম তাকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া তাঁর ক্ষীণ তন্বী দেহটা। কেমন শান্ত, সুডৌল মুখ। বড় বড় গভীর নীলাভ দুটো চোখে হাসি ঝিকামক করছে।

১৯৩৯ সাল। সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ইউরোপের দেশদেশান্তরের প্রায় প্রত্যেকটি যুবককেই যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে। তাঁকেও যেতে হলো। যেতে হলো ডার্টমাউথের রয়্যাল নেভি কলেজে। সেখানে রাজকীয় নৌবহরের শিক্ষানবীস হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল।

এই নেভিতে এসেই তাঁর জীবনে একটা বিরাট ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল তা না হলে কোথায় কত দূরের এক দেশে তাঁর জন্ম। আবছা মনে পড়ে গ্রীসের সুদূর নির্জন দ্বীপ করফুতে তাঁর নিজেদের বাড়ি—মনরেপা ভিলা। এইখানে—এই বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিশ্চিন্তে বাস করতে পারেনি। ভাগ্যদোষে জন্মের পর কোনরকমে একটা বছর কাটতে না কাটতেই রাজরোষে নির্বাসিত হলেন তাঁর পিতৃদেব। অমনি তাঁদের ওপর দুর্ভাগ্যের ঝড় ভেঙে পড়েছিল। শুরু হয়েছিল যাযাবর জীবন। কখনো ফ্রান্স, কখনো ইংল্যাণ্ড, কখনো স্কটল্যাণ্ড আরো কত দেশে দেশে ভেসে ভেসে বেড়াতে হয়েছিল।

শোকে তাপে মা-র মাথার গোলমাল দেখা দিল। সেই অবস্থার ভেতরই বাবা একে একে তিন-তিনটি বোনের বিয়ে দিলেন। আর তিনি কাকা জ্যাঠাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে উনছবৃত্তি করে দিন কাটাতে লাগলেন। বহু ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের গর্ডন টাউনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। হেডমাস্টারমশাই মিঃ কার্ট হ্যাম তাঁর সুদূর বাল্যকালের গুরু—তিনি কঠোর পরিশ্রমে ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ সাধনেরও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন। মাস্টারমশাই প্রায়ই তাঁর নাম করে বলতেন

ওর—মত ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা আর কর্তব্যজ্ঞান স্কুলের কোন ছেলের নেই। ও ভবিষ্যতে মস্ত জননেতা হবে। কিন্তু—

কিছুই হয়নি। কিছুই কাজে লাগল না। ছোটমামা বললেন—খুব শীগগীর-ই যুদ্ধ বাধছে—মহাযুদ্ধ—নেভিতে চলে যাও— ৮

চলে যেতে হল নেভিতে। হবেই তো। না গেলে তার জীবনের ধারাটা একেবারেই পালটে যাবে কি করে? মানুষের জীবন যে 'প্রিডেস্টিণ্ড', আগে থেকে সব ঠিক করাই থাকে।

যে যতই বলুক। অদৃষ্ট আর পুরুষাকারের ভেতরে যত ঝগড়াই থাক। কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন। বোধ হয় কোন দার্শনিকের উক্তি—90% is to take and only 10% is to make. শতকরা নব্বই ভাগ সিচুয়েশানই মানুষকে প্রশান্ত স্থৈর্য এবং সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় বা Face করতে হয়। আর মানুষ নিজে পরিশ্রম করে এবং বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে করতে পারে মাত্র শতকরা দশভাগ।

তাঁর কথাই ধরা যাক না। নেভিরই কোন বড় বা ছোট কর্মচারী হয়েই তো তাঁর জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিচুয়েশান তাঁকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। এখন থাক সে সব কথা।

ডার্টমাউথের রয়্যাল নেভি কলেজে বেশ মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলেন। খেলাধুলো এবং নেভির্ শক্ত শক্ত দৌড়ঝাঁপের কাজে তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না। তিনি কলেজে বেস্ট ক্যাডেটের প্রাইজ পেয়েছিলেন। সোনার মেডেলের ওপরে খোদাই করে লেখা ছিল এই কথাগুলো বেস্ট অলরাউণ্ড ক্যাডেট—

তার পরে যা হয়—যা স্বাভাবিক তাই হলো। নেভির কাজে উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ। তখন তাঁর স্বপ্নও নেমে এসেছিল। রঙীন স্বপ্ন—রাজকীয় নৌবাহিনীর অনেক অনেক বড় অফিসার হয়েছেন তিনি। কিম্বা কোন রণপোতের অধ্যক্ষ বা অ্যাডমিরাল হয়ে নৌযুদ্ধে অসামান্য সাফল্যের জন্য সারা পৃথিবী তাঁর নামে ধন্য ধন্য করছে। কিন্তু—

কিছুই হয়নি। নিয়তি নির্মম হাতে শ্লেটের লেখার মত মুছে দিয়েছিল সেই সব স্বপ্ন। ডেস্টিনি অর্থাৎ অদৃষ্ট তাঁকে নেভির উদ্দাম অবারিত জীবন থেকে টেনে নিয়ে এসেছিল এক অদ্ভুত বিচিত্র পরিবেশে।

আর তিনি যে নেভির অভ্যস্ত জীবন থেকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছিটকে পড়বেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে—সেই অঘটনেরও আভাস স্পষ্টই তার চেতনার ভেতরে উপলব্ধি করেছিলেন। আর—

তা না হলে নেভির ক্যাডেটের সেই কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা কঠোর জীবনের অন্ধকারে রামধনুর নানা রঙের ঝিলিমিলি ফুটে উঠবে কেন—কেন আলোড়িত হয়ে উঠবে তাঁর আঠারো বছরের উথালপাথাল যৌবন !

হঠাৎ একদিন লণ্ডন থেকে এল এক খুব জরুরী টেলেক্স ম্যাসেজ—হিজ এক-সেলেন্সি কিং অফ ইংল্যাণ্ড ডার্ট মাউথের রয়্যাল নেভী কলেজ ভিজিট করতে আসছেন। সঙ্গে আসছেন তাঁর রাণী। আর দুই রাজকুমারী।

কলেজে তো একেবারে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। যেদিন তাঁরা আসবেন তার দু।দন আগে থেকে সহস্র আলোর মালা পরে রূপসী সেজে বসে রইল বিশাল সেই কলেজ। কিন্তু—

রয়্যাল পার্টি কলেজে পৌছতে না পৌছতে চিকেনপকস বা জলবসন্ত এবং তার সঙ্গে মামসও দেখা দিল ক্যাডেটদের ভেতরে। কলেজ কর্তৃপক্ষ পড়ে গেল দারুণ মুশকিলে।

রাজা ও রাণী অফিসিয়্যাল ভিজিটে এসেছেন। প্রোটোকলের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের কলেজ কম্পাউণ্ডে থাকতেই হবে। কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেমানুষ দুই রাজকুমারীদের তো মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচাতে হবে—

নেভি কলেজে তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল। তাই এই সমস্যায় তাঁরই ডাক পড়ল। একদিন দুদিন কি এক মাস দু মাস নয় চার-চারটি দশকের ধুলো সেই সব রঙীন বিভ্রমের উজ্জ্বল দিনগুলোর স্মৃতিকে এতটুকু ম্লান কি বিবর্ণ করতে পারেনি।

তাঁর সেই ছোটমামা যিনি তাঁকে এই নেভি কলেজে ভর্তি হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই তখন মহামান্য রাজার অ্যাডিকং ছিলেন। তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, শোনো, তোমাকে একটা কঠিন কাজের ভার দিচ্ছি—তুমি বোধহয় শুনেছ—রাজকুমারীদের আর তাঁদের গভর্ণেসকে আলাদা একটা বাড়িতে রাখা হচ্ছে। সেখানে কিন্তু তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমার, একটু থেমে কি যেন ভেবে আবার বললেন, দেখো—এমন কিছু করো না যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয়- -

তুমি এত কি ভাবছো বলো তো ?

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন সেই একত্রিশ বছরের যুবক। আর অমন কঠোর ব্যক্তিত্বের আভাসে উজ্জ্বল মুখখানাতে যেন লজ্জার ছায়া পড়ল।

বই—না না—কিছু না তো—যেন ইচ্ছে করেই দ্রুত সপ্রতিভকণ্ঠে বললেন। আর একটু থেমে যেন পরিস্থিতিটাকে সামলে নিতেই আবার বললেন, আরে কী

আশ্চর্য! তুমি কি আবার বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছো—আরও কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

কী আশ্চর্য আর অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। দীর্ঘ তন্বী দেহটাকে আবৃত করেছে রক্তবর্ণ ভেলভেটের জামায়। পরনে কালো রঙের জিনসের ব্রীচেস। দুটো পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা গামবুট। বাতাসে উড়ছে ঢেউ খেলানো বাদামী চুল। গভীর নীল-দুটো চোখে হাসি ঝিকমিক করছে।

হঠাৎ তাঁকে দেখলে মনে হয়, রোমের পৌরাণিক কাহিনীর শিকারের দেবী ডায়না-ই যেন আবির্ভূত হয়েছেন ডুমুর গাছের ওপরে এই ঘর ট্রিটপসে।

হাঁ করে অমন কি দেখছো!

তোমাকে রিয়েলি অদ্ভুত দেখাচ্ছে—

আচ্ছা তুমি কি বলো তো—সব ভুলে যাও ডার্লিং। আজ আমাদের মাছ ধরার প্রোগ্রাম আছে না? বলেই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন সেই যুবতী।

সাগানা নদীর তীরে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে এলেন। সেখানে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসলেন। মাছ ধরাতে ছোটবেলা থেকেই তাঁর দারুণ নেশা। বাধ্য হয়েই গুটি গুটি যুবকও তাঁকে অনুসরণও করলেন। তিনিও আর একটা ছিপ ফেলে তাঁর পাশে বসে হাসতে হাসতে বললেন, অলরাইট, চলুক কম্পিটিশান—কে কার চেয়ে বেশি মাছ মারতে পারে—

ঝরণার জলে সকালের রোদ ঝিলমিল করছে। চারদিকের অরণ্যভূমির গাছে গাছে পাখি ডাকছে। এসব দিকে তাঁদের কোন লক্ষ্যই নেই। তাঁরা তন্ময় হয়ে মাছ ধরছে।

সেই সুন্দরী তরুণী এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা মাছ ধরে ফেলেছেন। এমন সময় ঠিক ভগ্নদূতের মত এল সেই লোকটি যাকে আহত রাজহাঁসটির খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সে মাথা নিচু করে অস্পষ্ট গলায় বলল, ম্যাডাম, সেই রাজ-হাঁসটা মারা গেছে—

উঃ গড! তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর সুডৌল মুখে। কেন যেন নামহীন একটা আশঙ্কায় তাঁর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল। বেশ কয়েক দিন ধরেই কে জানে কিসের একটা অস্বস্তি সর্বক্ষণ মনের ভেতরে কাঁটার মত বিঁধছে। বাবা ভালো আছেন তো!

ওকি ডার্লিং—তুমি ছিপ গুটিয়ে ফেললে যে—

কোন কথাই বললেন না সেই তরুণী। তাঁর মুখে থম থম করছে বিষাদের ছায়া। চাপা কান্না থমকে রয়েছে তাঁর গভীর নীল দুটো চোখে।

তাঁরা দুইজনেই আস্তে আস্তে ট্রিটপসে ফিরে এলেন।

একজন ম্লান। বিষণ্ণ আর একজন বিরক্ত। থেকে থেকে হঠাৎ কি যে হয় ওর। মনে হয় যেন ওর বুকের ভেতরে বসে কেউ সুইচ টিপে ওর খুশির আলোয় ঝকমকে চেহারাটাকে অন্ধকার করে দেয়।

একটা নাম-না-জানা পাখি হঠাৎ কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে ডানা ঝটপট করে উড়ে চলে যায় দূর দিগন্তে। পাখিটার আর্ত চিৎকারে কেমন শিউরে ওঠেন তরুণী। অস্ফুটস্বরে বলেন তাঁর স্বামী সেই যুবককে—লণ্ডনের জন্য মন কেমন করছে, কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভেবে আবার প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমার সেক্রেটারীর কাছে একটু খোঁজখবর করে দেখো তো—লণ্ডনের কোন খবর আছে কি না—

কিন্তু তাঁদের আর উদ্যোগী হয়ে কিছু জানতে হলো না। কোন প্রয়োজনই হলো না। কেন না ঠিক সেই সময় হাজার হাজার মাইল দূরে এক আসন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনার পটভূমি অত্যন্ত ঘনঘোর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার—ডুমুর গাছের ওপরে সেই ট্রিটপস কুটিরটি ছিল খুবই ছোট। সেই তরুণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অন্যান্য অনুচরদের সেখানে থাকার জায়গা ছিল না। তাঁরা থাকতেন ট্রিটপসের কাছেই সাগানা নদীর ধারে একটি সুদৃশ্য হোটেলে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের পর কেন যেন সেক্রেটারী মেজর চার্টারিজের মনে হলো, এতক্ষণে রাজকুমারী নিশ্চয়ই মাছ ধরে ফিরে এসেছেন—কোন জরুরী কাজ থাকতে পারে—

তিনি ট্রিটপসে যাবেন বলে গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় একটা লোক এসে বলল, স্যার—আপনি একবার অনুগ্রহ করে টেলিফোন বুথে আসবেন?

কেন, আমার টেলিফোন আছে?

আসুন তো একবার—

লোকটা মনে হয় কেনিয়ার সরকারী কর্মচারী। কথাবার্তা কেমন রহস্যময়।

চার্টারিজ ঝড়ের বেগে টেলিফোনের ঘরে এলেন। না কোন রিসিভারই তো নামানো নেই। এমন কি বুথেও কোন তো জনপ্রাণী নেই। অদ্ভুত একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করছে ঘরটা। শুধু পি. বি. এক্স বক্সের লাল, নীল সবুজ আলো জলা ফোকরে ফোকরে টেলিফোনের তারগুলো বিষাক্ত সরীসৃপের মত দুলছে।

বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্তিতে জ্বলে যাচ্ছেন। যে লোকটা ডেকে

নিয়ে এল সে-ই বা কোথায় গা-ঢাকা দিল! যখন ফিরে যাবেন ভাবছেন ঠিক তখন টেলিফোন বুথের ভারী পর্দা ঠেলে এলেন এক ভদ্রলোক। ঘাড়ে ক্যামেরা। হাতে নোটবুক। মনে হলো, কোন কাগজের রিপোর্টার—

স্যার, একটা খবর—

আপনি কে?

কোন কথা বলল না লোকটা। বলতে পারল না। কেন যেন তার মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা। কাঁপা কাঁপা হাতেই ফুলপ্যাণ্টের হিপপকেট থেকে বের করল তার সেই আইডেন্টিটি কার্ড—চিফ স্টাফ রিপোর্টার—'ইস্ট আফ্রিকান স্ট্যাণ্ডার্ড!'

থ্যাঙ্ক ইউ—বলুন কি বলবেন? ✓

রয়টার থেকে লণ্ডনের একটা খবর ছিল, কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

লণ্ডন থেকে! কি—কি খবর, রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করে উঠলেন। তীব্র উত্তেজনায় ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগলেন মেজর চার্টারিজ।

কোন কথাই বলছে না স্টাফ রিপোর্টার। বলতে পারছে না। চেষ্টা করেও পারছে না। যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

আরে কী আশ্চর্য! বলুন—রাগে উত্তেজনায় ধমকে উঠলেন মেজর।

রাজকুমারী এসেছেন বিদেশে আর সেই সময়—বিড় বিড় করে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রিপোর্টার। তার চোখে কেমন দিশেহারা আর অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল।

কি কি বলছেন ফিস ফিস করে, মেজরের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠল। আর যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চিৎকার করে বললেন, কেন—কেন—আপনি সাসপেন্স ক্রিয়েট করছেন—

আপনাদের রাজা মারা গেছেন।

কি—কি বললেন, জখমী পশুর মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মেজর—হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দি সিক্সথ!

রয়টারের মাধ্যমে আমাদের কাগজের নাইরোবির অফিসে খবরটা এসেছে—

মেজরের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে চললেন সাগানা নদীর ধারে আর একটি সুদৃশ্য হোটেলে। সেখানে আছেন রাজকুমারীর স্বামী ডিউক অফ এডিনবরার সেক্রেটারী লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার মাইকেল পার্কার। যদি তাঁর কাছে ডিটেলস কোন খবর এসে থাকে—

॥ তিন ॥

সেই দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী।

সেদিন পৃথিবীর সভ্যতা থেকে অনেক—অনেক দূরে আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রদেশে অ্যাবারডেয়ারের গহন অরণ্যেই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক নতুন পটক্ষেপণ হয়েছিল। কিম্বা বলা যেতে পারে সারা দুনিয়ারই কমনওয়েলথের দেশগুলোর-ই ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু—

আশ্চর্য! লণ্ডন কি লিভারপুল বা নিউ ক্যাসেল কি ব্রিস্টল, ইংল্যাণ্ডের কোন বড় জনবহুল শহরে নয়। কোন মহানগরীর সুদৃশ্য ও বিশাল হলঘরের আলোকজ্জ্বল মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোতে নয়—ইতিহাসের সেই চাঞ্চল্যকর বৈপ্লবিক ঘটনাটির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল আফ্রিকার সেই নিবিড় বনভূমির নিভৃতে। হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিতান্তই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর আর অনাড়ম্বরভাবে। কিন্তু—

ভয়ানক সেই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছনোর পর ঠিক কি হয়েছিল, কেমন করে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেই দুটো হাস্যোচ্ছ্বল তরুণ-তরুণী আর কি করে দুটো উদ্দাম আর অবারিত প্রাণের আবর্ত মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তাঁরা চোখের পলকে খুব গুরুতর এক কর্তব্যভার আর অপরিসীম দায়দায়িত্বের দুর্ভেদ্য কারাগারে চিরকালের মত বন্দী হয়ে গিয়েছিল—সেসব জানতে হলেঃ আবার চলে যেতে হয় সাগানা নদীর ধারে সেই বনে ডুমুরগাছের ওপরে সেই কুটির—ট্রিটপসে।

মেজর চ্যার্টারিজ গাড়ি ছুটিয়ে চললেন কম্যাণ্ডার পার্কারের হোটেলে—যদি তাঁর কাছে কোন খবর এসে থাকে।

পার্কার সাহেবকে বলতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজিস্টারের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লণ্ডন ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন।

না। কোন অ্যানাউন্সমেণ্ট তো হচ্ছে না। তবে বি. বি. সি-র অর্কেস্ট্রায় এক গভীর করুণ সঙ্গীতের সুর বুকফাটা হাহাকারের মত অবিরাম বেজে চলেছে।

তাঁদের আর বুঝতে বাকি রইল না—নিশ্চয়ই একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। কিন্তু তাঁরা সেই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে বসে জানতে পারলেন না—পৃথিবীর দূর দূরান্তরের দেশে দেশে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করে শোকবার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। আর আলোড়িত হয়ে উঠছে পূর্ব গোলার্ধের তিন তিনটি মহাদেশ।

কিন্তু সেই রূপবতী রাজকুমারী যাঁকে কেন্দ্র করে একদিন ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হবে, সেই মুহূর্তে তিনি যেখানে ছিলেন সেই পূর্ব আফ্রিকা আর দক্ষিণ ইথিওপিয়ার সীমান্তে এবং ভারত মহাসাগর সন্নিহিত দেশ—সেই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির সাধারণ মানুষের চলমান জীবনযাত্রা খুব স্বাভাবিকভাবেই চলছিল, যেমন চলা উচিত। শুধু কেনিয়ার গভর্ণর ছিলেন না রাজধানীতে। তিনি তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে ট্রেনে মোম্বাসার দিকে পাড়ি দিচ্ছিলেন।

রাজভবন ছিল জনশূন্য। শুধু লেটারবক্সে এসে জমছিল রাশি রাশি টেলিগ্রাম আর প্রাইভেট কারে, স্কুটারে পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টার এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা দলে দলে আসতে শুরু করেছিল গভর্নরস হাউসে। তাঁদের প্রত্যেকের একটি—একটি মাত্র-লক্ষ্য—হিজ একসেলেন্সী কিং অফ ইংল্যাণ্ড জর্জ দি সিক্সথের মৃত্যুর কনফারমড খবর। সেই একই উদ্দেশ্যে ছুটে এলেন ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারী আর ডিউকের দুই সেক্রেটারী।

মেজর চ্যাটারিজ।

লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার পার্কার।

স্বল্প আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনি করে প্রতিটি টেলিগ্রাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হলেন রাজার মৃত্যুসংবাদ নির্ভুল! কিন্তু—

আশ্চর্য! সরকারী প্রেস বুলেটিন আসা দরকার। দরকার ছিল বাকিংহাম প্যালেস থেকে সরাসরি একটা খবরের। আর সেইসব নিউজ তো তাঁদের কাছেই সবচেয়ে আগে আসা উচিত ছিল। মনে হয়—মনে হয় দূর বিদেশে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনলে রাজকুমারী অত্যন্ত আঘাত পাবেন। হয়তো এইজন্যই সাগানা লজে কোন খবর আসেনি।

কিন্তু যত বড় নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক দুঃসংবাদ হোক না কেন, তাঁদের জানাতে তো হবে—বলতে হবে। এই ভয়ানক সংবাদটা কে বলতে যাবে—কেমন করে বলবে—দুই সেক্রেটারী নিদারুণ সমস্যায় পড়লেন। দূরে—বহুদূরে উঁচু ডুমুর গাছের ডালে সুদৃশ্য ট্রিটপসের দিকে নজর যেতেই তাঁদের বুকটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল। আর শীতের সেই মধ্যদুপুরে হঠাৎ তাঁদের নিজেদের মনে হল—মনে হল তাঁরা যেন নিষ্ঠুর এবং নৃশংস দুই ঘাতক। ট্রিটপসের দুটো হাস্যপ্রদীপ্ত তরুণ-তরুণীর নিশ্চিন্ত আর অবারিত জীবনের আনন্দকে তারা দু হাতে গলা টিপে হত্যা করতে যাচ্ছে। যাচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে। অস্বস্তিতে তাঁদের বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল।

তাঁরা প্রায় টলতে টলতে এলেন ট্রিটপসের নীচে সাগানা লজে। সাগানা লজও ছোট্ট একটা বাড়ি। সেখানে বসার ঘর বা ড্রইংরুম বলতে একটিই। তাঁরা উঁকি

দিয়ে দেখলেন সে-ঘরে কেউ নেই। তাহলে ওঁরা কি জেনে গেছেন ভয়াবহ সেই দুঃসংবাদ। আর পিতার মত একান্ত আপনজন, শিক্ষাগুরুকে হারানোর শোকে দুঃখে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছেন রাজকুমারী।

মেজর চার্টারিজ ডুবন্ত মানুষের মত ফিস ফিস করে বললেন কম্যাণ্ডার পার্কারকে, আপনি-ই যা হয় করুন—আমি ওঁদের ফেস করতে পারবো না—বলেই একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ড্রইংরুমের জানলার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পার্কার সাহেব। এমন করে দাঁড়ালেন যাতে ডিউক অফ এডিনবরা তাঁকে দেখতে পান—কিন্তু রাজকুমারীর নজরে পড়বেন না।

ডিউক এক সময় ছিলেন ডার্টমাউথের রয়্যাল নেভীর বেস্ট ক্যাডেট। খুব ছটফটে, চঞ্চল স্বভাবের মানুষ। কি কাজে বুঝি বাইরের বসার ঘরে এসেছিলেন। তাঁর সেক্রেটারী পার্কারকে দেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

স্যার হিজ একসেলেন্সি কিং মারা গেছেন, কেমন শুকনো গলায় আবহাওয়ার খবর বলার মত করে বললেন কম্যাণ্ডার পার্কার।

আশ্চর্য একটা কথাও বললেন না ডিউক। শুধু লম্বা ভারী মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। সেক্রেটারীকে একটা কথাও না বলে মাথা নিচু করে ভেতরে চলে গেলেন।

উজ্জ্বল হলুদ রঙের মনোরম শয়নকক্ষের কার্পেট বিছানো মেঝেতে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন ডিউক। ঘর আলো করে পিছন ফিরে বসে ডায়েরী লিখছেন রাজকুমারী। লিখছেন কমনওয়েলথের দেশগুলোতে তাঁদের ট্যুরের বিবরণ—কেনিয়াতে আজই শেষ দিন। এখান থেকে আফ্রিকার নানয়ুকিতে তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য-সমাবেশের অভিবাদন গ্রহণ করে তাঁরা চলে যাবেন মোম্বাসাতে। সেখানে তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করছে বিলাসবহুল গথিক জাহাজ। এই জাহাজে চড়ে তাঁরা পাড়ি দেবেন অস্ট্রেলিয়া নিউজল্যাণ্ডের দিকে……

মাথা নিচু করে বসে লিখেই চলেছেন। বাতাসে উড়ছে তাঁর ঢেউ খেলানো বাদামী চুলের রাশি। জানলা দিয়ে শীতের অপরাহ্নের রোদ এসে পড়েছে তাঁর পিঠে, ঘাড়ে। তাঁর মরালের দীর্ঘ পুষ্ট গ্রীবা শ্বেত পাথরের মত ঝকঝক করছে।

যাকে গভীরভাবে ভালোবাসা যায় তাকে রূঢ় আর নিষ্ঠুর দুঃসংবাদ দেয়া কত কঠিন। দুঃসহ। তবুও—তবুও ওকে জানাতে তো হবেই।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এলেন ডিউক। নিবিড় স্নেহে রাজকুমারীর পিঠে হাত রাখলেন। বেশ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে হেসে হেসে বললেন, লিলিবেট

তোমার তো অনেক—অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল—

কিসের দায়িত্বের কথা বলছো ?

তুমি-ই তো এখন ইংল্যাণ্ডের রাণী—ইংল্যাণ্ডেশ্বরী।

সে কী! কি—কি বলছো তুমি! যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেন রাজকুমারী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। থেমে থেমে অস্ফুটস্বরে বললেন, বাবা—আমার বাবা—

তিনি মারা গেছেন।

কী! মর্মান্তিক যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠলেন রাজকুমারী। কিন্তু তার পরে আর একটা কথাও বললেন না। বলতে পারলেন না। শুধু সুন্দর ধারালো মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

তাঁর বাবা। এত বেশি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার পাত্র তাঁর কাছে আর কেউ কোনদিন ছিল না। কী অপরিসীম স্নেহচ্ছায়ার পক্ষপুটে তিনি তাঁকে আগলে রেখেছিলেন। বাবাকে ঘিরে কত টুকরো টুকরো স্মৃতি সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ার মত আচ্ছন্ন করে দিল তাঁর চেতনা।

শোন—তুমি, কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডিউক। তাঁর প্রশান্ত, গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য! এলিজাবেথের বড় বড় দুটো নীল চোখ ফেটে জল এসে পড়ল না। এমন কি কান্নার আভাসে তাঁর সুডৌল মুখখানা এতটুকু বিকৃতও হলো না। কঠিন স্থৈর্য আর সংযমের একটি প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু ট্রিটপসের সেই নির্জন ঘরে।

এমন সময় লণ্ডন থেকে এসে পৌঁছে গেল সেই ঐতিহাসিক টেলিগ্রাম—রাজকুমারী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ হিসেবে দেশের আইন ও পার্লামেন্টের সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন—

পার্লামেণ্ট তাঁর সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকবে—

শোকে বিহ্বল হয়ে বা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে নিশ্চুপ হয়ে থাকার আর অবসর পেলেন না রাজকুমারী এলিজাবেথ। বেশ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে গেলন জানলার কাছে। দূরে—বহু দূরে আকাশের গায়ে আঁকা কেনিয়ার ধূসর পাহাড়ের ছবি। বেলাশেষের তামাটে রোদে পাহাড়গুলোকে এক একটা অতিকায় ঘাতকের মত মনে হচ্ছে।

কিন্তু এ কী করছেন তিনি। তিনি আর রাজকুমারী এলিজাবেথ নন—এখন তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কমনওয়েলথ দেশগুলোর তিনি শীর্ষস্থানীয়া। ইংল্যাণ্ডের এই ঐতিহ্যবাহী রাজবংশের শুরু একাদশ শতাব্দীর

বাটের দশকে সেই উইলিয়ম দি কংকারার থেকে। এই উইলিয়ম দি কংকাররা বা দ্বিতীয় হেনরী থেকে আরম্ভ করে তিনি হলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ছেচল্লিশ বা ষড়চত্বারিংশ উত্তরাধিকারী। শুধু তাই নয়। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর এবং ইংল্যাণ্ডের মোট ৫৩ কোটি ৯০ লক্ষ অধিবাসীর তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্রী—সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবিয়োগের গভীর বেদনা আর শোকের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর মন অনেক—অনেক উঁচুতে উঠে এক মহৎ উদার ও সর্বব্যাপী অনুভূতির ভেতরে আবিষ্ট হয়ে গেল।

দেশের আইন ও পার্লামেন্টের সংবিধান অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের প্রশাসনের দায়িত্ব নিতে তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মত আছেন নিজের হাতে এই কথাগুলো লিখে টেলিগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন পার্লামেন্টে। আর এটাই হলো রাণী হিসেবে রাজপর্বের সর্বপ্রথম কাজ।

তারপরেই যেসব জায়গায় তাঁদের যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল, যাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা আর সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন তাঁদেরও টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন—অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের সফরসূচী মুলতুবী রইল।

প্রিন্স ফিলিপ বা ডিউক অফ এডিনবরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। গ্রেটবৃটেন তথা ইংল্যাণ্ড এবং সারা দুনিয়ার কমনওয়েলথ দেশ নিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী তাঁর পত্নী—তাঁর আদরের লিল্লিবেট। তিনি হয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ডের কুইনস কনসর্ট।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের পাতাগুলো ফরফর করে উড়ে গেল, উড়ে চলে গেল প্রায় দেড়শো বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়াও বিয়ে করেছিলেন জার্মানীর স্যাকসে গোবার্গগোথার প্রিন্স অ্যালবার্টকে। আবার তারও পুরো দেড়টা শতাব্দী ছাড়িয়ে পিছন দিকে গেলে দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের কুইন অ্যান বিয়ে করেছেন রূপবান যুবক ডেনমার্কের রাজকুমার জর্জকে। প্রিন্স অ্যালবার্ট এবং জর্জ—এই কুইনস কনসর্টদের আপাত সুখের আর সম্মানের জীবনে কিন্তু আর যাই থাক শান্তি ছিল না। কে বলতে পারে, তাঁর ভাগ্যে কি আছে। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁর মাথাটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল।

লিল্লিবেট, আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না, খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় আস্তে আস্তে বললেন ডিউক অফ এডিনবরা—ইমিডিয়েটলি আমাদের লণ্ডনে ফেরা উচিত—

নিশ্চয়ই, বললেন রাণী এলিজাবেথ, যত তাড়াতাড়ি পারো ব্যবস্থা করো—

ঠিক হলো তাঁরা ইস্ট আফ্রিকান এয়ারওয়েজের একটা ডাকোটা বিমানে তাঁরা প্রথমে যাবেন নানয়ুকি বিমানবন্দরে। সেই বিমান তাঁদের নিয়ে যাবে উগাণ্ডার এনটেব এয়ারপোর্টে। এনটেব পোর্টে তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল সুদৃশ্যও বিশাল হাওয়াই জাহাজ—আটলাণ্টা। এই আটলাণ্টাতে চড়েই তাঁরা লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকে আফ্রিকায় রওনা হয়েছিলেন। অতএব এনটেবে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

বিকেলের রোদ এসে পড়ল বাঁকা হয়ে সাগানা নদীর শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে। নদীর জল তরল অগ্নিধারার মত জ্বলতে লাগল।

আফ্রিকার রাঙা ধূলোয় ধূসরিত পথ ধরে রাণীর গাড়ি ছুটে চলল নানয়ুকি বিমান বন্দরের দিকে। হু হু বাতাসে পথের ওপরে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে নীল জাকারান্দা ফুলের গুচ্ছ। ফুলের পাপড়িগুলো যেন রাণীর পিতৃবিয়োগের ব্যথায় ঘন নীল। পথের দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেনিয়ার বাসিন্দারা। রাণীর শোকে তাঁরা ব্যথিত। নত মুখ। স্তব্ধ। যেন শোকম্লান সহস্র মানুষের একটা সমবেত আশ্চর্য ছবি।

বিমানবন্দরে অপেক্ষমান জনতার দিকে হাত নেড়ে মৃদু হেসে শেষবারের মত অভিনন্দন জানিয়ে রাণী বিমানে উঠলেন।

আশ্চর্য প্রেসফটোগ্রাফাররা এবং বিভিন্ন নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধিরা এক একটা পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তারা একজনও কেউ এগিয়ে এসে রাণীর ছবি তুলল না। কিম্বা রাজকুমারী থেকে রাণী এলিজাবেথ (দ্বিতীয়) হওয়ার অনুভূতিটা কি রকম জিজ্ঞাসা করল না। এসব নিষেধ ছিল। রাণী শোকার্ত। তিনি মৃত পিতার আত্মার শান্তি আর সদ্গতির প্রার্থনা করে চলেছেন প্রতিটি মুহূর্তে। এখন ছবি তোলার সময় নয়। তাই—

তাই সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ—সুদূর আফ্রিকাতে রাজকুমারী এলিজাবেথ রাণী হওয়ার সংবাদ পেয়ে যখন ইংল্যাণ্ডের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন, সেই মুহূর্তের ছবি কোথাও পাওয়া যায় না।

আফ্রিকা মহাদেশের ওপরে নেমে এল রাত্রির কালো ছায়া। মহাশূন্যে রাণী আর ডিউককে নিয়ে উড়ে চলল বিমান। আকাশ জুড়ে রাশি রাশি তারার দীপালি জ্বলছে। নিচে—বহু নিচে আফ্রিকার কালো অরণ্যে থেকে থেকেই দাবানল জ্বলে উঠছে। সেই আকাশপথে যেতে যেতেই বিমানে বসানো বেতারে ভেসে

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে অ্যালবার্টের বিয়ে হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে। আর ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে কুইন অ্যানের বিয়ে হয়েছিল।

এল স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর—সকল ক্ষেত্রে এবং সবরকম পরিস্থিতিতে আমাদের ক্যাবিনেট মহামান্যা রাণীর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকবে…

শির শির করে উঠল এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা। কী অপরিসীম গুরুভার দায়িত্ব,—তিনি কী পারবেন! পারবেন কি ইংল্যাণ্ডের প্রশাসনকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে? তীব্র দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কায় ছাব্বিশ বছরের সেই তরুণীর চেতনা যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তাঁর মনের ভেতরে ভেসে উঠল সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের মুখখানা। তিনি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, লিলিবেট মনে রেখো আমার অবর্তমানে তুমিই হবে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী। এখন থেকে সেইভাবে নিজেকে তৈরি করো—

রাণী। তাঁর আদরের বড় মেয়ে বৃটেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাণী হবে—এই স্বপ্ন দেখতেন তাঁর বাবা ডিউক অফ ইয়র্ক।

১৯৩৬ সালে, তাঁর যখন মাত্র দশ বছর বয়স সেই সময় তাঁর পিতা ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ডিউক অফ ইয়র্ক থেকে হয়ে গেলেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। আর ঠিক সেই সময় থেকেই তাঁর সেই দুর্বার স্বপ্ন—তাঁর মেয়ে রাণী হবে—যেন সত্যে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাঁর স্কুলের পড়াশুনা বা অ্যাকাডেমিক লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিলেন বাবা। রাণী—আদর্শ রাণী হওয়ার জন্য তাকে তৈরি করতে শুরু করলেন। তাঁকে পড়তে দেওয়া হল দেশবিদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের ইতিহাস এবং আইন। বিশেষ করে তাঁকে এই দুইটি বিষয়ে শেখানোর জন্য বাবা নিযুক্ত করলেন স্যার হেনরী ম্যারটেন—প্রোভস্ট অফ ঈটনকে।

বেশ মনে আছে লেখাপড়ায় তাঁর নিজের ছিল অসম্ভব অনুরাগ। আর সেই অনুরাগ এবং আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন তাঁর বাবা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর লেখাপড়ার খোঁজখবর করতেন। দেশবিদেশের ইতিহাসের ভাঙাগড়ার কাহিনী বলতে বলতে তিনি মুখর হয়ে উঠতেন।

শুধু কি ইতিহাস? সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনীতি আর দেশবিদেশের নানা বিচিত্র কাহিনীও রাতের পর রাত জেগে গোগ্রাসে গিলে যেতেন তিনি। বাবা দারুণ খুশি হতেন। উৎসাহ দিয়ে পড়াশুনায় তাঁর প্রেরণাটা আগুনের মত জ্বালিয়ে দিতেন। সমস্ত বিষয়ে তাঁর অপরিসীম কৌতূহল তাঁর একনিষ্ঠ মনোযোগ, তাঁর সুগভীর সততা ইত্যাদি নিয়ে রাজপরিবারে তাঁর প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন শোনা যেত।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের তাঁর বাবা। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারতো না—সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর কী গভীর মমতা ছিল। তাই তাঁর ছেলেমেয়েদের রাজকীয় মহিমার দুর্গে আবদ্ধ থেকে শুধু পড়াশুনা করার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে এবং দেশের নানা জনহিতকর কাজে এগিয়ে যেতে তাঁদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর বাবা এবং মা দুজনেই নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত থাকতেন।

বলতে গেলে তার বাবা ষষ্ঠ জর্জের জন্যই তিনি দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। একটু বড় হতেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাবার ড্রয়িংরুমে শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মানুষ আসছেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা কি সব আলোচনা করে চলেছেন। অবশ্য তখনো তিনি ষষ্ঠ জর্জ হননি। অধিষ্ঠিত হননি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। শুধুই ডিউক অফ ইয়র্ক। তার দেহের শিরায় শিরায় প্রবহমান ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক রাজবংশের নীল রক্ত। তবুও—

তবুও সেইসব রাজকীয় আভিজাত্য, অহমিকাবোধ সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিয়ে বাবা শ্রমিক মজদুরদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। বৈঠক করতেন ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে। তার বসার ঘরটি হয়ে উঠেছিল ফ্যাক্টরী মিল মালিক ও শ্রমিকদের মিলনকেন্দ্র।

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য, তাদের অবিরাম সংঘাত ডিউক অফ ইয়র্ককে রীতিমত ব্যথিত করে তুলেছিল। সত্যি সত্যি দেশের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য কার্যকরী কিছু করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না। শেষে বহু বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে একদিন সম্পূর্ণ নিজের টাকা দিয়ে একটি দরিদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলতে কোন দ্বিধা নেই—From her father she learnt that major duty of the Royalty is to involve one's life with that of people……

অবশ্যই বলতে হবে, দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি এই প্রীতি সহানুভূতি তাঁদের বংশানুক্রমিক রক্তধারায় প্রবাহিত। তাঁর পিতামহ সম্রাট পঞ্চম জর্জ একবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের দীনদরিদ্র প্রজাদের সন্তান-সন্ততিদের মত করেই মানুষ করবেন। তিনি তার ছেলেদের দেশের অতি সাধারণ নগণ্য মানুষদের সঙ্গে তাঁর প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে যোগাযোগ রাখতে বলতেন। পঞ্চম জর্জেরও ছাব্বিশ বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডও

ছিলেন লণ্ডনের নাগরিকদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তিনি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মেলামেশা করতেন।

তুমি নিশ্চয়ই বাবার কথা ভাবছো লিল্লিবেট—

ডিউকের কথায় চমকে উঠলেন রাণী এলিজাবেথ। অস্ফুটস্বরে কি একটা বলতে যেতেই প্লেনের পাইলট কেবিনের মাথায় আগ্নেয় অক্ষরে লেখা ফুটে উঠল—
Reachnig Enteb…Fasten the belt.

চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সাঁ সাঁ করে ডাকোটা বিমান নামতে লাগল নিচে। কিন্তু এনটেবের আকাশে তখন থরে থরে জমেছে কালো মেঘ। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড়ো বাতাস আর মুষলধারে বৃষ্টি। রাণী এনটেবে নামলেন। আর সেই দুর্যোগ মাথায় করে এসে গেল রাণীর লণ্ডনগামী বিমান আটলাণ্টা।

কিন্তু সেই প্রতিকুল আবহাওয়ায় বিমানযাত্রা সম্ভব হলো না। ঘণ্টা তিনেক পরে বাতাসের বেগ কমে গেল। বৃষ্টিটাও ধরে এল। আকাশে উঠল আটলাণ্টা। তখন রাত ১১টা ৪৭ মিঃ। গ্রীনউইচ টাইম—৮টা ৪৭ মিঃ

এনটেব তথা মোম্বাসা থেকে লিবিয়া হয়ে লণ্ডন সুদীর্ঘ ৪১২৭ মাইল পথ পাড়ি দিলেন রাণী এলিজাবেথ। একটি কথাও বললেন না স্বামীর সঙ্গে। শুধু ব্যাথার একটা শিলাস্তুপের মত বসে রইলেন।

পরদিন। ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। প্লেন নেমে এল লণ্ডন এয়ারপোর্টে। তখন পোর্টের বিস্তীর্ণ রানওয়েতে বিকেলের বিষণ্ণ কোমল ছায়া নেমেছে। আর দূরে বহুদূরে ঘন কুয়াশার ভেতরে যেন তিনটি ছায়াদেহের আভাস ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পিতৃবিয়োগের গভীর শোক বহন করে এবং সারা দেশের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নেমে এলেন রাণী। ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সর্বময় কর্ত্রী। তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন তিনজন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্বনামধন্য প্রখর ব্যক্তিসম্পন্ন তিন নেতা। ইংল্যাণ্ডের কোন না কোন সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারা তিনজন—

মিঃ উইনষ্টন চার্চিল।

মিঃ এটলী।

মিঃ এডেন।

॥ চার ॥

'দেখুন আপনারা বিশ্বাস করুন আর না-ই বা করুন', বলেছেন তার জীবন-

স্মৃতিতে প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অফ এডিনবরা, রাণীর বর। 'বিশেষ করে যে রাণী সিংহাসনে আসীন অর্থাৎ রেইনিং কুইনের স্বামী হওয়া যে কত কঠিন তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপাত সুখের আর সম্মানের এই পদ—কুইন কনসর্টের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠেছে—এমন দৃষ্টান্ত ইংল্যাণ্ডের সাবেকদিনের ইতিহাসেও পাওয়া যায় না।'

রাণীর স্বামী বা কুইন কনসর্টদের জীবন কেন আর পাঁচজনের মত সরল-রেখায় চলে না, অবারিত সুখে শান্তিতে ভরে ওঠে না, তারই কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের অনেক ইতিহাস বিশেষজ্ঞই জানিয়েছেন, কুইন কনসর্টদের ব্যথা-বেদনার ইতিবৃত্ত জানতে হলে জানা দরকার ইংল্যাণ্ডের কুইনকে। খুঁটিয়ে জানা দরকার ইংল্যাণ্ডের বিচিত্র শাসনতন্ত্রের আশ্চর্য এক একটি বৈশিষ্ট্যকে।

আজকের এই প্রবল গণতন্ত্রের যুগে আধুনিককালের পৃথিবীতে ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র তথা রাণী সত্যিই একটি বিস্ময়। রাণী এলিজাবেথের রাণী হিসেবে ক্ষমতার পরিধি ইংল্যাণ্ডের প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য-সম্মত। তিনি অনেক—অনেক কিছুই পারেন আবার কোন কিছুই পারেন না।

ইংল্যাণ্ডের রাণী স্বেচ্ছায় কি পারেন আর কি পারেন না তার সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে যোগবিয়োগ করলে দেখা যাবে—ইংল্যাণ্ডের অলিখিত শাসনতন্ত্রের সংখ্যা অনুযায়ী রাণীর যথার্থ করণীয় কাজ তিনটি—

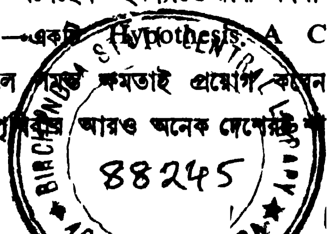
টু অ্যাডভাইস—উপদেশ দেওয়া।

টু এনকারেজ—উৎসাহ দেওয়া।

টু ওয়ার্ন—সতর্ক করে দেওয়া।

রাজকীয় ক্ষমতা তার বিপুল। কিন্তু কোন ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করতে পারেন না। Royal Power বা রাজক্ষমতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কোনটাই রাণীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। সেসবই রাজশক্তির বা প্রতিষ্ঠানগত রাণীর ক্ষমতা। তাই বৃটেনের এক সরকারি দলিলে বলা হয়েছে—রাণী রাজত্ব করেন কিন্তু কখনো শাসন করেন না—She reigns but she does not rule.

অনায়াসেই বলা যায় রাণীর ভূমিকা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। তিনি রাজশক্তি বা রাজপ্রতিষ্ঠানের (Crown) প্রতীক মাত্র। আবার ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—ইংল্যাণ্ডে রাণী অথবা রাজা রাজকার্যের সুবিধার জন্য একটি কল্পনা—একটি Hypothesis. A Convenient working hypothesis. আসলে সমস্ত ক্ষমতাই প্রয়োগ করেন মন্ত্রীরা। এখন ভারতে আমেরিকায় এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশেরই শাসনতন্ত্রে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ



দলের মন্ত্রীরাই দেশ শাসন করেন। ইংল্যাণ্ডেও সেইরকম। তাই বলা যায় ইংল্যাণ্ড হলো রাজতন্ত্রের মুখোসপরানো চূড়ান্ত গণতন্ত্রের দেশ। সেখানকার রাণী অথবা রাজা তথা রাজতন্ত্রও গণতন্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে বহু যুগ থেকে। কেমন করে ?

তা জানতে হলেই চলে যেতে হবে একশো বছরেরও ওপারে পিছিয়ে। ১৮৮১ সাল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল চলছে। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে আছে পার্লামেণ্টের প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে রাণীকে অভিভাষণ দিতে হয়। এই বক্তৃতাকে বলে—Speech from the throne—রাণী নিজেই এই বক্তৃতা পাঠ করেন। আবার কখনো রাণীর হয়ে লর্ড চ্যান্সেলার সেটা পড়ে থাকেন। কিন্তু সেই অভিভাষণটির রচয়িতা ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। খুব সংক্ষেপে সরকারী নীতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা থাকে এই বক্তৃতায়। আর বলাবাহুল্য সেই বক্তৃতার সমস্ত দায়দায়িত্ব থাকে মন্ত্রীসভার। কিন্তু রাণীর যদি কোন বিষয়ে আপত্তি থাকেও তাহলে মন্ত্রীদের মতামত নিয়ে তাকে সংশোধন করার কাজে অগ্রসর হতে হয়। এই হলো ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের জগদ্দল নিয়ম। একটুও হেরফের হওয়ার উপায় নেই।

১৮৮১ সাল।

পার্লামেণ্ট অধিবেশনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বক্তৃতা করছেন। কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন। তিনি ইঙ্গিতে জানালেন—এই বিষয়টিতে তাঁর প্রবল আপত্তি আছে।

—হার এক্সেলেন্সী কি করছেন, ছুটে এসে চাপা গলায় বললেন রাণীর নিজস্ব কর্মসচিব পনসনবী (Ponsnby)—এই বক্তৃতার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত মতামতের কোন সম্বন্ধই নেই। এটা মন্ত্রীদের নীতির ঘোষণা মাত্র—

ইংল্যাণ্ডের রাণীর ক্ষমতা যে কত বেশি সীমাবদ্ধ তার আরও একটি পুরনো নজির পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতা থেকে।

ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে আছে পার্লামেণ্ট যে বিল বা আইন অনুমোদন করবে রাজা বা রাণী তাতে স্বাক্ষর করতে আপত্তি করতে পারবেন না।

১৯১৩ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমলে একটা বিল নিয়ে গোলমাল বেধে গেল। একটি বিলে তিনি সই করতে আপত্তি করে বসলেন। সম্রাটের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা লর্ড ইশার (Lord Eshar) রাজতন্ত্রের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে লর্ড ইশার বললেন, হিজ একসেলেন্সি আপনার কিছুই করার নেই—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানমন্ত্রী যদি আপনাকে ফাঁসির হুকুমে

সই করতে বলেন—আপনাকে তাই-ই করতে হবে…

"অ্যাকচুয়েলি রাণীর তো কোন ক্ষমতা-ই নেই। রাণী কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে ভোট দিতে পারেন না। কোন বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টিকে সমর্থন করতে পারেন না। এমন কি পারেন না হাউস অফ কমন্সে বসতে। যদিও এই বাড়িটার তিনি-ই মালিক—বলেছেন ডিউক অফ এডিনবরার জীবনীকার ডেনিস জুড়ে 'এত লিমিটেশান, এত রেস্ট্রিকশান—সভরেন (Sovereign) রাজনীতি করতে পারবেন না—পারবেন না সরকারি কাজকর্মে নাক গলাতে—No interference in the process of Government…'তবুও—তবুও দমে যাওয়ার পাত্র নন প্রিন্স ফিলিপ। প্রায়ই বেশ জোরের সঙ্গে তাঁর নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার তীব্র প্রবণতা দেখা যায় ডিউকের ব্যবহারে। বলাবাহুল্য তার পরিণাম ভালো হয় নি। সরকারি মহলের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তিতে অপ্রীতিকর এক প্রতিকূল আবহাওয়া তৈরি হয়ে থাকে—

Yet philip had already demonstrated a marked tendency to assert his own views often in uncomprosining terms and this would lead to embarrassing confrontation at the centres of power and influence.

ফিলিপের জীবনচর্যার আলোচনা করতে করতেই তাঁর জীবনীলেখক ডেনিস জুডো বলেছেন, মনে একটা প্রশ্ন জাগে, ইংল্যাণ্ডের রাজা অথবা রাণী অর্থাৎ সভরেনের কোন পাওয়ারই যখন নেই তখন সব কিছু তাঁর নামে হয় কেন—কেন তাঁকে শোপীস করে রাখা হয়।

এটাও ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যদি কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রশাসন পরিচালিত হয় তাহলে গভর্ণমেণ্টের গায়ে কিছুটা পলিটিক্সের রং লাগবেই লাগবে। কিন্তু রাজা অথবা রাণীর নামে শাসনকার্য পরিচালনা করলে প্রশাসনের বিশুদ্ধ শুভ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

আছে—আরো একটা কারণ—পার্লামেণ্টারী শাসনে একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ছাড়া কাজ চলতে পারে না। সমগ্র দেশ ও সাম্রাজ্যের সংহতির প্রতীক হিসেবে রাণী অথবা রাজা যেমন উপযুক্ত বা কার্যকর অন্য কোন দলের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়।

সিংহাসনে রাণী থাকার আরও একটা সুবিধা আছে—ইংল্যাণ্ডের রাণী যেমন রাজতন্ত্রের প্রতীক তেমনি পার্লামেণ্ট অর্থাৎ হাউস অফ কমনস এবং হাউস অফ লর্ডসেরও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়—কুইন এবং

হাউস অফ লর্ডস ও হাউস অফ কমন্স—এই তিনটি মিলিয়েই হয়েছে ইংল্যাণ্ডের আইনসভা বা পার্লামেণ্ট। কোন কিছুর পরিবর্তন বা সংস্কার করতে হলেই এই তিনটিরই সমষ্টিগত অনুমোদন একান্ত প্রয়োজন।

প্রৌঢ় ডিউক অফ এডিনবরা রীতিমত চিন্তা করেন—লিখেছেন তাঁর জীবনীকার ডেনিস জুডো, যদিও দেশের শাসনতান্ত্রিক কোন কাজেই তাঁর কোন ভূমিকা নেই—having no constitutional part to play, তবুও তাঁকে ভাবতে হয়—বেশ গভীরভাবেই ভাবতে হয়—নেই নেই করে এখনও ইংল্যাণ্ডের রাণীর তো অনেক ক্ষমতাই আছে—যেমন :

ইংল্যাণ্ডের রাণী শুধু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্বময় অধিনায়িকা নন—তিনি কমনওয়েলথেরও সর্বপ্রধান কর্ত্রী। ব্রিটেনের সমস্ত শাসন এবং বিচার বিভাগ রাণীর নির্দেশেই পরিচালিত হয়। অবশ্যই তাঁকে আইনের বিধান মেনে এবং প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়। পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শুরুতে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতার পর আর কোন হাউসেই—হাউস অফ লর্ডস কি হাউস অফ কমন্সে তিনি থাকতে পারেন না। শুধু তাঁর অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টের বিল বা আইনগুলো আসে। তিনি সেইসব বিলে স্বাক্ষর করলে সেই বিলগুলো লর্ডসদের সভায় ঘোষণা করা হয়। অবশ্যই মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়েই রাণী প্রতিটি বিল অনুমোদন করে থাকেন। কোন বিল সম্বন্ধে মন্ত্রীদের আপত্তি থাকলে তাঁরা যেমন পরামর্শ বা নির্দেশ দেবেন সেই অনুযায়ী রাণীকে কাজ করতে হয়।

শুধু কি তাই? দেশের সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় বিভাগের কাজকর্ম কুইন-ইন-কাউন্সিল বা প্রিভি কাউন্সিলের এইসব অধিবেশনের অনুষ্ঠানগুলোর সময় সমস্ত সরকারি নীতি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল দুই-তিনজন মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। যদি প্রিভি-কাউন্সিলের কোন অধিবেশনে রাণী উপস্থিত থাকেন তাহলে বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের আভ্যন্তরীণ অভিমতগুলো নথিভুক্ত করে রাণীকে দেখানো হয়ে থাকে।

মন্ত্রীদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাণীকে তলিয়ে ভাবতে হয়। যদিও রাণী নিজে শাসন পরিচালনা করেন না, কিন্তু তাঁর নির্দেশেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে সমস্ত রকমের প্রশাসন বিভাগের প্রধান ব্যক্তি ও পরিচালকদের পরামর্শ নিয়ে তবে রাণী কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

আরো আছে। জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে,

সেইসব বিষয় নিয়ে রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে কাজ করা হয়। রাণী যা বলেন, মন্ত্রীরা তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে খুব মন দিয়ে শোনেন।

এইখানেই বলা দরকার রাণীর সামনেই নানা রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকরা তাঁদের মন্তব্য করেন তাই রাণীর পক্ষে সমস্ত নেতাদের বা মন্ত্রীদের মতামতটা জানতে পারা সম্ভব হয়। তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু যত অভিজ্ঞতাই তাঁর থাক তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর মন্তব্যকে কথনোই তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রভাবিত করতে পারেন না। কারণ?

কারণ একটাই ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা যখন যে বিষয়ে যে রকম পরামর্শ দেবেন রাণী সেই অনুযায়ী কাজ করতে বা নির্দেশ দিতে বাধ্য! রাণী কুইন এলিজাবেথের এইসব গুরুতর দায়িত্ব এবং বাধানিষেধের কথা ডিউকের মনে আলোড়ন তোলে। তাঁর ভাবনাও আরো বিস্তীর্ণ—আরো সুদূরপ্রসারী হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ডের কনস্টিটিউশান—বড় আশ্চর্য কনস্টিটিউশান। মনার্কির বা রাজতন্ত্রের শিরোপা চড়িয়ে চলছে কড়াকড় গণতন্ত্র। রাণীর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা যেমন পুরোপুরি পার্লামেণ্টের অধীন তেমনি আবার নিয়মতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব আছে বলেই সপ্তাহে একদিন রাণী এবং প্রধানমন্ত্রীকে বৈঠকে বসতে হয়। আর সেই বৈঠক বাধ্যতামূলক।

ক্যাবিনেটের প্রতিটি কাগজপত্র রাণীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। তাছাড়া মন্ত্রীপরিষদের কার্যসূচি রাণীকে আগাম জানানো হয়। যেখানে তাঁর অনুমতির প্রয়োজন সেখানে তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। আর যেসব বিষয়ে তাঁর অনুমতির প্রয়োজন নেই, সেইসব বিষয় সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানিয়ে দেন। তবুও সেই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে থাকেন রাণী। কিন্তু যদি কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন মনে করেন তাহলে নিজস্ব কর্মসচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে তা জেনে নেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সেই বিষয়ে তাঁর মতামত বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ইংল্যাণ্ডের রাণীর আর একটি বিরাট দায়িত্ব—বিদেশী ও কমনওয়েলথ অফিস থেকে পাঠানো প্রতিটি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম বা জরুরী তারবার্তার কপি তাঁকে দেখতে হয়। তাঁকে জানতে হয়—পার্লামেণ্টের প্রতিদিনের প্রসিডিংস বা কার্যবিবরণী।

তারপরে আছে বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের অভ্যর্থনা বা আপ্যায়ন। গুরুভার দায়িত্ব—কমনওয়েলথ দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা বা অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা

বৃটেনে এলে অতিথিসেবার ভার নিতে হয় স্বয়ং রাণীকে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে প্রতি বছর পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৩০,০০০ লোককে তিনি বিভিন্ন রাজকীয় প্রাসাদে আপ্যায়ন করেন। এই আতিথেয়তা বা আপ্যায়ন অনুষ্ঠানের তিনটি হয় বাকিংহাম প্যালেসে আর একটি হয় এডিনবার্গের হলিরুড হাউসে। আর তাই তো—

তাই তো রাষ্ট্রনীতির প্রখ্যাত সমালোচক বার্কার সাহেব স্পষ্টই বলেছেন— She (Queen of Englad) is the most active part of Birtish constitution। সমস্ত ক্ষমতাই মন্ত্রীদের হাতে বলে কখনো কেউ তাঁকে যেন এক জাঁকজমকপূর্ণ সাক্ষীগোপাল (A magnifcient cipher) বলে মনে না করেন। যত ক্ষমতাই থাক প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন না।

বেশিদিন নয়। মাত্র বারো বছর আগের কথা। ১৯৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন একদিন তাঁর ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের কাছে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের রেকর্ডে আছে প্রকাশ্যে তাঁর রেজিগনেশান ঘোষণা করার চার মাস আগে তিনি কুইন এলিজাবেথকে (দ্বিতীয়) তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছিলেন। এই রকমই আছে আরো অনেক নজির।

প্রিন্স ফিলিপ মনে করেন রাজতন্ত্র কোন কিছুই গণতন্ত্রের ওপরে জোর করে চাপাতে পারে না। তাই কখনো কোন সংঘাত বাধে না-মনাকির সঙ্গে পার্লামেণ্টের। তাই ইংল্যাণ্ডের প্রথম নৃপতি এগবার্টের (৮০২-৮৩৯ খ্রীঃ) সময় থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বৃটেনের শাসনতন্ত্রের এই দুটো ধারা দুটো নদীর মতই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সমগ্র ইউরোপে একমাত্র— একমাত্র পোপের পদ (Papcy) ছাড়া বৃটিশ রাজতন্ত্রের চেয়ে প্রাচীন আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে পৃথিবীর সব দেশে গণতন্ত্রের প্রবল ঢেউ রাজতন্ত্রকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু—

ইংল্যাণ্ডে শুধু রাজতন্ত্র টিকেই নেই জনসাধারণ বা পার্লামেণ্টের অনুমোদনের ওপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর দেশের ক্রমশ পরিবর্তিত সামাজিক, এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে।

যতই খাপ খাওয়ানো হোক, প্রকৃতপক্ষে রাণীর তো কোন ক্ষমতাই নেই। তবুও কিন্তু প্রশাসনের প্রতিটি বিষয় তাঁকে বুঝতে হয়। জানতে হয়। পরামর্শও করতে হয় মন্ত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু—

অনেক সময় অনেক জটিল বিষয়ে স্ত্রীকে সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্বের ভার নিয়েও তিনি কিছুই করতে পারেননি। আর করবেনই বা কি করে। 'রাণী' নামে মহিমান্বিত পদটিরই তো হাত পা বাঁধা। অতএব তাঁর স্বামী বা কুইনস কনসর্টের তো করনীয় কিছু থাকতেই পারে না।—No part to play in national and royal affairs—তাঁর মনটা খুব ভারি হয়ে ওঠে আর তখুনি—

তখুনি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকেন তাঁর মত কুইনস কনসর্ট আর কে কে ছিলেন ?

সাবেক দিনের ইতিহাসের পাতা থেকে কুইনস কনসর্টের দুটি মডেল—দুটো একেবারে পরস্পর বিরোধী মডেল তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল—Two contradictory models from British history had been reflected in his mind…প্রায় তিনশো বছর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডের রাণী কুইন অ্যানির (১৭০২-১৭১৪ খ্রীঃ রাজত্বকাল) স্বামী ছিলেন ডেনমার্কের রাজকুমার জর্জ। তাঁকে নিয়ে কোন ঝামেলাই ছিল না। তাঁর জীবনে ছিল মাত্র দুটি আসক্তি—স্ত্রী আর মদ—wife and bottle দিনরাত মদে চুর হয়ে বসে থাকতেন। মগ্ন হয়ে থাকতেন বিলাসে ব্যসনে। জন্ম দিয়েছিলেন অসংখ্য সন্তানের। তাই ইংল্যাণ্ডের জাতীয়জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না।—

আবার জর্জের একেবারে উল্টো ছিলেন আর এক কুইনস কনসর্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (১৮৩৭-১৯০১) স্বামী কোবার্গ গোথার (জার্মানী) রাজকুমার প্রিন্স অ্যালবার্ট। ভিক্টোরিয়ার স্বামী হওয়ার পরেই দেশের সমস্ত আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে দিলেন। অবশ্যই তাতে ভিক্টোরিয়ার সায় ছিল। আর তাঁর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব দুটোই ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁকে সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হতো। তাই ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রীদের কাছে তিনি রীতিমত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পামারস্টোন বলেছিলেন আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে একেবারে ডিকটেটর হয়ে যেতেন অ্যালবার্ট। দুর্যোগ যখন ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল তখুনি মারা গেলেন কুইনস কনসর্ট অ্যালবার্ট। তাই রক্ষা।

অনেক—অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছেন প্রিন্স ফিলিপ—তিনি যেমন কিছুতেই জর্জের মত ব্যক্তিত্বহীন কূপমণ্ডুক বিলাসী এবং মদ্যপ হতে পারেন না। তেমনি অ্যালবার্টের মত তাঁর স্ত্রী—রাণী বলেই অটোক্র্যাট বা স্বৈরাচারীও হতেপারবেন না।

না। কিছুতেই না। আর বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কঠিন নিয়মনীতি ও প্রোটোকলের (কূটনৈতিক আদবকায়দা) বেড়া ভেঙে চেষ্টা করলেও তো তিনি কখনই কিছু করতে পারবেন না। এমন কি কিছু করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

আর তারপরেই প্রিন্স ফিলিপ বা ডিউক অফ এডিনবরার জীবনী লেখক ডেনিস সাহেব বৃটিশ রাজতন্ত্রের বহু যুগের পুরনো নিয়ম বা প্রথাগুলো কী অবিচল নিষ্ঠায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে এবং সেখানে কি রকম pre-eminence of the rigid Court Laws অর্থাৎ রাজকীয় আইনকানুনের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে করোনেশান বা অভিষেক উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন—

ইংল্যাণ্ডের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠানের অভিষেক উৎসব বা করোনেশান এদেশের রাজতন্ত্রের মতই প্রাচীন। প্রায় হাজার বছর ধরে বৃটিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে এই রয়্যাল কনভেনশান বা রাজকীয় প্রথা।

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা করা হয় এই উৎসবে সিংহাসন প্রাপ্তি-সংক্রান্ত পরিষদ (An Accession Council) থেকে। এই পরিষদে থাকেন প্রিভি কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য এবং লর্ড সভার সদস্যরা, থাকেন লর্ড মেয়র ও অলডারম্যান। আর সেই অভিষেকের উৎসবে উপস্থিত থাকেন লণ্ডনের নেতৃস্থানীয় নাগরিকরা ও কমনওয়েলথ দেশগুলোর হাইকমিশনাররা।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এই অভিষেক উৎসব? রাজ্যাভিষেকের ফলে দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ এক ব্যক্তিকে রাজা বা রাণী বলে গ্রহণ করে থাকে। এই উৎসবের সভায় রাণী রাজকীয় কর্তব্য পালনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর তখুনি 'Crown' বা রাজপদ হয়ে দাঁড়ায় contract in! বা চুক্তিসাপেক্ষ! ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে আছে - এই অভিষেকের উৎসবই কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সিংহাসনে আরোহন এবং এই করোনেশানের মাধ্যমেই রাজা বা রাণী শাসন করার অধিকার লাভ করেন।

করোনেশানের ৫'তিটি ক্রিয়ানুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে সেই হাজার বছর আগের নিয়মে। রাজা বা রাণীকে কারুকার্যখচিত সুদৃশ্য করোনেশান ক্যারেজে (ঘোড়ার গাড়ি) বসিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয় ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম গীর্জা—ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতো। সেখানে ভাবগম্ভীর আরত্রিক পবিবেশে জর্ডনের পবিত্র জল (holy water) ছিটিয়ে এবং অভিষিক্ত করার জন্য তেল বা Anointing oil মাখিয়ে নতুন নৃপতিকে পরিশুদ্ধ করানো হয়। আর ঠিক

তারপরেই তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় রাজমুকুট। আর তাঁর এক হাতে শোভা পায় রাজদণ্ড আর এক হাতে শান্তির প্রতীক সোনার তৈরি পায়রা। তারপরে তাঁকে বহুকালের প্রাচীন সেই রাজসিংহাসনে বসিয়ে সমবেত উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরী প্রশ্ন করেন, আপনারা কি এই নতুন নৃপতিকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত আছেন ?

আশ্চর্য ! ঠিক হাজার বছর আগে নরম্যাণ্ডির প্রথম নৃপতি উইলিয়ম দি কংকারের সময়েও এই প্রশ্নটিই করেছিলেন প্রাচীন গীর্জা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির প্রথম আর্চবিশপ অলডারড। করোনেশানের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। অভিষেকের কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানে এতটুকু হেরফের চলবে না। চলবে না সামান্যতম ব্যতিক্রম। কিন্তু—

তার আগে নিশ্চয়ই বলা দরকার ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ইতিহাস অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে যে গীর্জার দেওয়ালে হাজার বছর ধরে কত অভিষেক, কত বিবাহ, কত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের কলস্বর যে গীর্জার পাথরে পাথরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেই ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির বৃত্তান্ত।

১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড দি কনফেসার বৃহত্তর লণ্ডনের পশ্চিমে টেমস নদীর ধারে এক জলাভূমির ওপরে ভাঙা নড়বড়ে একটি গীর্জাকে ভেঙে তৈরি করেছিলেন এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি বা পশ্চিম প্রান্তের গীর্জা। শোনা যায় তিনি এক পরম ধার্মিক সাধু সেণ্ট পিটারের কাছে শপথ করেছিলেন একটি অভিনব গীর্জা তৈরি করবেন ! সেই অঙ্গীকার রূপায়িত হয়েছিল এই চার্চে। ইংলিশ চার্চের ভেতরে এই প্রাচীনতম গীর্জাটি তিনি তৈরি করেছিলেন পবিত্র ক্রুশের আকৃতিতে। সেই গীর্জার দেওয়ালে দেওয়ালে মনোরম কারুকার্যের ভেতরে ছিল রাশি রাশি সোনা আর রূপোর পাত, ছিল একটি অপাপবিদ্ধ কুমারী মেয়ের মাথার চুল আর ছিল মেজাইদের* (প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের) পবিত্র গন্ধধূপ ! সেই ধূপের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠতো।

ইতিহাসে আছে, এডওয়ার্ড দি কনফেসার তাঁর সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই গীর্জা তৈরি করতে।

১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই গীর্জা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সুদীর্ঘ তেইশ বছর পরে

---

*প্রাচীন পারাসিক পুরোহিত মণ্ডলী বা যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রথম শিশু যীশুখ্রীষ্টের কাছে উপহার এনেছিলেন। সেই উপহার সামগ্রীর ভেতরে ছিল গন্ধধূপ।

(১০৬৫ খ্রীঃ) ঠিক বড়দিনের আগে দিন শেষ হলো তার কাজ। উচ্চাভিলাষী এডওয়ার্ড দি কনফেসারের বাসনা ছিল—খুব ধুমধাম করে বড়দিনের উৎসব করবেন তাঁর নতুন গীর্জায়। আর সেই উৎসবে সারা বৃটেন এখানে সমবেত হবে। হবে এক মহতী অনুষ্ঠান।

কিন্তু উৎসবের একদিন আগেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এডওয়ার্ড। ২৪শে ডিসেম্বর চার্চ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে হাজারো আলোর মালায় সাজানো হলো। কিন্তু স্বয়ং নৃপতি অসুস্থ বলে উৎসব বাতিল হয়ে গেল। ৫ই জানুয়ারী তিনি দেহ রাখলেন। অতএব—

বড়দিনের উৎসব নয়, কোন শুভ অনুষ্ঠান নয়। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে প্রথম হয়েছিল এডওয়ার্ড দি কনফেসারের আন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব। আর তাঁর সমাধির পাশেই ঘোরতর মদ্যপ এবং অকর্মণ্য তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই হ্যারল্ডের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো ইংল্যাণ্ডের নৃপতির রাজমুকুট।

এসে পড়ল ১০৬৬ সাল। নরম্যাণ্ডি থেকে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন রণনিপুণ উইলিয়ম দি কংকারার। মাত্র সাড়ে সাত ঘণ্টা অবিরাম যুদ্ধ করে হ্যারল্ডকে পরাস্ত করলেন। আর তারপরেই বৃটেনের জনসাধারণকে খুশী করার জন্য লণ্ডন থেকে সমাধি আচ্ছাদনের জন্য মনোরম কারুকার্যশোভিত এক মহার্ঘ বস্ত্র এনে সুন্দর করে ঢেকে দিলেন এডওয়ার্ড দি কনফেসারের কবর। পরক্ষণেই সদম্ভ ঘোষণা করলেন—এইখানে এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে এক্ষুনি—এই মুহূর্তে হবে তাঁর অভিষেক।

ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির হাজার বছরের ইতিহাসে সে এক ভয়ানক সন্ধিক্ষণ। গীর্জার বাইরে প্রতীক্ষা করছে নরম্যাণ্ডির সেনাবাহিনী। তাদের চোখে মুখে যুদ্ধজয়ের উল্লাস। ভেতরে ম্লান বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্যাকসন বা ইংরেজ সৈনিকরা। তারা সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল—আমরা নরম্যাণ্ডির উইলিয়ামকে কিছুতেই রাজা বলে স্বীকার করবো না।

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় দেখে এগিয়ে এলেন দুই বিবদমান দলের দুই বিশপ। একদিকে দাঁড়ালেন নরম্যাণ্ডির বিশপ গডফ্রে আর একদিকে ইংরেজদের আর্চবিশপ অলডারড। তাঁর হাতে বাইজ্যাণ্টাইন শিল্পশৈলীতে তৈরি সোনার রাজমুকুট। তাঁদের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশালদেহী উইলিয়ম দি কংকারার।

তোমরা পরিষ্কার করে বলো, নরম্যাণ্ডির বিশপ প্রথমে ফরাসী ভাষায় চিৎকার করে ভেতরের এবং বাইরের অপেক্ষমান দুই দলেরই সৈনিকদের প্রশ্ন করলেন,

তোমরা কি চাও না উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডের রাজা হোক?

না না,—কিছুতেই না, ইংরেজরা কিছু না বুঝেই চিৎকার করে উঠল।

এইবার ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন রাখলেন ইংল্যাণ্ডের আর্চবিশপ অলডারড—তোমরা কি সত্যিই চাও না, নরম্যাণ্ডির এই তরুণ তোমাদের রাজা হোক?

অসম্ভব—অসম্ভব! আমরা ওকে রাজা বলে স্বীকার করবো না—আরো জোরে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্বরে বলল ইংরেজরা। তাদের সমবেত প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়ল অ্যাবির পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

এই গোলমালের আওয়াজ শুনে বাইরে থেকে নরম্যানরা মনে করল, নিশ্চয়ই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ আক্রোশে চার্চের কাছে কয়েকটি বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। মার মার করে ছুটে এল ইংরেজ সৈন্যরা। তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম্যাণ্ডির সেনাবাহিনী।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে সৈন্যদের হাতে হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তলোয়ার। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, যোদ্ধাদের হুঙ্কারে, আহতদের করুণ আর্তনাদে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল।

অনেক ইংরেজ সৈন্য নিহত হলো। ভয়ে পালিয়ে গেল স্যাকসনের অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় যোদ্ধারা। শান্তি নেমে এল অ্যাবিতে। শ্মশানের শান্তি!

সেই জনশূন্য চার্চে দাঁড়িয়ে নরম্যাণ্ডির উইলিয়ম শপথ আবৃত্তি করলেন আর ইয়র্কের তথা ইংল্যাণ্ডের আর্চবিশপ অলডারড তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন রাজমুকুট। ইতিহাসে আছে—William recited the oaths and Archbishop of York crowned him in the deserted Abbey...

এই অভিষেক ইংল্যাণ্ডের এই করোনেশানের উৎসবকে কেন্দ্র করেই হাজার বছরের প্রাচীন এই গীর্জার পাথরে পাথরে যেমন কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসবের নিঃশব্দ কলরোল মূর্ছিত হয়ে রয়েছে তেমনি আছে অনেক কৌতুককর ঘটনার স্মৃতিও।

প্রথম জর্জ ছিলেন জার্মান। ১লা আগস্ট ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজা হলে কি হবে—এক বর্ণও ইংরেজী বলতে পারতেন না। আবার তাঁর ইংরেজ পারিষদরা কেউই জার্মান জানতেন না। তাই বাধ্য হয়ে হিজ একসেলেন্সী বক্তৃতা শুরু করলেন ল্যাটিনে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির সেই বিশাল করোনেশান হলের শেষপ্রান্ত থেকে দর্শকদের প্রবল গুঞ্জন উঠল—ভেরি ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ—ভেরি ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ!

জর্জ দি ফোরথ বা চতুর্থ জর্জ মাথায় পরতেন কিম্ভূতকিমাকার একটা পরচুলা। তার ওপরে পরতেন পাখির পালকের টুপি। দূর থেকে তাঁকে মনে হতো ঠিক একটা হাতী। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূর থেকে চিৎকার করে বলে উঠতো—ঐ দেখ—হাতী যাচ্ছে—হাতী যাচ্ছে রে—

কিন্তু তাদের কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই করতেন না তিনি। অভিষেকের দিন সেই অদ্ভুত পরচুলার ওপরে পালকের টুপি এবং সেই টুপির ওপরে সেই বাইজ্যা-ণ্টাইন রাজমুকুট চাপিয়ে দিব্যি সিংহাসনে বসে গেলেন চতুর্থ জর্জ।

সেদিন ছিল প্রচণ্ড গরম। সভার কাজ শুরু হওয়ার আগেই দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন তরুণ নৃপতি। পরচুলার নিচে মাথার ভেতরে বুর বুর করতে লাগল। সর্বনাশ। করোনেশানের হাজাবো রিচুয়্যালসের (ক্রিয়ানুষ্ঠান) ঝামেলা ঝক্কি সামলে এতক্ষণ থাকবেন কি করে?

ভেতরে যেমন, বাইরে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির মেন গেটেও তেমনি আর এক বিপদ বেধে গেল। দ্বাররক্ষীরা এক সুন্দরী তরুণীকে আটকে দিল। সেই রূপসী মাথা উঁচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে ভেতরে করোনেশান হলে যাচ্ছিলেন।

ভেতরে যাবেন না ম্যাডাম—

প্রহরীদের কথা যেন শুনতেই পেলেন না সেই সুন্দরী। কে জানে, কিসের গরবে গরবিনী তাদের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আবার ভেতরে যেতে উদ্যত হলেন।

কি করছেন ম্যাডাম—কেন যাচ্ছেন—আপনাব টিকিট কই?

টিকিট! ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত দুলে উঠল তার দীঘল দেহটা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে বলল, কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন?

আপনি যেই হন গেটপাস না থাকলে যেতে পারবেন না ম্যাডাম।

আমি তোমাদের রাজা জর্জ দি ফোরথের ওয়াইফ—ক্যারোলিনা—

আপনাকে বিশ্বাস করবো কি করে?

কী! তীব্র ক্রোধে তার বাক রোধ হয়ে গেল। লজ্জায় অপমানে জর্জরিত হয়ে আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতে ফিরে গেলেন তিনি। আর একবারও অ্যাবির দিকে ফিরে তাকালেন না।

ওদিকে করোনেশান হলের ভেতরের অবস্থা আরও সঙ্গীন। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছেন জর্জ। তাঁর রুমালটা ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। টেনে নিলেন আর্চবিশপের রুমাল। সেটাও দেখতে দেখতে ভিজে উঠল। জর্জের মনে হলো—

মনে হলো যেন তাঁর সারা দেহে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না।

সভা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর্চবিশপের খাস কামরায় গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তবে স্বস্তি পেলেন। এসব ১৮২০ সালের কথা।

আরো কত মজার টুকরো টুকরো ঘটনা যে আছে ব্রিটেনের করোনেশান উৎসবের ইতিহাসে। আর সে সবের নীরব সাক্ষী হলো—এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি!

ষষ্ঠ হেনরী রাজা হলেন। কিন্তু সমস্যা হলো তিনি সিংহাসনে বসবেন কি করে, কেমন করে শপথ নেবেন। কেমন করে অতবড় ভারি মুকুট মাথায় পরবেন। কেন? তাঁর বয়স যে মাত্র ন মাস।

হোক শিশু। রাজা তো। সিংহাসনে তাঁকে বসতেই হবে। মুকুটও পরতে হবে। রায় দিল করোনেশান কাউন্সিল—অভিষেকের ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেই হবে। অতএব—

নার্সের কোলে বসলেন ষষ্ঠ হেনরী। তাঁর মাথার অনেক ওপরে আলগোছে মুকুটটা ধরে থাকলেন ধাত্রী। তিনিই নৃপতির হয়ে শপথ নিলেন। এবং কোলে বসে বসেই করোনেশান কাউন্সিলের সভা পরিচালনা করলেন। আর তার পরদিনই মার কোলে চেপে পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করলেন।

করোনেশানের প্রেয়ার বা প্রার্থনার কথাগুলো এত বেশি যে দীর্ঘ সময় ধরে পড়লেও কিছুতেই শেষ আর হতে চায় না। সেই প্রার্থনার ধকল সহ্য করতে পারলেন না দ্বিতীয় রিচার্ড (১৩৭৭ খ্রীঃ)। প্রেয়ার বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেলও খোয়া গেল। কয়েক বছর পরে তাঁকে রক্তবর্ণ ভেলভেটের ওপর মুক্তো বসানো আর এক জোড়া স্যাণ্ডেল দেওয়া হয়েছিল।

তিনি ছিলেন আড়ম্বড়প্রিয় বিলাসী নৃপতি। হুকুম দিয়েছিলেন, তাঁর রাজ-প্রাসাদের উদ্যানের সমস্ত ঝরনায় জলের বদলে থাকবে মদ। সুগন্ধী মদের ফোয়ারায় চারিদিক প্লাবিত হবে। বাতাস ভারি হয়ে উঠবে তীব্র ঝাঁঝালো সুবাসে আর তাঁর নাইট কি ডিউকরা সেই মদে স্নান করে পশমী চাদর দিয়ে গা মুছবে কিন্তু তাঁর সব রাজকীয় বিলাসীতাই স্বপ্ন হয়ে গেল। রিচার্ড সিংহাসনচ্যুত হলেন।

আবার কোন রকম জাঁক-জমক কি বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ খ্যাতা রাণী প্রথম এলিজাবেথ। কোন রকম কুসংস্কারই মানতে চাইতেন

না। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর অভিষেকের সময় এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে এসে ঘোষণা করলেন—মন্ত্রপূত পবিত্র জলে (জর্ডনের Holy water) এবং অভিষিক্ত করার তেলে (anointing oil) ভয়ানক দুর্গন্ধ। সেসব যেন আমাকে না দেওয়া হয়—আমি মাখতে পারবো না—

তাঁর অদ্ভুত মন্তব্য শুনে আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরি বিস্মিত হলেন। খুব নম্র কিন্তু কঠোরস্বরে বললেন, তা হয় না, হার একসেলেন্সী। তাহলে যে করোনেশানই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—

সিংহাসনে বসতে গিয়ে স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় নৃপতি প্রথম চার্লসের (১৬২৫-১৬৪৯) সোনার পায়রার বাঁদিকের ডানাটা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। সম্রাট শিউরে উঠলেন—ভয়ঙ্কর কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত। বিচলিত হয়ে হুকুম জারী করলেন—এখুনি জোড়া লাগিয়ে দাও ডানা—

কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। পাখিটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ আর একটি সোনার পায়রা তাঁকে দেওয়া হলো। কোন ত্রুটি থাকা চলবে না করোনেশনের উৎসবে।

এই প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসের অভিষেকের উৎসব ইংল্যাণ্ডের সমস্ত উৎসবের ভেতরে বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ এবং বর্ণাঢ্য হয়েছিল। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অভিষেকের দিনে ঐতিহাসিক গীর্জা অ্যাবির প্রতিটি হলঘরের মেঝে রক্তবর্ণ কার্পেটে আবৃত করা হয়েছিল। আর প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে দেওয়ালে ছিল উজ্জ্বল নীলাভ বস্ত্রসম্ভারের মনোরম আবরণ। গীর্জার জানলাগুলোর বহু বছরের মলিন ও দাগেধরা কাঁচের বদলে রঙবেরঙের নূতন কাঁচ বসিয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন সুপ্রাচীন কালের এই চার্চ ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিকে মনে হচ্ছিল যেন মধুর এক স্বপ্নের একটুকরো রঙীন ছবি। শুধু লণ্ডন নয়, সমগ্র বৃটেনের ধর্মযাজকরা যে যেখানে আছেন পরলেন সোনার টুপি। এই অভিষেকের উৎসবকেই আরো জোরালো আরো বর্ণময় করার জন্যই বৃটেনের প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। বন্ধ করে দেওয়া হলো এমন কি ক্রিসমাসের উৎসব উপলক্ষে গীর্জায় গীর্জায় সম্মিলিত সঙ্গীত। যখন রাজ্য জুড়ে বিশপরা সোনার টুপি মাথায় দিয়ে হীরে আর মুক্তোখচিত রক্তরঙের ভেলভেটের জোব্বা পরে অভিষেকের উৎসবে যোগদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, যখন করোনেশান কাউন্সিলের মহামান্য সভ্যবৃন্দ লণ্ডনের বিশিষ্ট নাগরিকরা এবং পৃথিবীর দেশদেশান্তরের রাজদূতরা অ্যাবির হলঘরে একটি

ভালো আসন সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ঠিক তখুনি—

তখুনি রাত্রিশেষের অন্ধকারে, সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে দ্বিতীয় চার্লসের নির্দেশে এমন একটা বীভৎস আর ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আর তার ফলেই রাজ্যাভিষেকের উৎসব ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এই অভিষেক উৎসবের শুভদিনটিই ছিল প্রথম চার্লসের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন। ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত জননায়ক এবং প্রথম কমনওয়েলথের* প্রতিষ্ঠাতা অলিভার ক্রমোওয়েলের (১৬৫৩-১৬৫৮) নির্দেশেই প্রথম চার্লসের ফাঁসী হয়েছিল।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সুদীর্ঘ তিন বছর পরে পুত্রের মনে ক্রমোওয়েলের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর আক্রোশের সেই বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটল। দ্বিতীয় চার্লসের হুকুমে অ্যাবির পবিত্র সমাধিভূমির কবর থেকে ক্রমোওয়েলের বিকৃত-গলিত শবদেহ তুলে নিয়ে আসা হলো। জনাকীর্ণ টাইবার্ণের মোড়ে টাঙিয়ে রাখা হলো কিছুকাল সেই বডি। তারপরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমোওয়েলের মুণ্ডুটা কেটে তীক্ষ্ণধার শুলে বিদ্ধ করে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির প্রধান তোরণের ওপরে পুঁতে রাখা হলো। তার চারিদিকে চারটি জ্বলন্ত মশাল দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ইতিহাসে আছে—Cromwell's decomposed body was dug up from his exalted Abbey grave and hung at Tyburn and his head removed and stuck on a spike above Westminister Hall…

শুরু হলো অভিষেক উৎসব। আশ্চর্য আর অভিনব সেই উৎসবে একটি ভালো আসনের জন্য দর্শকদের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারপরেই প্রিন্স ফিলিপের জীবনীকার ডেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন দ্বিতীয় চার্লসের সেই করোনেশান সেরিমনির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অ্যারোলিন স্কট (Aroline Scott) তিনি তাঁর ছ মাসের পুরনো ভেলভেটের কোর্ট পরে সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

এইসব বিবরণ দিয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন ১০৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ঐতিহাসিক ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অভিষেকের উৎসবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব—It was impossible to relate the glory of each and every Coronation Ceremony held at Abbey তবুও আছে—আরো আছে—জানিয়েছেন ডেনিস জুড্ডা—ইংল্যাণ্ডের

---

*ইংল্যাণ্ডের অবিচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই সাময়িক কমনওয়েলথের রূপকার ছিলেন অলিভার ক্রমোওয়েল।

রাজতন্ত্রের বহু প্রাচীন ও অভিনব প্রথা—এই করোনেশানের ইতিহাসে আছে আরও অনেক ঘটনা। সেসব যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতুককর—

খুব ধুমধাম করে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক উৎসব চলছে। কিন্তু একটা মুশকিল হলো, বুড়ো আর্চবিশপ যেমন চোখে ভালো দেখে না, তেমনি কানেও কম শোনেন। একসঙ্গে বাইবেলের তিন-চারটে পাতা উল্টে উল্টে দিয়ে কোন রকমে প্রেয়ারটা শেষ করে দিয়েই ছুটলেন সেই ঘরে যেখানে স্যাণ্ডুইচ আর কেক স্তূপ করা ছিল।

হাউস অফ কমন্সের এক বৃদ্ধ সভ্য তড়িঘড়ি করে খেতে যেতেই লম্বা গাউন পায়ে বেধে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে রাণীকেই টেনে তুলতে হয়েছিল সেই বৃদ্ধকে। তাই আক্ষেপ করে ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন—করোনেশানের রীতিমত একটা মহড়া হওয়া উচিত—We aught to have a proper rehearsal…

এই পর্যন্ত বলেই প্রিন্স ফিলিপের জীবনবৃত্তান্তের প্রসঙ্গে ফিরে এসে ডেনিস জানিয়েছেন—কিন্তু কোন রকম অঘটনই ঘটল না রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেক উৎসবে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এক হাতে সোনার পাখি আর এক হাতে রাজদণ্ড নিয়ে প্রাচীন সেই সিংহাসনে বসলেন ডিউক অফ এডিনবরার পরম স্নেহের পত্নী এবং বাল্যসখী। কুইন এলিজাবেথ দি সেকেণ্ড।

"সেইদিন থেকে আমি হয়ে গেলাম কুইন্স কনসর্ট, বলেছেন প্রিন্স ফিলিপ। তার পরেই আবার ডেনিস সাহেব মন্তব্য করেছেন—

হয়তো ডিউক অফ এডিনবরা তাঁর বড আদরের লিল্লিবেটকে সম্রাজ্ঞীর রাজকীয় বেশে দেখেই প্রায় এক যুগেরও কিছু আগে তাদের প্রথম পরিচয় থেকে প্রণয়ের আনন্দটলোমলো সেই উত্তাল দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।

এই অঘটনটি ঘটেছিল সেই ডার্টমাউথের রয়্যাল নেভি কলেজে। ছোটমামা লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তো আমাকে একদিন ডেকে বললেন—তুমি বোধহয় জানো কলেজে চিকেন পক্স আর মামস হচ্ছে দেখে দুই রাজকুমারী আর তাঁদের গভরনেস মিস ক্রফোর্ডকে আলাদা একটা বাড়িতে রাখা হয়েছে। সেখানে তোমাকে তাদের দেখাশোনা করতে হবে।

ছোটমামা তখন ছিলেন হিজ একসেলেন্সী কিং ষষ্ঠ জর্জের অ্যাডিকং—তিনি

রয়্যাল ফ্যামিলির ভেতরের অনেক খবরই রাখতেন। তাই তিনি আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েই গলাটা একটু নামিয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, মনে রেখ বড় রাজকুমারী প্রিন্সেস এলিজাবেথ কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীণী। একটু থেমে কি ভেবে আবার বলেছিলেন, এমন কিছু করো না, যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয়—এসব বলেই তিনি সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বড় রাজকুমারীকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া রাজকুমারীর ক্ষীণতন্বী দেহ। কেমন শান্ত কমনায় সুডৌল মুখশ্রী। বড় বড় নীল দুটো চোখে হাসি ঝিকমিক করছে।

রাজার মেয়ে। কিন্তু এতটুকু অহমিকা নেই বলেই মনে হলো। আর ছোট বোন মারগারেট তো আরও বেশি হাসিখুশি উচ্ছল প্রকৃতির। সে তখুনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বাগানে। সেখানে নানা রঙের ডালিয়া আর ক্রিসান্থিয়ামের সমারোহ। ফুলে ফুলে রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ছে। সে আদুরে মেয়ের মত বলল—আমাকে কয়েকটা প্রজাপতি ধরে দেবে?

আমি তখুনি দৌড়ে দৌড়ে কখনও বা ফুলের গাছের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রজাপতি ধরে ফেললাম।

—ইস তুমি তো সাংঘাতিক জোরে দৌড়াতে পারো? হাসতে হাসতে বললেন রাজকুমারীদের ন্যানসি (গভরনেস বা আয়া)।

আমি রয়্যাল নেভি কেস্ট ক্যাডেট ম্যাডাম্—বিনীতভাবে বললাম।

ওরা সবাই বেশ খোলামেলা আর সরল। অতএব আমারও জড়তা কেটে গেল। আমরা কখনও বাগানে বেড়াতাম। কখনও বা টেনিস খেলতাম। এই টেনিস খেলতে গিয়েই মজা হতো। যতবার বল কোর্টের চৌহদ্দির বাইরে ফুলগাছের ঝোপের দিকে চলে যেত ততবারই আমি হাইজাম্প দিয়ে নেট পেরিয়ে ছুটে গিয়ে বল নিয়ে আসতাম। আর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতো আলেকজান্দ্রা মেরী বা রাজকুমারী এলিজাবেথ। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতো ক্রফোডকে, দেখছো ন্যানসি, ফিলিপ কী দারুণ হাইজাম্প দিতে পারে!

আমার তখন কতই বা বয়স। আঠারো-ঠাটারো হবে। তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। তবে লক্ষ্য করেছিলাম আমার চওড়া বুক, রীতিমত নিয়মিত এক্সারসাইজ করা পেটানো চেহারাটার দিকে কেমন বিচিত্র আর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতো এলিজাবেথ। এক একদিন কোন কারণে যেতে দেরি হলে

অভিমানে ভারী হয়ে উঠতো আলেকজান্দ্রার মুখখানা।'

ডিউক অফ এডিনবরার সেই কৈশোর প্রেমের লীলাখেলার এই পর্ব প্রসঙ্গে ডেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন, মিস ক্রফোড তাঁর সহজাত নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জলদস্যুর বা ভিকিংদের মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সোনালী চুল, খড়্গের মত ধারালো নাক আর তীক্ষ্ণ দুটো নীলাভ চোখের এই গ্রীক যুবক কিন্তু লিল্লিবেটের মনে ছাপ ফেলেছে—That fairheired boy like a Vicking with sharpface and piercing blue eyes making notable impression on 13 year old Lillibet...

আরও বলেছেন মিস ক্রফোর্ড—একদিন তো লিল্লিবেট মুখ ফুটে বলেই ফেলল, ফিলিপ কী ভাল—কী নম্র ব্যবহার—তাই না ন্যানসী ?

আবার ডাটমাউথের সেই মধুর দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে করতেই ফিলিপ বলেছেন একদিন তো বড় হলঘরের বারান্দায় উঠতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম মিস ক্রফোর্ডের গলা—লিল্লিবেট—ও যে তোমার মন টানবে—তা আমি ওকে প্রথমে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, হবে না, অ্যাপোলোর মত যা সুন্দর চেহারা—

ডিউক অফ এডিনবরার এই কথার সূত্র ধরেই ডেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন—রীতিমত চমকে উঠেছিলেন ফিলিপ। কার কথা বলছেন মিস ক্রফোর্ড। তারপরেও স্পষ্টই তার কানে এসেছিল রাজকুমারীর নরম মেদুর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর—ন্যানসি—ফিলিপকে আমার ভীষণ—ভীষণ ভাল লাগছে—How—How good he is. I like him very much—

খেলাধুলোয় চৌকশ। দুর্ধর্ষ স্পোর্টসম্যান হলে কি হয়, রাজকুমারীর মুখে তার সম্বন্ধে এসব কথা শুনে সেদিন দারুণ উত্তেজনা আর ভয়ের শিহরণে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ফিলিপের চেতনা। আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলেন ক্যাডেটদের হোস্টেলের দিকে।

এইখানেই বলা দরকার মানুষের জীবনের কোন ঘটনাই কিন্তু আকস্মিক নয়। যা ঘটে তার কোন সূত্র বা কারণ লুকিয়ে থাকে দূর অতীতের ঘন অন্ধকারে। সেই দুর্নিরীক্ষ্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের একটি অদৃশ্য কিন্তু অটুট যোগসূত্রে থাকে। আর সেই জন্যেই নরনারীর জীবননাট্যের প্রত্যেকটি ঘটনার ভেতরেই একটা ধারাবাহিকতার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিল বুধবার রাত্রির শেষ প্রহরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। সঙ্গে সঙ্গে উইণ্ডসর প্রাসাদে তখনকার মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর ঘুম ভাঙিয়ে জানানো হয়েছিল সেই শুভ সংবাদ। দুজনেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। হার একসেলেন্সী মেরী তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন সেদিনের বর্ণোজ্জ্বল অনুভূতির কথা। কিন্তু যদি দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন জানতে পারতেন তাঁর এই নাতনী একদিন ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী হবে তাহলে তাঁর আনন্দ ও উচ্ছ্বাস অনেক গুণ বেশি বেড়ে যেত। কিন্তু এখন থাক সেসব প্রসঙ্গ—

সম্রাজ্ঞী মেরীর মতই সম্রাট পঞ্চম জর্জও আনন্দে একেবারে মত্ত হয়ে ব্যবস্থা করে ফেললেন একটা ভোজসভার। সেই পার্টিতে তাঁর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে নিমন্ত্রণ করলেন।

উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন লনে অপরাহ্নের রোদ পড়েছে বাঁকা হয়ে। লনের ঠিক মাঝখানে দীর্ঘ মেগিগনির টেবিলের এক কোণে বসেছেন এক স্থূলাঙ্গী মহিলা। নিঃসন্দেহে ভয়ানক সুন্দরী। কিন্তু কেমন ম্লান আর বিষণ্ণ মুখ। ভাসা ভাসা দুটো নীলাভ চোখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। তাঁর পাশের টেবিলেই বসেছে একটা ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। বছর চারেক বয়স হবে।

টুকরো টুকরো গল্প আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে খানাপিনা চলছে—

ট্যাঁ—ট্যাঁ—অ্যাঁ—লনের পাশেই রাজপ্রাসাদেরই আর একটি তিনতলার বাড়ির চিলাকুঠির ঘর থেকে হঠাৎ একটি শিশুর কান্নার তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল।

ওই আমার নাতনী। অভ্যাগতদের কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ। আর সকলের মত সেই চার বছরের বালকও সেই ছাদের ওপরের ঘরের চিলাকুঠি বেবিকট বা নার্শারীর দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিল। তার সেই দৃষ্টির সূত্র ধরেই কি বিধাতা তাকে সেই সদ্যজাত শিশুকন্যাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই বালকই আজকের প্রিন্স ফিলিপ অফ গ্রীস বা ডিউক অফ এডিনবরা। আর তাঁর মা প্রিন্সেস অ্যাণ্ড্রু বা ব্যাটেনবার্গের অ্যালিস। তিনি গ্রীসের নির্বাসিত রাজকুমার অ্যাণ্ডুর স্ত্রী এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বোন। আর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দিক থেকে তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জেরও বোন বলা যায়। তাই প্রিন্স ফিলিপ সেদিক থেকে রাণী এলিজাবেথের কাজিন ব্রাদার অর্থাৎ দূর সম্পর্কের ভাইও।

মনে হয় ডার্টমাউথের কিশোরী লিলিবেট আর ফিলিপের মাথামাখি দেখে এই পরিপ্রেক্ষিতেই মিস ক্রফোর্ড মন্তব্য করেছিলেন—আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রাজকুমারী এলিজাবেথ তার আঠারো বছরের সেই কাজিনটিকেই বিয়ে করতে মনস্থ করেছে—There seems little doubt that Princes Elizabeth determined to marry her 18 year old cousin.

সেদিনের আরও কত কথা, কত মধুর এবং তিক্ত স্মৃতিই যে ভিড় করে আসে বার্দ্ধক্যের প্রান্তে এসে পৌছানো ডিউকের মনে—তিনি নিজের মুখেই বলেছেন—ডার্টমাউথেই হিজ একসেলেন্সী কিং জজ থাকতে থাকতেই একদিন মিস ক্রফোর্ডের কাছেই আভাস পেলাম—আলেকজান্দ্রার সেই ভয়ানক সঙ্কল্পের—

বলছেন কি আপনি, আমি যে গ্রীসের এক হতভাগ্য নির্বাসিত রাজকুমারের ছেলে। চাল নেই চুলো নেই। দুনিয়ার দেশে দেশে ভেসে ভেসে বেড়াই—এসব কথাই তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু—

পারলাম না একটি কথাও বলতে পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হলো আমার সারা শরীরে কে যেন অজস্র আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে।

তুমি এতো নার্ভাস হচ্ছো কেন ফিলিপ, আমার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললেন মিস ক্রফোর্ড, তুমি কিচ্ছু ভেবো না—লিলিবেট নিজেই হিজ একসেলেন্সীকে সব বলবে—

হিজ একসেলেন্সী—কিং জর্জ দি সিক্সথ। সেই অস্বাভাবিক রাশভারী, নিয়মনিষ্ঠ মানুষটি, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রয়্যাল নেভিতে এবং পরে রয়্যাল ন্যাভাল এয়ার ফোর্সেও কাজ করেছিলেন। আজও যাঁর স্বভাবে, চালচলনে রণনিপুণ সৈনিকের দৃঢ়তা—এই মানুষটিকে বলবে জেনে ভয়ে দুশ্চিন্তায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম।

ফিলিপের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বৈকি তাঁর জীবনীকার ডেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন—রাজকুমারীদের দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন তার মামা লর্ড মাউন্টব্যাটেন। রাজার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে সে তার সঙ্গে প্রেম করছে জানতে পারলে তিনি কি ভাববেন? কিন্তু কেউ কি কখনও বিশ্বাস করবে, রাজার সেই দুলালীই ভালবেসেছিল নির্বাসিত এক রাজপুরুষের হতভাগ্য পুত্রকে, যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা।

ডিউক অফ এডিনবরার বাবা গ্রীসের প্রিন্স অ্যাণ্ড্রু ছিলেন ট্রেটর। দেশদ্রোহী। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ গ্রীস আর তুরস্কের ভেতরে যুদ্ধ

বেধে গিয়েছিল। সেই দুঃসময়ে অ্যাণ্ড্রু কোন সহযোগিতা তো করলেনই না, উল্টে শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। তাঁর এই আচরণে সারা দেশের মানুষ তাঁর ওপরে বিরূপ হয়ে উঠল। প্রবল জনমতের চাপেই তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁদের যাযাবরের মত ভ্রাম্যমান জীবন। কখনো ফ্রান্স, কখনো ইংল্যাণ্ড আবার কখনো জার্মানীতে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছেন তাঁরা। জ্যাঠামশাই, কাকা ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনদের দয়াদাক্ষিণ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল তাঁদের। এই সময় দিন রাত অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাঁর মা প্রিন্সেস অ্যাণ্ড্রু মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল—তাঁদের অভিশপ্ত পরিবারের এইসব দৈন্যের কথা তো তাঁদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ষষ্ঠ জর্জ বেশ ভালো করেই জানেন।

ফিলিপের এইসব দুশ্চিন্তা যে একেবারেই অমূলক নয়, তা বুঝতে পারা গিয়েছিল কিছুদিন পরে।

যখন রাজকুমারী আর ফিলিপের অনুরাগের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যখন রাজবাড়ির এই মুখরোচক রসালো ব্যাপারটা নিয়ে লোকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে বড্ড বেশি মাতামাতি করতে লাগল, সাংবাদিকের দল কাঁধে ক্যামেরা এবং হাতে নোটবুক নিয়ে রাজপ্রাসাদের আনাচেকানাচে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল তখন বাধ্য হয়েই এলিজাবেথ তাঁর বাবাকে জানালেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা।

শুনেই বেঁকে বসলেন তিনি। মাত্র তের বছরের মেয়ে, সে কি তার মনকে বুঝতে পারে, জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু—Whether she knew her mind, How much experience of life she has ?

আর তাছাড়া ছেলেটা দেখতে শুনতে বেশ ভালো হলে কি হবে! অভিশপ্ত বংশের ছেলে। মা পাগল। বাবা ঘোরতর মদ্যপ। নামেই রাজপুত্র। কিন্তু ভাগ্যহত নির্বাসিত রাজ্যহীন রাজার সন্তান। কোথাও নেই মাথা গোঁজার আশ্রয়। এর হাতে কি করে তুলে দেবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী, তাঁর আদরের দুলালী এলিজাবেথকে ? বললেন—No, impossible.

নিদারুণ সমস্যায় পড়ে গেলেন এলিজাবেথ। অপরিসীম শ্রদ্ধা আর ভালো-বাসার পাত্র তাঁর পিতা। কন্যার ভবিষ্যতের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল চিরন্তন পিতৃমন। আর একদিকে অনেক—অনেক গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত দিয়ে ঘেরা তাঁর বহু-বিনিদ্র রাত্রির দুর্মর স্বপ্ন—নিশিদিন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর চেতনার ভেতরে নক্ষত্রের

মত জ্বলজ্বল করে তার প্রদীপ্ত মূর্তি—সেই ফিলিপ।

নীরব ও ব্যাকুল মিনতি নিয়ে দাঁড়ালেন মার কাছে। রাজমাতা মেরী মুহূর্তের জন্য কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। আর ঝড়ো বাতাসে যেন ফর ফর করে উড়ে গেল—অনেক—অনেকগুলো পৃষ্ঠা, চলে গেল তাঁরই জীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে।

ডার্লিং বার্টির (কিং জর্জ দি সিক্সথ) সঙ্গে তার বিয়েটাও তো লিল্লিবেটের মতই ছোটোখাটো একটা গৃহযুদ্ধ। একটা সামাজিক বিপ্লব।

যদিও তাঁদের স্ট্র্যাথমোরস পরিবার ছিলেন জমিদারের বংশ। প্রজারা যথেষ্ট মান্যগণ্য করতো। বাড়িতে লেখাপড়া ও গানবাজনার যথেষ্ট চর্চা ছিল। যতই থাকি। যতই জমিদার হোক না কেন। তাঁরা ছিলেন নিছক গ্রামের মানুষ। তাই যখন তারা পাকাপাকি ভাবে লণ্ডনে বাস করতে এল তখন শহরের কোন অভিজাত পরিবারই তাদের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে চাইতো না। একটু যেন অবজ্ঞাই করতো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁদের পাশের বাড়ির কাউন্টেস লিসেচস্টার। অত মানীগুণী অভিজাত ওঁরা। কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলামেশা করতেন। ভালবাসতেন তাদের।

একদিন কাউন্টেস তার মণ্টেগু হাউসের বাড়িতে একটা ভোজসভায় তাদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে বসলেন। এই পার্টিতে লণ্ডনের যত হোমড়াচোমড়া এমন কি রয়্যাল ফ্যামিলির লোকরা পর্যন্ত একেবারে ঝেঁটিয়ে এসেছিল।

তিনিও গিয়েছিলেন মায়ের হাত ধরে গুটিগুটি। তাদের পাশে এসে বসলেন এমন এক দম্পতি যাঁদের নিয়ে শুরু হয়ে গেল মৃদু গুঞ্জন। আর সেই চাপা ফিসফিসানির ঝড়ের ভেতরে তার স্পষ্ট কানে এল একটি কথা—

হিজ একসেলেন্সী কিং জর্জ দি ফিফথ।

তার পাশের চেয়ারে বসলেন সম্রাজ্ঞী। আর ঠিক তার চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খুব ফুটফুটে সুন্দর আর ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার একটি ছেলে। কতই বা বয়েস হবে। সে তখন মাত্র পাচ বছরের মেয়ে আর ছেলেটি নয় কি দশ

যাই হোক ছেলেটি কিন্তু তার সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল। কি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠল—ওমা! তুমি চেরী ফল খাও না?

না খাই না। আমার ভাল লাগে না—সে নম্র স্বরে বলেছিল—তুমি নেবে—বলেই তার কেকের ওপর থেকে রক্তবর্ণ কয়েকটি চেরীফল ছেলেটিকে দিয়েছিল।

বাঃ দুটিতে তো বেশ ভাব জমে উঠেছে। ঠাট্টা করে বলেছিলেন কাউন্টেস লিচেস্টার।

সেদিন থেকেই কি যে হলো। তাঁর মনের আয়নায় নিশিদিন জ্বলজ্বল করতে লাগল ছেলেটির সুন্দর ধারালো মুখখানা। কিন্তু—

ছেলেটি তো আর যে-সে নয়। রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে। তার ওপর আবার দস্তুরমত সিংহাসনে আসীন রাজা পঞ্চম জর্জের ছেলে—বার্টি। যতই রাজার ছেলে হোক। রাজাবাড়ির বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বার্টি কিন্তু যখন-তখন তাদের বাড়িতে চলে আসতো। আসতো তাদের লণ্ডনের কাছে ব্যালমোরের বাড়িতে, কখনো বা চলে যেত তাদের স্ট্র্যাথমোরদের কান্ট্রি হাউসে। ব্যালমোরের ঝিলের ধারে গ্রামের বিশাল বাড়ির বাগানে পপলারবীথির ছায়ায় ছায়ায় তাদের প্রেম বন্যলতার মতই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু—

ঝড় উঠল সেইদিন। সেদিনটা তাঁর জীবনের একটা রোমাঞ্চকর দিন। স্পষ্ট মনে আছে তারিখটা।

১৯২৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছে দিনটা নাকি অশুভ। কিন্তু ওসব ভ্রূক্ষেপ না করে আকাশে কালো মেঘ, তুষারের ঝড মাথায় করে বার্টি নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছিল তাদের বাড়ি। আর একটুও ভনিতা না করে একেবারে সোজাসুজি বাবা-মাকে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

তাঁরা খুশি হলেন। তাঁরা জানতেন তাঁদের মেয়ের জন্য বার্টির মনে আছে অগাধ ভালবাসা।

তারপরে বার্টির মুখেই শুনেছেন তিনি। অত্যন্ত রাশভারী কিন্তু কৌতুকপ্রিয় তার পিতৃদেব সম্রাট পঞ্চম জর্জকে কথাটা বলতে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। তার ওপর আবার বার্টি ছিল বেশ তোতলা। তাই নোটবুকে বেশ করে মনের কথাটা গুছিয়ে লিখে তার বাবাকে দিয়েছিল।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ নাকি অত্যন্ত গম্ভীর আর কঠোর হয়ে গিয়েছিলেন মুহূর্তের জন্য। ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—সে কি হে—ওরা যে 'কমনার'। তুমি যে রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে। তুমি তো জানো রাজবংশের বিয়েসাদীর নিয়ম-কানুন কত কঠোর।

কিন্তু অনেক বাধা, অনেক ঝড় পেরিয়ে অ্যালবার্ট বা ডিউক অফ ইয়র্ক ওরফে বার্টি তাকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর উল্টে দিয়েছিলেন বহু পুরনো

আর অর্থহীন সেই প্রথা—রাজপরিবারের ছেলেদের ইউরোপের কোন অভিজাত রাজবংশের মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে।

—কী এত ভাবছো মা? লিলিবেটের কথায় যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রাজমাতা লেডী এলিজাবেথ বাউলস লিয়ন।

ফিলিপ তো অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। বংশকৌলীন্য তেমন কিছু নেই—এসব কথা মেয়েকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে যেন তাঁর গলাটা চেপে ধরল। একটা কথাও বলতে পারলেন না। শুধু তাঁর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

ডার্লিং মেরীর কান্না থরোথরো মূর্তি, লিলিবেটের কঠিন অনমনীয় সঙ্কল্প দেখে এবং হয়তো বা নিজেরই বিয়েকে কেন্দ্র করে সেই আলোড়নের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন ষষ্ঠ জর্জ। কিন্তু বললেন—প্রজাদের ভোট নাও। তারা যা বলবে তাই হবে।

সেই ব্যবস্থাই হলো। লণ্ডনের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র দায়িত্ব নিল এই কাজের। সেই ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, রাজকুমারার পক্ষে মতামত দিয়েছে শতকরা ৬৪ জন। আর অসম্মত শতকরা ৩৬ জনও পরে তাদের মত বদলে ছিল। রাজা আর আপত্তি করতে পারলেন না। বরং একটু যেন বেশিই খুশি হয়েছিলেন। অবশ্যই তার কারণ ছিল।

ডেনিস সাহেব জানিয়েছেন ষষ্ঠ জর্জ ভয়ানক স্ট্রিক্ট প্রিনসিপ্যালের লোক। জনসাধারণের ফিলিপ সম্বন্ধে ইমপ্রেসান কেমন যাচাই করার জন্য আবার একটা ভোট নিয়ে দেখলেন—যত লোক রাণীকে কমনওয়েলথের সর্বময় কর্ত্রী বলে মেনে নিতে রাজী তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি লোক প্রিন্স ফিলিপকে কুইনস কনসর্ট হিসেবে পেতে চায়।

এই প্রসঙ্গে ডিউক অফ এডিনবরা পরে একসময় বলেছিলেন, "আমার পপুলারিটি দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের একেবারে সীমানায় দাঁড়িয়েও ডিউক আজও আশ্চয হয়ে যান তাব ডার্লিং আলেকজান্দ্রাকে দেখে। এক এক সময় তাকে দেখে তার মনে হয়, যেন তার আলেকজান্দ্রা নয়, লিলিবেট নয়—যেন কোন সুদূর অজানালোকের এক রহস্যময়ী রমণী।

মাথায় বাইজ্যান্টাইন রাজমুকুট। হাতে রাজদণ্ড। আর এক হাতে শান্তির প্রতীক সোনার পায়রা নিয়ে যেমন, যেমন পার্লামেন্টের প্রারম্ভিক বক্তৃতার (Speech from the throne) সময় ঠিক তেমনি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের নির্জন শয়ন-প্রকোষ্ঠে তার প্রিয়তমা পত্নী হিসেবে—শান্ত নির্লিপ্ত মুখাবয়ব। কোন সময়েই

যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত তেমনি কোন অবস্থায় কখনও বিচলিতও হয় না। প্রশান্ত মুখে হাসি হাসি সরলতা। আর ভাসা ভাসা আর বড় বড় দুটো নীল চোখে কেমন সুদূর অপার্থিব দৃষ্টি।

যেন এক দূর গহনের কোন অন্তর্বর্তী লোকে তার আলেজান্দ্রার মনের বাস। সেখানকার কোন থৈ কখনো পান না ডিউক।

রাজমাতা কুইন মেরীর জীবনীকার হেক্টর বালিয়ের লেখা থেকেও জানা যায়, যে কোন পরিস্থিতিতে শান্ত অবিচল থাকা, মনে গভীর প্রশান্তি বজায় রাখা ইত্যাদি তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো রাণী এলিজাবেথ পেয়েছেন তাঁর মায়ের কাছে থেকে। পরিষ্কার করেই হেক্টর বলেছেন বাস্তবিকই রাণীর (ষষ্ঠ-জর্জের স্ত্রী) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় সদগুণগুলোর প্রভাব পড়েছিল পরবর্তীকালের ইংল্যাণ্ডের দুই শাসনকর্তার ওপরে—তাঁর স্বামী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ এবং তাঁর কন্যা ভাবী সম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথ।

রাণীর সেই আশ্চর্য স্বভাবের কথা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল—মনে পড়ে গেল সেইদিনটির কথা।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। এই শুভদিনটিতেই তাঁর লিল্লিবেট বা রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সেই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির আলো-ঝলমলে করোনেশান হলে হাজার হাজার দর্শকের সামনে সে তার অপরিসীম সৌন্দয বহন করে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আশ্চর্য! গ্রেটবৃটেন এবং কমনওয়েলথ দুনিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর একটা বিশাল ভূখণ্ডের অধিশ্বরী হয়েও নেই এতটুকু চাঞ্চল্য, নেই উল্লাস। শান্ত অবিচল। গভীর স্থৈর্যের এক প্রদীপ্ত রমণীমূর্তি। এমন কি—

এমন কি রাণীর অভিষেক উপলক্ষে বৃটেনের প্রখ্যাত জননেতা এবং প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যখন আবেগকম্পিত উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—"আমাদের ইতিহাসে রাণীদের যুগ—অত্যন্ত গৌরবময় যুগ। সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের যুগ ছিল—গ্রেটবৃটেনের তথা পশ্চিম ইউরোপেরই স্বর্ণযুগ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ইংল্যাণ্ডকে নতুন চিন্তায় নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত করেছিল। বিদ্যা আর সংস্কৃতি ব্যবসা আর শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল—তাঁদের মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন রাণী এলিজাবেথ। এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, তার শাসনকালও ইতিহাসে চিরকালের মত চিহ্নিত হয়ে থাকবে—তখনও সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক বক্তৃতা শুনেও তিনি অকম্পিত একটি

দীপশিখার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে কেমন নির্বিকার ঔদাসীন্য আর বড় বড় দুটো নীলাভ চোখে সুদূর ও স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি।

হয়তো রাণীর এলিজাবেথের এই আশ্চর্য আত্মমগ্ন প্রকৃতি লক্ষ্য করে অভিষেকের সময় তাঁর খুব কাছাকাছি বসেছিলেন এমন এক বিশপ বলেছেন, "আমার জীবনের সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সমাগত বিপুল জনমণ্ডলীর দিকে রাণীর দৃষ্টি ছিল না। তিনি যেন শুধু তদ্গত হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিচ্ছিলেন তাঁর জীবনব্যাপী মহানব্রতের বেদীমূলে। সেই দৃশ্য—

সেই মুহূর্তের দৃশ্য আমি কখনো ভুলবো না—ভুলতে পারবো না। যখন তিনি পবিত্র তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে বেদীর ওপরে স্থাপন করলেন তখন মনে হলো যেন তিনি তাঁর মনপ্রাণ তাঁর সমস্ত সত্তা সঁপে দিলেন—বহুজনহিতায় বহু জনসুখায়—

তাঁর এমনি কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। পিতা মহামান্য ষষ্ঠ জর্জের চেয়ে রাণীর ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র আর কেউ ছিলেন না। অথচ সেই পিতার ফুসফুস অপারেশান হবে। তিনি জানতেন—সেটা খুবই কঠিন অপারেশান। সেই অস্ত্রোপচারের দিন তারিখ যেই ঠিক হলো অমনি তাঁর যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছিল তাঁর বুকের ভেতরটা। ঠিক সেইদিন সেই সময় আর্তত্রাণের উদ্দেশ্যে একটি চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধনের প্রোগ্রাম ছিল তাঁর। একদিকে পিতা আর একদিকে কর্তব্য। জনগণের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি। কর্তব্যই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। তিনি যে সম্রাজ্ঞী। তাই চিন্তাক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তিনি চলে যেতে পেরেছিলেন চিত্রপ্রদর্শনীতে।

আবার সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সেই অস্ত্রোপচারেরই মাত্র পনের দিন পরেই রুগ্ন দুর্বল পিতাকে রেখে তাঁরই আদেশে তাকে চলে যেতে হয়েছিল আটলাণ্টিকের ওপারে তাঁর প্রথম স্বাধীন কমনওয়েলথ সফরে। আর পিতার মৃত্যুশোক যে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সহ্য করেছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শীরা কখনো ভুলতে পারবে না।

গভীর সুখে কি মর্মান্তিক দুঃখে এতটুকু বিচলিত না হয়ে প্রগাঢ় প্রশান্তির ভেতরে নিমগ্ন হয়ে থাকা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের চরিত্রের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায়—

যেমন তাঁর রাজ্যাভিষেক উৎসবে তেমনি তাঁর জীবনের পরম শুভলগ্নের দিনটিতে বা তাঁর বিবাহোৎসবের সময়েও তিনি সেই যেন কোন সুদূর নক্ষত্রলোকের স্নিগ্ধ আলোকশিখার মতই প্রদীপ্ত। কিন্তু স্থির এবং অচঞ্চল।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৭। আজও চার চারটি দশকের সীমানা পেরিয়ে

এসেও প্রৌঢ় ডিউকের মনের অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে তাঁর বিয়ের দিনটির স্মৃতি। তাঁর অনেক গুরুতর কাজের ভেতরেও ডিউক অফ এডিনবরা থেকে থেকে সেই উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য সুখস্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে যান—

সহজ কথা তো নয়, হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দ্য সিক্সথের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের বিয়ে। উল্লসিত হয়ে উঠল সারা লণ্ডনের বাসিন্দারা।

তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। শহরের এখানে সেখানে হাড়ল হাডল গর্ত। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া এক একটা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। বড় বড় এক একটা ইমারতের গায়ে কালো কালো পোড়া দাগ। মানুষের মন বিষণ্ন। হতাশ। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় আকুল। পোস্টওয়ার ইনফ্লেসন—যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি। জিনিসপত্রের দাম আগুনছোঁয়া।

এই প্রসঙ্গে ডিউকের জীবনীকার ডেনিস সাহেব জানিয়েছেন তাঁর বিয়ের সময়ে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রিন্স ফিলিপ নিজেই বলেছেন—It (marriage) sent a bright staff of light and colour in the austere atmosphire of the postwar period…সেই সময়—সেই কঠিন দুঃসময়ে দুঃখ-দুর্যোগের পরিবেশের ভেতরে আমাদের বিয়ের খবর যেন অনেক—অনেক রং আর অনেক আলোর ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল!

বিয়ের প্রায় মাস তিনেক আগে থেকেই সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছিল। উৎসবের সাজে সেজেছিল সারা শহর। লণ্ডনের গর্ব হাইড পার্কটা, যার সমস্ত মাঠটা জুড়ে ছিল ট্রেঞ্চের বড় বড় সুড়ঙ্গ। তার ধারে ধারে এলোপাথাড়ি খোঁড়া মাটি। কোথাও ভলভলে নোংরা কাদা। সেই পার্কের ভোলই পালটে গেল।

সাবেক চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তো সোজা কথা নয়—লণ্ডন শহরটা যে ধনী এবং তার যে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আছে, তা বুঝতে পারা যেত এই অভিজাত ও সুদৃশ্য হাইড পার্কটার দিকে একনজরে তাকালে। পার্কের চারিদিকে ছিল এক একটি বিশাল সুদৃশ্য প্রাসাদ। গ্রেটবৃটেনের বিপুল সমৃদ্ধির যুগে ওগুলো তৈরি হয়েছিল। এখন তার সব জৌলুস আর সৌন্দর্য হারিয়ে কেমন করুণ চোখে দূরে শহরের আঁকাবাঁকা আর কুটিল গলিঘুঁজির দিকে তাকিয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতন থেকে শুরু করে একেবারে প্রথম মহাযুদ্ধ বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১৯১৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে এই হাইড পার্ক ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগের একটা সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য-

শালী জাতির সবচেয়ে ধনী একটি শ্রেণীর বিপুল সম্পদের বাহ্যিক রূপ।

এই পার্কের ঘন সবুজের ঐশ্বর্যে ভরা, অভিজাত ও ছিমছাম সেই পুরনো চেহারা আবার ফিরিয়ে আনা কঠিন হলেও তার কাজ শুরু হয়েছিল এই বিয়ের বছর দুয়েক আগেই। যেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের রণাঙ্গনে কামান-বন্দুকের আওয়াজ যেদিন স্তব্ধ হলো সেই দিনই যুদ্ধে আহত, ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মত হাইড পার্কের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু—

হলে কি হবে? কাজ চলছিল শম্বুক গতিতে। সেই ধীর বিলম্বিত লয়ে কাজ কবে যে শেষ হতো বলা কঠিন। কিন্তু যেই বাকিংহাম প্যালেস থেকে তাদের বিয়ের সরকারী ঘোষণা হল অমনি অবিশ্বাস্য দুরন্ত গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল। ভোজবাজীর খেলার মত কোথায় থেকে এসে পড়ল বুলডজার, এল বড় রোলার। বুলডজার দিয়ে পার্কের চারদিকে অবাঞ্ছিত ঝুপড়ি ঘর আর এবড়ো-খেবড়ো কাঠের স্তূপ ভেঙে ফেলে, আস্তে আস্তে রোলার দিয়ে মাঠ সমান করা বা লেভেলিং-এর কাজ শুরু হলো। আরবের তৃণশূন্য ধু ধু মরুভূমিকে যেন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন ক্রিকেট গ্রাউণ্ড তৈরি করার আয়োজন হলো। একদিন সত্যি সত্যি ঘাস বোনা হলো। আর প্রকৃতিও তার নিয়মে সেই খেলায় মেতে উঠল। আর দেখতে দেখতে ঘনসবুজের ছবির মত হয়ে উঠল হাইড পার্কের উদ্যান। যুদ্ধকালীন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে হাইড পার্ক যেন হেসে উঠল। ঋতুচক্রের আবর্তনে চারিদিকের গাছে গাছে কচি সবুজ পাতা দেখা দিল আর সেই সঙ্গে শুরু হলো নানারঙের ফুলের সমারোহ।

পার্কের সেই সুখী হাস্যোচ্ছল চেহারার দিকে তাকিয়ে লণ্ডনের নাগরিকদের হয়তো মনে হয়েছিল, অনাগত ভবিষ্যতের ঘটনা আগে আগে তার ছায়া ফেলতে ফেলতে যায়। তাদের একান্ত প্রিয় রাজকুমারী এলিজাবেথের এই বিয়ে সুখের হবে। তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন আলো করে বসবেন। আর ইংল্যাণ্ডকে সুখী এবং সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল দেখার জন্যই তাঁর পরমায়ু যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

ডিউক নিজেই বলেছেন আমাদের বিয়েতে লণ্ডনের প্রত্যেকটি নাগরিক এত খুশি হয়েছিল, তা বলে ব্যাখা করা যাবে না। তাঁরা প্রত্যেকে জানিয়েছিল আন্তরিক শুভেচ্ছা আর আমাদের সুদীর্ঘ সুখী দম্পত্য জীবন—On the occassion of our marriage each and all wish us happiness and pray we may enjoy long conjugal life.

লণ্ডনের পাবলিক যে তাদের বিয়েতে কত খুশি হয়েছিল তা বুঝতে পারা গেল বিয়ের দিন। ২০ নভেম্বর ১৯৪৭ সেই কাকডাকা ভোরেই গোটা লণ্ডন শহরটাই যেন রাজপথে বেরিয়ে এসেছিল। যেদিকে তাকাও হাস্যোচ্ছল জনতা। তাদের প্রত্যেকের যেন রাস্তা একটাই—একটাই তাদের গন্তব্যস্থল—

বাকিংহাম প্যালেস।

বিয়ের বর্ণাঢ্য সেই শোভাযাত্রা—সেই রয়্যাল ওয়েডিং প্রসেশান দেখতে হবে। কেমন সুদৃশ্য আর বিশাল সেই করোনেশান ক্যারেজে করে বিয়ের সাজে সেজে যাবে তাদের বড প্রিয় এলিজাবেথ। সঙ্গে থাকবেন হিজ একসেলেনসি কিং জর্জ দ্য সিক্সথ। গাডির আর এক দিকে থাকবেন কুইন মাদার মেরী এলিজাবেথ এবং তাঁর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা। রাজবাডির মানুষদের তো আর বড একটা সহজে দেখা যায় না তাই—

একটু বেলা বাডতেই ভিড একেবারে উপচে পডল। বাকিংহাম প্যালেস থেকে প্রাচীন চার্চ ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি পর্যন্ত সেই সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

তারপরেই ডেনিস সাহেব জানিয়েছেন কুমারী এলিজাবেথ আর প্রিন্স ফিলিপের সেই বিয়ের সমারোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক আর্থার ব্রাইয়্যাণ্ট (Arthar Bryant)। ডিউক অফ এডিনবরার জীবনবৃত্তান্তের প্রসঙ্গেই মিঃ ডেনিস তাঁর বিয়ের বিবরণ জানিয়েছেন ব্রাইয়্যাণ্টের জবানীতে—

রাজপথের দুপাশে অপেক্ষমান জনসাধারণ যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ঠিক তখন বাকিংহাম প্যালেস থেকে চারদিক সচকিত করে বিউগিল বেজে উঠল। শুরু হয়ে গেল রাজকীয় সেই বর্ণাঢ্য শোভযাত্রা। প্রথমেই নজরে পডল দূরে বহুদূরে বিপুলব্যাপ্ত নীলাভ আকাশের নিচে মনে হল, একটুকরো বেগুনি রঙের সচল মেঘের ছায়া ধীরে—খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন ব্যাণ্ডের বাজানাটাও এগিয়ে আসছে। উৎসুক হয়ে উঠল জনসাধারণ। তাদের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজছে।

রক্তাভ বেগুনি রঙের লংকোট আর কালো ভেলভেটের টুপি পরা একদল অশ্বারোহী সৈনিক বাজনার তালে দুলে দুলে এগিয়ে এল। এরা রাজবাডির খাস ডোমোস্টিক ক্যাভালরি। তারা পেরিয়ে যেতেই জনসাধারণের মনে হয়েছিল এইবার—এইবার বুঝি তাদের প্রিয় কুমারী এলিজাবেথকে বহন করে সেই সুদৃশ্য বিশাল করোনেশান এগিয়ে আসবে।

কিন্তু—তা এল না। শরতের ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা মেঘের রং ধরল। আর তারপরেই রূপালী আলোর একটা ঢেউ যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। মাথায় সাদা ধবধবে পাখীর পালকের টুপি গায়ে রক্তবর্ণ দীর্ঘ কোট—রাজবাড়ির দেহরক্ষীদের শোভাযাত্রা মার্চ করে এগিয়ে এল। তারপরেই সেই বিশাল করোনেশান ক্যারেজে করে এলেন রাজকুমারী এলিজাবেথ প্রিন্স ফিলিপ ষষ্ঠ জর্জ আর কুইন মাদার। তাদের দেখেই পথের দুধারে জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল। হাত নেড়ে নেড়ে তাঁদের উল্লাসিত জানাতে লাগল।

সেই রঙীন মিছিল তাদের নয়ে এল ইংল্যাণ্ডের অনেক অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধ অনেক অভিষেক অনেক বিবাহোৎসবের স্মৃতি জড়ানো সেই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে।

তাবপরে আর কি, আচবিশপ অফ ক্যান্টারবেরি বিয়ের সেই সুপ্রাচীন-কালের ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়াপ্রকরণ বা Traditional rituals শুরু করলেন। ডিউক আর রাজকুমারীর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন, আমার একান্ত প্রিয় ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমরা পরম করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁরই পবিত্র এই উপাসনালয়ে সমবেত হয়েছি এই তরুণ এবং তরুণীটিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে, এই কথাগুলো বলে প্রিন্স ফিলিপ আর এলিজাবেথের দুটো হাত এক করে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন এবার তোমরা শপথ করো—"আমরা পরস্পরকে ভালবাসবো, শ্রদ্ধা করবো, সস্নেহ আচরণ করবো এবং আমরা দুজনেই দুজনের বাধ্য থাকবো এই অঙ্গীকার আমরা করছি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং দৃঢভাবে।" পুরোহিতের এই কথাগুলোই ডিউক আর এলিজাবেথ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মত করে বলে গেলেন।

এইবার হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দি সিক্সথ, কুইন মেরী এবং তাঁদের রাজবংশেরই আরো কয়েকজন ব্যক্তি বর-কনেকে মাঝখানে রেখে শোভাযাত্রা করে চলে এলেন প্রেয়ার হলের একেবারে শেষপ্রান্তে। সেখানে ম্যারেজ রেজিস্টারে তাদের দুজনের স্বাক্ষর করালেন।

শেষ হলো ম্যারেজ সারভিস বা বিয়ের অনুষ্ঠান।

তারপর ?

আমরা দেশবিদেশের সাংবাদিকরা একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। রাজকুমারীর ট্রিমেণ্ডাস পপুলারিটি দেখে। অ্যাবি থেকে বাকিংহামে ফেরার পথে জনসমুদ্র যেন আরও উত্তাল হয়ে উঠল। হর্ষোৎফুল্ল জনতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের

জোয়ারে যেন ভেসে ভেসেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন রাজপ্রাসাদে।

সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও অনেক—অনেক বিস্ময়। বড় হলঘরে পা দিতেই আমাদের চোখের দৃষ্টি চমকে উঠল—একটি ৯ ফিট উঁচু আর ৫০০ পাউণ্ড ওজনের কেক। তার চারটি থাক। এক একটি থাকে ধরে রয়েছে চার পাঁচটি রূপোর স্তম্ভ। আর প্রতিটি রূপোলী পিলারের গায়ে নিপুণ হাতে খোদাই করা রয়েছে এলিজাবেথ এবং ফিলিপের বংশের মর্যাদাসূচক অস্ত্রসম্ভার। তার পাশে পাশেই রয়েছে চিনির মণ্ড দিয়ে তৈরি কারুকার্যখচিত এক একটি ফলক। সেইসব ফলকের কোনটার গায়ে আঁকা রয়েছে বাকিংহাম প্যালেস, কোনটায় উইণ্ডসর ক্যাসল আবার কোনটায় বালমর্যালের রাজপ্রাসাদ। আর ঠিক তার নিচে নিচে বর-কনের জীবনের নানা আকর্ষণীয় কার্যক্রমের এক একটি নকশা যেমন রয়্যাল নেভির দীর্ঘ মাস্তুলে তার প্রতীক চিহ্ন, গ্রেনাডিয়ার গার্ডসের কর্নেলের (একসময় রাজকুমারী এই বাহিনীর কর্নেল ছিলেন) ব্যাজ। আর তার পাশেই একটা শিল্ডের নক্শা। তার ভেতরে ফিলিপ আর রাজকুমারী এলিজাবেথের নামের আদ্যক্ষর জ্বলজ্বল করছে।

যেমন ওয়েডিং কেক, তেমনি বিয়ের পোশাক। রাজকুমারী এলিজাবেথের এই বস্ত্রাভরণটি ছিল ব্রিটিশ শিল্পনৈপুণ্যের একটি অসাধারণ সুদৃশ্য নিদর্শন—Masterpieces of British design and workmanship...

ঐতিহাসিক এই পোশাকটির কলাকার নরম্যান হার্টনেল তাঁর ডিজাইনটি নিয়েছিলেন বাকিংহাম রাজপ্রসাদের দরবারকক্ষে দেওয়ালে সাজানো প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত হাতির দাঁতের মত শ্বেতশুভ্র রেশমের বা আইভরিসিল্কের পোশাকে শোভিত বিয়ের পাত্রীদের প্রতিকৃতি থেকে। নীলাভ রঙের ক্রেপের সুদৃশ্য স্কার্টের চারিদিকের প্রান্তদেশে সূচীশিল্পের কারুকাজ। আইভরি সিল্কের ব্লাউজের হাতায় সাদা মেঘের মত শুভ্র জরির কাজ। জামার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নীল পশমের টুপি, তাতে শোভা পাচ্ছে, পাখির শুভ্র পালক। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কনের একেবারে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েও তার সীমানা ছাড়িয়ে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো প্রায় শিশিরের মত নরম আর স্বচ্ছ রেশমের দীর্ঘ এক বহিরাবরণ বা গাউন। তার গায়ে আবার মুক্তো এবং হীরের তৈরি ইয়র্কের গোলাপের কি কমলাফুলের অপূর্ব কারুকাজ শোভা পাচ্ছে।

এই অসাধারণ সুদৃশ্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত রাজকুমারী এলিজাবেথকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্সরা। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের এই বিবাহোৎসবের প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন,—এই বিয়েতে

পাত্রীর সুদৃশ্য মহার্ঘ সেই পোশাক, সেই ওয়েডিং কেক এবং বিয়ের গাড়ি—সেই করোনেশান ক্যারেজের বিচিত্র সজ্জা, বহুমূল্য দানসামগ্রী—সব মিলিয়ে বৃটেন এই একটিমাত্র বিয়েতে তার বিপুল ঐশ্বর্যের এমন বিস্ময়কর প্রাচুর্য দেখিয়েছিল যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশ আমেরিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ বা ধনী মহানগরী হলিউড তা কল্পনাও করতে পারে না— ...an array of wealth as Hollywood has never dreamed of...

ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারী। ইংল্যাণ্ডের ভাবী অধিশ্বরী। তাঁর বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথিও বলাবাহুল্য রাজারাজড়রা। তাই বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই পৃথিবীর দুই-দুইটি গোলার্ধই আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। উড়ে উড়ে আসতে শুরু করেছিলেন পৃথিবীর দেশদেশান্তর থেকে মহামান্য অতিথিরা। বেলজিয়ামের রিজেণ্ট চার্লস কাউণ্ট ফারদাণ্ডিজ, রুমানিয়ার নৃপতি মাইকেল, সুইডেনের রাজকুমার ভবিষ্যৎ নৃপতি, নেদারল্যাণ্ডের রিজেণ্ট রাজকুমারী জুলিয়ানা, নরোওয়ের রাজা কিং হ্যাকোন, সুইডেনের রাজকুমারী এবং ভাবী অধীশ্বর গুস্তাভ অ্যাডলফ, ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি উইলিয়ম এবং রোডেশিয়া, স্পেন, যুগোস্লোভিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও পৃথিবীর আরো অনেক দেশের রাজপ্রতিনিধিরা। মহামান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের বর্ণাঢ্য সমাবেশে সারা লণ্ডন শহর উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল।

সাংবাদিক ব্রাইয়্যাণ্টের বিবরণ এইখানে শেষ করে ডিউকের জীবনীলেখক ডেনিসসাহেব বলেছেন, ষাট বছরের সীমানায় পৌছে আজ প্রৌঢ় ফিলিপের ধুসর চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে আসে সেইদিনের রঙিন স্মৃতি। পৃথিবীর নানা দেশের গণ্যমান্য নৃপতি প্রধানমন্ত্রী রাজপ্রতিনিধিদের বর্ণাঢ্য সমাবেশে সারা লণ্ডন শহরকেই মনে হয়েছিল তাঁর সমগ্র ভূমণ্ডলেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিয়ের পাত্রীর চারদিকে আলো করে বসে থাকা ব্রাইডসমেড বা পাত্রীর সহচরী অসামান্য রূপসী প্যামেলা মাউণ্টব্যাটেন, রাজকুমারী মার্গারেট, মার্গারেট এলফিনস্টোন প্রমুখ হাস্যোচ্ছাস তরুণীদের উপস্থিতি সব—সব যেন ডিউকের মনে হয় কোন জন্মজন্মান্তরের একটা মধুর স্বপ্নের রঙীন বিভ্রম!

শুধু বিয়ের স্মৃতিই নয়, পিছন ফিরে তাকালে তার মনের ভেতরে প্রেতের মত নিঃশব্দে মিছিল করে যায় আরো অনেক—অনেক সমস্যা, অনেক সংঘাত আর অনেক বিক্ষোভ বিদ্বেষে কুটিল এক একটি ঘটনা। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে দেশ ও দশের কাজে তাঁর অসামান্য সাফল্যে, নানা জনহিতকর কাজে তাঁর তৎপরতা। এখনও তিনি বিপুল প্রাণসম্পদের প্রাচুর্যে তেজী ঘোড়ার

মত টগবগিয়ে ছুটছেন...At the 60 years of age Philip looked back on a life crammed full of truimphs and public activities as well as many serious problems conflicts...

ফিলিপ তাঁর বিয়ের কথা বলতে বলতেই মন্তব্য করেছেন, বিয়ের পরেই তিনি ইংল্যাণ্ডের এই প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী রাজবংশের এক প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা লিডিং মেম্বার অফ দি রয়্যাল ফ্যামিলি হয়ে গেলেন। এই পরিবারের সব দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ওপরে। বিয়ের ঠিক পাঁচ বছর পর ষষ্ঠ জর্জ মারা গেলেন। তখন তো কথাই নেই। তাঁর লিল্লিবেট তাঁর ডালিং এলিজাবেথ হলেন ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী। আর তিনি হয়ে গেলেন কুইনস কনসর্ট। একদিকে রাণীর সরকারী কাজে সাহায্য করা এবং তাঁকে নিয়মিত বুদ্ধিপরামর্শ দেওয়া আর একদিকে প্রৌঢ়া কুইন মাদার, তাঁর শ্যালিকা প্রিন্সেস মার্গারেট এবং নিজের চার বছরের পুত্র প্রিন্স চার্লসের দায়দায়িত্ব। উপরন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত তাঁর বৃদ্ধা, অসুস্থ বদ্ধ উন্মাদ মা প্রিন্সেস অ্যাণ্ড্রু। বাকিংহাম প্যালেসের ওপরের ঘর থেকে গভীর নির্জন রাতে তাঁর গুমরে গুমরে কান্নার সেই করুণ আর্তনাদ তাদের ঘুম কেড়ে নেয়। কী নিদারুণ সঙ্কটেই সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো কাটিয়েছিলেন তিনি আর রাণী এলিজাবেথ—Very difficult period for prince Philip and Queen.

তার ওপরে আবার সমস্যায় ফেলল মার্গারেট। প্রেম করে বসল। ছেলেটি রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন টাউনসেণ্ড। তুমি হিজ একসেলেন্সি কিং ষষ্ঠ জর্জের মেয়ে। রাজকুমারী বলে কথা। আর তুমি কিনা একটা গ্রুপ ক্যাপ্টেন—না...আর তিনি ভাবতে পারছেন না। তীব্র একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

রাজবাড়ির কেচ্ছা। যথারীতি চারদিকে মুখরোচক এক একটা গুজব বেশ পল্লবিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দোকানে বাজারে রাস্তায় লোকের চাপা ফিসফিসানি আর খুকখুক হাসি—

কঠোর ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠল ডিউকের মুখখানা। He dislikes anything that can diminish the dignity of the Royal family and the Crown. রাজপরিবার এবং রাজসিংহাসনের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছুকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিছুতেই না। প্রিন্সেস মার্গারেট জানে না। কল্পনা করতে পারবে না রাজবংশের ছেলেমেয়েদের বিয়ের রীতিনীতি কত ভয়ানক কঠোর কত রিজিড—ওরা জানে না—কী সাংঘাতিক inflexible. Royal etiquette for marriage.

॥ পাচ ॥

প্রিন্স ফিলিপ।

ডিউক অফ এডিনবরা। লেফটেন্যান্ট মাউন্টব্যাটেন। নাম তাঁর অনেক। কিন্তু পরিচয় একটাই—বৃটেনের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যায় তার আধুনিকীকরণ এবং তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সদাজাগ্রত প্রহরী। ডেনিসসাহেব বলেছেন—He is modernising Britain with technology and improving the image of monarchy.

শুধু তাই নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও তিনি এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। তিনি রাণীর সরকারী সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। প্রয়োজনীয় বুদ্ধিপরামর্শ দেন রাণীকে। সময় সময় সরকারবিরোধী পক্ষকে এমন সব জটিল প্রশ্ন করে বসেন, তাঁরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। দেশের আসল সমস্যাটির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন জনমত। এমন সুন্দর করে আর স্পষ্ট ভাষায় কঠিন একটা প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলেন যে রাস্তার একটা লোকও তাঁকে বুঝতে পারে—তাঁর কথা বিশ্বাস করে—Speaking out in such a way that a man in the street can easily understand. আরও অনেক কথাই বলেছেন তাঁর জীবনীপ্রণেতা ডেনিস জুডো। আর তাঁর কথা বলতে বলতেই তিনি আভাস দিয়েছেন রাজঅন্তঃপুরের একটি অত্যন্ত গুরুতর আর জটিল সমস্যার—

সেদিনও রাণী এলিজাবেথ খুব ভোরে উঠেছেন। রোজ যেমন ওঠেন। স্বামীর সঙ্গে প্রাতরাশের পালাও শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরে খবরের কাগজ পড়া শেষ করে চিঠির পাঁজা নিয়ে বসলেন। অফিসিয়াল জরুরী চিঠি ছাড়াও অসংখ্য চিঠি আসে প্রতিদিন তাঁর নামে। আর সেসব চিঠির বেশিরভাগই আসে অতি নগণ্য আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। তাতে থাকে তাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা আর সাহায্যের জন্য আকুল প্রার্থনা। অতি দ্রুত সেসব চিঠির ফয়সালা করে ফেললেন। তারপরেই তিনি পার্লামেণ্ট থেকে পাঠানো কাগজপত্র, প্রাইম মিনিস্টারের ফাইল ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলেন—এসব তাঁর ডেলী রুটিন—নিত্যদিনের কাজ।

বেলা বাড়ে।

দেশের নানাবিধ সমস্যার ভেতরে মগ্ন হয়ে যান ইংল্যাণ্ডেশ্বরী।

পাশের চেম্বারেই ডিউক রাণীর বাৎসরিক আয় এবং ভাতা বা পারসন্তাল অ্যালাউয়েন্সের হিসেবনিকেশ পরীক্ষা করছিলেন। সিভিল্স অ্যাক্ট অনুযায়ী রাণী

বছরে ৩,২,৬০০০০ পাউণ্ড অ্যালাউয়েন্স পেয়ে থাকেন। তাঁর বরাদ্দ হলো বছরে ১,৬০০০০ পাউণ্ড, আর কুইন মাদার মেরী এলিজাবেথের ২,৮০০০০। তারপরে প্রিন্সেস মার্গারেট তাঁর শ্যালিকা, তাঁর বড় পুত্র চার্লস, মেয়ে অ্যান, ছোট ছেলে অ্যানড্রু—প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে দেখলেন ঠিক ঠিক মত তাদের অ্যালাউয়েন্স জমা পড়েছে কি না। আর—

তারপরেই রাণীর অ্যাসেট্ অ্যাণ্ড প্রপার্টির ফাইলটি খুললেন। রাণীর সম্পত্তি যেমন বিপুল তেমনি অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় সেই ঐশ্বর্যের সম্ভার। বালমোর্যাল আর সাণ্ডিংহামের এস্টেট যেমন তাতে আছে, তেমনি আছে উইণ্টশায়ার ও সমারসেটের সম্পত্তি। আর আছে সারা ব্রিটেনের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা প্রায় এক লক্ষ খামারবাড়ি বা এগ্রিকালচারাল ফার্ম। এই দ্বীপের দেশের যতগুলো সোনারূপোর খনি আছে, সমুদ্রে যত মাছ আছে, মাটির নিচে যত তেল আছে, পেট্রোল আছে—সেই সমস্ত কিছুর মালিক ইংল্যাণ্ডের রাণী। এমন কি টেমস নদীর জলে যতগুলো সাদা হাঁস খেলে বেড়ায়, তার ভেতরেও ৫০০টি সাদা হাঁসেরও তিনিই মালিক। আর তাছাড়া মহামান্যা রাণীর রাজমুকুটে যেসব মহার্ঘ রত্ন এবং মনিমাণিক্যের সম্ভার শোভা পাচ্ছে তার দামই খুব কম করে ১৪০ মিলিয়ন ডলার। বাকিংহাম প্যালেসের ভোল্টে রাণীর যেসব অলঙ্কার আছে, তার দামই অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলার। আর রত্নখচিত তরবারি, হীরে জহরত মোড়া রাজদণ্ড, সোনার তৈরি ঈগলপাখির আকারের তৈলপাত্র, অভিষেক অনুষ্ঠানে তৈললেপনের জন্য রত্নমণ্ডিত চামচ, অভিষেকে ব্যবহৃত আংটি এবং সোনার ব্রেসলেট—এসব সম্পত্তির মালিক যদিও রাজশক্তি বা ক্রাউন, তবে এখন তো রাণীরই বলতে হবে।

রাণীর এই বৈচিত্র্যময় আর সুবিপুল সম্পত্তির তদারকির ভার কিন্তু পার্লামেন্টের ওপরে। রাণী তাঁর বিষয়সম্পত্তির আয় বাবদ বছরে পার্লামেন্টের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন প্রায় বারো লক্ষ ডলার।

প্রত্যেকটি আইটেম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ডিউক। এমন সময়ে যেন তার মনে হলো বাতাসে ভেসে এল একটা মিষ্টি সুগন্ধ।

রাণী এসে দাঁড়ালেন।

আকাশীরঙের স্কার্টের ফ্রেমে আটকানো তাঁর দীর্ঘ ছন্দিত দেহবল্লরী যেন একটা অগ্নিশিখার মত জ্বলজ্বল করছে। বাতাসে উড়ছে ঢেউখেলানো বাদামী রঙের একরাশ চুল। দুটো বড় বড় চোখে নিঃসীম সমুদ্রের নীল স্বপ্ন। কিন্তু—

লিপস্টিকের প্রলেপ ছাড়াই ডালিমের দানার মত যে দুটো টুকটুকে লাল

ঠোঁটে ঝিলিমিলি হাসি লেগেই থাকে, সে হাসি নেই। মুখখানা ভার ভার। চোখ দুটোও বিষণ্ণতায় থমথম করছে।

কি হয়েছে বলো তো? শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ডিউক।

কথা বললেন না রাণী। শুধু প্রতিমার মত সুন্দর আর সুডৌল মুখখানায় ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। অনেক—অনেক দূর থেকে যেন স্নিগ্ধ আর বেদনাতুর কণ্ঠে বললেন, মার্গারেট যে দারুণ প্রবলেমে ফেলেছে—কি করি বলো তো?

চুপ করে থাকলেন ডিউক।

শুধু তাঁর দুটো গালে চওড়া চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসল।

মার্গারেট আমার কাছে এসেছিল। খুব কান্নাকাটি করছিল, রাণী থেমে থেমে আর কেমন একটু সংকোচে বললেন, তোমাকে বলতে বলছিল তুমি মত করলেই হয়ে যায়—

নো ইমপসিবিল! নেভার—গর্জে উঠলেন প্রিন্স ফিলিপ, আমি কিছুতেই এই রয়্যাল ফ্যামিলির প্রেস্টিজ ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারি না—হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। মনে হলো যেন তীব্র উত্তেজনায় তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। মাথা নিচু করে নিজের মনেই গজগজ করতে লাগলেন, হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দি সিক্সথের মেয়ে আর কোথায় একটা গ্রুপ ক্যাপ্টেন—থেমে গেলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে স্ত্রীকে বললেন, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

চাপা হাসির আলোয় রাণীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিষ্টি আর অস্ফুট স্বরে বললেন, উঠতি বয়স। এখনকার প্রেম ভালবাসা তো কোন যুক্তিট্যাক্কর ধার ধারে না--

জানি সেটা। তাই বলে স্ট্যাটাসটা দেখতে হবে না? আর তুমিও তো জানো, রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কী সাংঘাতিক রেষ্ট্রিকশান। থেমে গেলেন ডিউক। লিলিবেটকে কোন শক্ত কথা বলতে তার কষ্ট হয়। তাঁর মোমের মত সাদা আর মসৃণ ও মনোরম হাত দুটো নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে বললেন, লিলিবেট, তোমার মনে নেই, তোমার জ্যাঠামশাই অষ্টম এডওয়ার্ডের ট্র্যাজেডির কথা—

রাণীর একেবারেই একান্ত নিজের বংশের পূর্বসূরীদের ব্যাপার তার অজানা থাকার কথা নয়। সেই শোকাবহ ঘটনা—ব্রিটিশ রাজনীতির কঠোর নিয়মের বলি—সেই দুধার প্রেম—এসবই তিনি ছেলেবেলা থেকে ভাসা ভাসা শুনে আসছেন। পরে অবশ্য সবই জেনেছিলেন। কিন্তু রাণী জানতেন না—সেই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েই প্রখ্যাত দুই ইংরেজ লেখক জে ব্রাইয়্যান এবং চার্লস

মারফি লিখেছেন একটি বই :

'উইণ্ডসর স্টোরি।'

এই বই থেকেই ডিউক সেই ঘটনারই কিছু কিছু অজানা তথ্য বললেন রাণীকে। তাঁর বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল।

শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছিল।

নর্থাম্পটনশায়ারের খালের ধারে শিকারীদের দলটা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল। তারা দু চোখে সন্ধানী দৃষ্টির আলো জ্বেলে দেখছিল তাদের শিকার—

না বাঘসিংহ ভালুক নয়। হাতী বা গণ্ডারও নয়। তারা খুঁজছিল—

শিয়াল।

অক্সফোর্ডের পড়ুয়া এবং অভিজাত এবং বড়লোক বাড়ির ছেলেদের একটি অতি প্রিয় নেশা—একটা স্পোর্ট—ফক্সহান্টিং। আর নর্থাম্পটনশায়ার ও হুইসেনডাইনের ধু ধু মাঠে হর্সরেস—ঘোড়দৌড়ের খেলা।

সেদিনটা বুঝি বিফলে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে। ঝাঁপিয়ে নামছে ঘন অন্ধকার। আর কি সেই সাংঘাতিক ধূর্ত—

এই যে—ওই দেখ—তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল—একটা শেয়াল খালের জল সাঁতরে পার হচ্ছে—গুলি চালাবি?

জলের ভেতরে বন্দুক ছুঁড়ে কোন লোভ নেই—

চল তাহলে জলে ঝাঁপ দিই। ওপারে গিয়ে একবার বাবাজী জঙ্গলে ঢুকে পড়লে আর পাওয়া যাবে না—

না। কেউ জলে ঝাঁপ দিও না, দলনেতা বুর্নাবি চিৎকার করে বলল, বরং ওপারে গিয়ে যেই জঙ্গলে ঢুকতে যাবে তখন গুলি করতে সুবিধে হবে—

কই কই, কোথায় শিয়াল দেখি, বলতে বলতেই ভিড়ের ভেতর থেকে মাথা বের করল ডেভিড। আর সঙ্গে সঙ্গে কারো কথা না শুনে দিল জলে ঝাঁপ!

শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা জল। আর প্রায় বিশ ফুট চওড়া সেই খাল। ডেভিডের হাত পা অবশ হয়ে এল। আর শিয়ালও এমন চালাক, ওপারের পাড়ে উঠলই না। ডুবসাঁতার কেটে কেটে চলে গেল সোজা উত্তরে—

একেবারে বোকা বনে গেল ডেভিড। সে অনেক কষ্টে পাড়ে উঠল। কিন্তু তার তখন জ্ঞান নেই বললেই হয়।

আরো একদিন।

ডেভিড গ্যালপিং চালে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে, হঠাৎ লাগাম টেনে তাকে থামিয়েই আবার চাবুক কষল তার পিঠে।

ঘোড়াটা গেল ক্ষেপে। দারুণ আক্রোশে এক চিৎকার করেই সামনের পা দুটো উঁচু করেই দিল ডেভিডকে মাটিতে আছড়ে ফেলে।

পুরো দেড়টি ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকল ডেভিড। অন্ধকার ঘরে তাকে রাখা হলো ছয় সপ্তাহ। তারপরেও প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন তাকে বেড-রিডন্ করে রাখা হলো। সেই শেষ।

ডেভিড তার ঘনকালো সার্জের তৈরি ব্রীচেজ, রক্তবর্ণ রেশমের সার্ট, তার প্রিয় সেই শিকারের পোশাক সেই যে তুলে রাখল আর কখনো পরেনি। পরতে দেওয়া হয়নি।

His chief fault in the hunting field was poor judgement… বলেছিল ডেভিডের শিকারসঙ্গী বুর্নাবি।

শুধু শিকারের ক্ষেত্রেই পুওর জাজমেণ্ট নয়! দুর্দান্ত আবেগপ্রবণ আর সাত-পাঁচ না ভেবে, ভবিষ্যতের কথা একেবারে চিন্তা না করে যে কোন বিপজ্জনক আর দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া—এই স্বভাব, তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর গোটা জীবনটাকেই একেবারে তচনচ করে দিয়েছিল। আর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসটাই বদলে দিয়েছিল।

এই ডেভিড তো আর যে-সে ছেলে নয়। অক্সফোর্ডের পড়ুয়া। ফক্সহান্টিং আর হর্সরেসিং নিয়ে মেতে থাকা এক সাধারণ ইয়ংম্যান নন। তিনি-ই—

অ্যালবার্ট। প্রিন্স অফ ওয়েলস। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাঁর পুরো নাম—এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ অ্যানড্রু প্যাট্রিক ডেভিড। পঞ্চম জর্জের পুত্র। আর গ্র্যাণ্ডমাদার অফ ইউরোপ, কুইন ভিক্টোরিয়া তাঁর বৃদ্ধা প্রপিতামহী। জন্ম—২৩ জুন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ছোটবেলা থেকেই কেমন বেপরোয়া, ডাকাবুকো ধরনের মানুষ। সারা ইংল্যাণ্ডের লোক জানতো, তাদের প্রিন্স এবং হেয়ার টু দি থ্রোন বা ভবিষ্যৎ রাজা যেমন রূপবান, তেমনি তাঁর বীরত্ব আর শৌর্য। কেন না, নর্থাম্পটনশায়ারের মাঠে শেয়াল শিকার আর ঘোড়দৌড়ের কথা তো কারও অজানা ছিল না। রাজবাড়ির ছেলে। যা করে যা হয়—বেশ ডালপালা ছড়িয়ে তারই প্রচার হয়ে যেত দিকে দিকে।

কিন্তু এসব ইতিহাস তো কারও আর অজানা নেই। নর্থাম্পটনশায়ারের ধু ধু মাঠে ঘোড়দৌড়ের খেলা আর ফক্সহান্টিং-এ অ্যালবার্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন

বেশ বুঝতে পারা যেত সেই বাঁধভাঙা উচ্ছৃঙ্খলতা, দারুণ বিপদের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি—কিন্তু—

তার আর একটা ব্যাপার কিন্তু বুঝতে পারেনি কেউ কখনও। কেউ জানতেও পারেনি। বন্ধুদেব দু হাতে ঠেলে তাডাতাডি বিদায় করে দিয়ে ডোভড কেন উঁচু টিলার আড়ালে চলে যেত, আর চনমন করে দূরে—বহুদূরে মেঠো পথের দিকে তার চোখ দুটোকে বিঁধিয়ে দিয়ে দাঁডিয়ে থাকতো। কার জন্য ছটফট করতো সে?

শহুরে লোকবা কেউ কিছু না জানুক নর্থাম্পটনশায়ারের বাসিন্দারা কিন্তু জানতো সব। তারা দেখত ভেডা আর গোরুব পাল নিয়ে রাখাল ছেলেদের দল ধুলো উডিয়ে আসছে। আর আশ্চয! তাদের সঙ্গে একেবারে হেলেদুলে গল্প করতে করতে আসছে এক ফুটফুটে চেহারার কিশোরী। ভোরের শিশিরে ভেজা বেগুনী আভা মেশানো রক্তবর্ণ ডালিয়ার মত অপরূপ তার মুখশ্রী তার বড বড আর নীলাভ দুটো ডাগব চোখে, খাডা নাকে প্রখর আভিজাত্যের ছাপ

এই মেয়েটিকে রাখাল ছেলেদের আধুনিকা এক অভিজাত বোনের মতই মনে হতো তাদের—Modern sister of the shephered boys...রাখালদের সঙ্গিনী বা বান্ধবী এই মেয়েটির সঙ্গেই হয়তো মজেছিলেন তাদের প্রিন্স। টিলার আডালে বসে দুজনে ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর করতো। আব সেই খুকখুক হাসি আর গল্প চলতো ঘণ্টার পব ঘণ্টা, যতক্ষণ না বডলোক বাডির মেয়েটিকে ডাকতে আসতো।

ওয়ালি।

তার রাখাল বন্ধুরা ডাকতো এই নামেই। কিন্তু বাডিতে তাকে ডাকে 'আউড্রে' বলে। নর্থাম্পটনশায়ারের লাগোয়া গ্রাম হুইসেনডাইনের এক বড ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি উইলি জেমসের মেয়ে—জেমস আউড্রে। জেমস আমেরিকান। কিন্তু বহুকাল হল ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা। সাকসেসের ডেনী পার্কে তার বিশাল এস্টেট। সেখানে তার রাজপ্রাসাদের মত বিশাল বাডি। খামার। কারখানা

কিন্তু ওয়ালির মা—ইংরেজ। অসামান্য সুন্দরী। সমাজের সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্যদের আদর আপ্যায়নে আতিথেয়তায় তাঁর কোন জুডি ছিল না। তাঁব বাডিতে নিয়মিত ভিজিটর ছিলেন অ্যাডেলবার্ট কাস্ট, সিক্সথ ব্যারন, লিঙ্কনশায়ারের এক লড লেফটেন্যান্ট। আসতেন আরও অনেকে।

হয়তো ওয়ালি তার বন্ধু অ্যালবার্টকেও তাদের বাডিতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই জানতো না এই ডেভিডের আসল পরিচয়। জানতো না সে পঞ্চম জর্জের পুত্র। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। জানালে হয়তো

এই দুটো ছেলেমেয়েকে জীবনের উদ্দাম স্রোত খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না। পারতো না ঘাটে ঘাটে তাদের ঠোক্কর খাইয়ে এঁকেবেঁকে দুমড়ে দিতে তাদের জীবন। কিন্তু সেসব কথা থাক।

নর্থাম্পটনশায়ারের সেই হান্টিং ফিল্ডে, উঁচু টিলার ছায়ায় কিম্বা চারদিকের বনবাদাড়ের নিচে নীলাভ অন্ধকারে, টলটলে জলে ভরা সেই খালের পাড়েই তাদের প্রেম ভালবাসা ধীরে ধীরে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর সে-ই হয়েছিল কাল। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসবিশেষজ্ঞরা বলেছেন নর্থাম্পটনশায়ারের বনেজঙ্গলে প্রেম নয়—জন্ম হয়েছিল একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সরীসৃপের। সে ঠিক সময় বুঝেই তার আক্রোশের বিষ উপড়ে দিয়েছিল। আর ইংল্যাণ্ডের বহুযুগের রাজবংশের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সেই মহিমাময় ইতিহাসটাকে বিষে জর্জরিত করে তাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু—

সে সব এখন থাক। আগে ঘটনাটি বলি—

ওয়ালি।

অ্যালবার্ট।

দুটো উথালপাথাল বয়সের তরুণ তরুণী পরস্পর মেলামেশা করলে যা হয়। তাই হয়েছিল। দুজন দুজনকে উদ্দামভাবে ভালবেসেছিল। একজন আর একজনকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারতো না। কিন্তু যখন তারা ভালবাসার জোয়ারে ভাসছিল, যখন তাদের পৃথিবী রামধনুর মত রঙীন হয়ে উঠেছিল, যখন তাদের জীবনে সন্ধ্যা নেমে আসতো স্বপ্নের মত আর জ্যোৎস্নায় কাঁদানে রাত্রি কেমন আমন্থর হয়ে উঠতো ঠিক সেইসময়—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ১৯১৮ সাল। প্রিন্স অ্যালবার্টের তখন অক্সফোর্ডে সেকেণ্ড ইয়ার চলছিল। বইটই সব সেলফে তুলে রেখে চলে গেলেন যুদ্ধে। গ্রেনাডিয়ার রক্ষীবাহিনীর কম্যাণ্ডিং আফসার হয়ে অ্যালায়েড আর্মি বা মিত্র শক্তির সৈন্যদের সঙ্গে বহু রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে উঠলেন। কেটে গেল পুরো চার চারটি বছর। কতবার তার কানের কাছ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল, কতবার একেবারে অনিবার্য মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু—

যেই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা তাঁর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল আর তিনি আগুনে পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন, তাঁর সোফার বা চালক তার চোখের সামনে ছাই হয়ে গেল তখন বাকিংহাম প্যালেস থেকে জরুরী নির্দেশ এল– ফিরে এসো—

No. Never—How can I prove my fitness to be king unless I can hold up my head among my own generation? রাজা

হিসেবে আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করবো কি করে যদি আমার প্রজন্মের মানুষের কাছেই আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারি—

এই হলো প্রিন্স অ্যালবার্ট—এই হলো প্রিন্স অফ ওয়েলস।

এই হলো অষ্টম এডওয়ার্ডের চরিত্র। প্রখর মর্যাদাবোধ, অসাধারণ আত্ম-সচেতন। উচ্চভিলাষী। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার আত্মপ্রত্যয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একবার—একবার তাঁর যা ভালো মনে হবে তা তিনি করবেনই, যতই বাধা আসুক যতই ঝড় আসুক। আর সেই জন্যেই বোধ হয় তিনি হয়ে গিয়েছিলেন—পৃথিবীর বর্তমান শতকের প্রথমদিকের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা সিকি দশকেরও কিছু বেশি সময় জুড়ে সবচেয়ে বিতর্কিত নায়ক—As a prince of Wales he attracted the best of the press of any figure in the first third quarter of the century…

কিন্তু কিছুই হতো না। ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে সমাসীন আর পাঁচ-দশটা নৃপতির মতই ইতিহাসের পাতায় শুধুমাত্র একটি নামের গৌরব নিয়ে যুদ্ধ রক্তপাত আর সন্ধির একটানা সেইসব ধূসর ইতিবৃত্তের ভেতরে কোথায় তলিয়ে যেতেন যদি সেই অঘটন না ঘটতো—

১৯২৯ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পনের বছর পরে এক শীতের সন্ধ্যায় লণ্ডনের জজ স্ট্রীটে ব্রাইয়্যানস্ট্যান কোর্টের সেই বিশাল বাড়ির করিডোরে হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী রূপসী তরুণীকে দেখেই চমকে উঠলেন অ্যালবার্ট। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের ভেতরে বিদ্যুতচমকের মত ঝলসে উঠল সেই পনের বছর আগের নর্থাম্পটন-শায়ারের সেই রাখাল ছেলেদের মর্ডান অ্যারিস্টোক্রাট সিস্টার ওয়ালির মুখখানা।

ওয়ালি ' ছুটে গিয়ে তার পথরোধ করে বলল ডেভিড।

ডে-ভি-ড—ও মাই গড উন্মত্ত আবেগে তার হাত দুটো জড়িয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তার অ্যাপার্টমেণ্টে। সেখানে বেঁটেখাটো আর স্মার্ট চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার হাজব্যাণ্ড—সিম্পসন—

আরও জানালো সিম্পসন একটি বিখ্যাত জাহাজী দালাল কোম্পানির (shipbrokers) কর্মকর্তা। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং পৃথিবীর আরও বহু দেশ জুড়ে তার ফলাও কারবার।

ওয়ালি কি বলছে, না বলছে কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না সিম্পসন। সে খরচোখে ডেভিডের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এবং ধারালো ঝকঝকে চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। তার বুকের ভেতরে গুরগুর করে উঠল। কিন্তু ডেভিডের বিশেষ পরিচয় শুনে খুব খুশি হল সিম্পসন। ভীষণ খুশি হল। আর তখন থেকেই

কি করে আখের গুছিয়ে নেওয়া যাবে, তার ফন্দীফিকির মাথায় আনাগোনা করতে লাগল।

সেই ব্রাইয়্যানস্টাইন কোর্টের ওয়ালিদের পাশের অ্যাপার্টমেণ্টে তখন থাকতেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। অতএব যা হওয়ার তাই হলো।

ছোটবেলার প্রেমভালবাসা সূর্যের আলোর মত। একবার যে মাটিতে পড়ে, সেখানে কার্বন ছড়িয়ে দেয়। মাটি ধীরে ধীরে উর্বরা হয়ে ওঠে, সেই প্রাণশক্তি সেই কার্বন কখনো যায় না মিলিয়ে। বরং দিনে দিনে আরও পুষ্ট হয়। সমৃদ্ধ হয়। শেষে উদ্দাম হয়ে ওঠে।

এখানেও তাই হলো। পনের বছর ধরে অবরুদ্ধ প্রেম বাঁধ ভেঙে ঝরনার মত শতধারায় উৎসারিত হয়ে তাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তলিয়ে গেল তারা। কখনো স্তব্ধ দুপুরের নিজনতায়, কখনো গভীর রাতের নিরালায়, আবার কখনো বা ভোরের আবছায়ায় ওয়ালি আসতো প্রিন্সের ঘরে। আর হাসিতে গল্পে পরস্পরের কবোষ্ণ নিবিড় সান্নিধ্যে ছন্দোসুরভিত হয়ে উঠতো তাদের মুহূর্তগুলো।

প্রিন্স অ্যালবার্ট।

পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের মহামান্য সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের জীবনবৃত্তান্তের এই পর্যন্ত ছিল বেশ স্বাভাবিক। আর গতানুগতিক একটি যুবক আর একটি যুবতীকে ভালবাসতেই পারে। বিয়েও করে ফেলতে পারে। কিন্তু—

রাজপুত্র বলে কথা। তার ওপরে আবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী Heir apparent তাকে অহরহো হাজারো চোখের শ্যেন দৃষ্টির পাহারায় নজরবন্দী থাকতে হয়। এসব যে অ্যালবার্ট জানতেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি এসব পরোয়া করতেন না। আর কোনকালেই রাজকীয় আদবকায়দা রীতিনীতির ধার ধারতেন না। সরকারী উৎসবে কখনো তিনি যেতেন না। জন্মে চার্চে পা দিতেন না। ইংল্যাণ্ডের রাজবংশে কালাপাহাড। তাই নিশ্চিন্তে এবং অবাধে ওয়ালির প্রেমে মগ্ন হয়ে রইলেন। অবশ্য যতদূর সম্ভব ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন।

কোন কিছুকেই যখন পাত্তাই দেন না, তাহলে গোপন কেন? না। পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছেন বলে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হওয়ার লোক অ্যালবার্ট নন। তাহলে?

প্রিন্স স্বপ্ন দেখেছিলেন। বড় দুর্মর সেই স্বপ্ন—তার ওয়ালি রাণী হবে। হবে তাঁর কুইন কনসর্ট। সিংহাসন আলো করে তাঁর পাশে বসবে। তাঁর মাথায় শোভা পাবে রত্নখচিত সেই রাণীর মুকুট।

তাই তার করোনেশানের আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।

অভিষেকের আগে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে অনেক অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সিম্পসন বড় সোজা লোক নয়। সে ডিভোর্স না করলে তিনি ওয়ালিকে বিয়ে করবেন কি করে। নানা অজুহাতে সিম্পসন টালবাহানা করে দেরি করিয়ে দিতে লাগল।

শুধু তাই নয়। আরো অনেক অনেকদূর এগিয়ে গেল সিম্পসন। কেলেঙ্কারীটা প্রধানমন্ত্রী বলডুইনের কানে তুলতে চেষ্টা করল। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব লণ্ডনের এক্স-মেয়র স্যার মরিস জেংকস আবার লণ্ডনের হাউসিং বোর্ডের চেয়ারম্যান। একটা ভালো ঘর চাই বলে একটা দরখাস্ত করে প্রিন্সকে দিয়েই রেকমেণ্ড করিয়ে জেংকসের দপ্তরে হাজির হলো।

কি আশ্চয—আপনি প্রিন্সকে চিনলেন কি করে?

মাথা নিচু করে বসে থাকল সিম্পসন।

আরে চুপ করে আছেন কেন? আমার সময় কম—

স্যার, আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাদের প্রিন্স, গুজগুজ করে সমস্ত বিষ উগরে দিল সিম্পসন। শেষে চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে কটু গলায় বলল, স্যার শুনেছি প্রিন্স ওয়ালিকে অলরেডি বিয়ের প্রোপোজ্যাল দিয়েছে। স্যার ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রেস্টিজ—ট্র্যাডিশান—

আপনি এখন আসতে পারেন, ধমকে উঠলেন জেংকস।

জেংকস আর দেরি করলেন না। পরদিনই প্রধানমন্ত্রী বলডুইনকে সব বৃত্তান্ত বললেন। তাঁর ভারি মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু জেংকসকে একটা কথাও বললেন না। বলতে পারলেন না। কি বলবেন?

জেংকসের আগে আরো দুজনের কাছে এই একই কথা শুনেছেন তিনি। তাঁদের ভেতরে একজন হলেন—মরিসগয়ের ফার্স্ট পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী। আর একজন প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য। এঁরা দুজনেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে গেছেন, দেখুন প্রিন্স যাই ভাবুন—এটা অসম্ভব। অবিশ্বাস্য। অকল্পনীয়—It is absurd, unbelievable—unthinkable! এসব কিছুই বললেন না জেংকসকে। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলেন।

অবশ্যই কারণ আছে। তিনি অপেক্ষা করলেন প্রিন্সের করোনেশানের জন্য। তার অভিষেকও তো আসন্ন। তাঁর মনে হল প্রিন্স থেকে একবার কিং হলে ক্রাউনের দায়িত্ব পেলে অ্যালবার্ট কখনো বেহিসেবী কাজ করবে না—করতে পারবেন না। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। শুধু তিনি কেন সারা দেশ তাকে ভালবাসে। ভক্তি করে।

ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাট। তরুণ। রূপবান। শৌর্যে এবং বীরত্বেও যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা তিনি হাতেনাতে প্রমাণ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাঁকে যখন 'ক্রয়কস দ্য গুয়ে'র পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, প্রিন্স বলেছিলেন, যুদ্ধে তিনি আর এমন কি করেছেন—তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস—তিনি ভবিষ্যৎ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলেই তাকে খাতির করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এমনি বিনয় আর নম্রতা ছিল যুবরাজের মধুর ব্যবহারে। অথচ সেই সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের সেই প্রশান্ত গাম্ভীর্যের এতটুকু কমতি ছিল না। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সমস্যার খোঁজখবর রাখতেন। তাদের বিপদের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাই—

এইসব কারণে দেশের কমনফোকের কাছে প্রিন্স দেবতার মহিমায় বিরাজ করে থাকেন। আর সেইজন্যেই হয়তো বাকিংহাম প্যালেস কি টেন ডাউনিং স্ট্রীটের অর্থাৎ কোর্টসার্কেলে তাকে নিয়ে গুজব ছড়ালেও তাদের কানে পৌঁছয়নি। আর শুনলেও তারা বিশ্বাস করেনি। করতে পারে না। অতএব—

এখনও সময় আছে। প্রিন্সের মাথা থেকে যাতে সেই উদ্ভট খেয়ালটা হটিয়ে দেওয়া যায়, ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনের সম্মান ও বিপুল দায়িত্বের কথা বলে, বুঝিয়ে যাতে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়—তার চেষ্টা করতে হবে।

পুরো একটা বছর কেটে গেল। ডিভোর্সের ডিগ্রী পেল না ওয়ালি। ওদিকে পার্লামেণ্টে একটা জরুরী অধিবেশনের পরে হলো রাজকীয় ঘোষণা—

২০ জানুয়ারী, ১৯৩৬ যুবরাজ অ্যালবার্টের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে। এই শুভসংবাদে সারা দেশ উল্লসিত হয়ে উঠল। উৎসবের প্রস্তুতি চলতে লাগল।

কিন্তু করোনেশানের ঠিক দুদিন আগে রাজপ্রাসাদের দুজন প্রবীণ অফিসার (senior palace officer) প্রধানমন্ত্রী বলডুইনকে বলল, স্যার প্রিন্স কিন্তু সেই ডিভোর্সি (সিম্পসনের আগেও ওয়ালির একবার ডিভোর্স হয়েছিল) ফ্লার্ট মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য খুব ঝুঁকেছে—

জানি—সব জানি—একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছে, বলডুইনকে কেমন ক্লান্ত আর হতাশ মনে হলো।

সেই প্রাচীন পবিত্র গীর্জা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে অ্যালবার্টের অভিষেক

হলো। যেমন হয়। সেই জর্ডনের পবিত্র জল ছিটানো, মন্ত্রপূত তেল মাখানো বা অ্যানয়েণ্টেড করা—তারপরেই এক হাতে রাজদণ্ড, আর এক হাতে শান্তির প্রতীক সোনার পায়রা নিয়ে রাজসিংহাসনে বসা। সব—সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করলেন যুবরাজ। করতে হয়। তাই করলেন। কিন্তু কেমন উদাসীন আর নিস্পৃহ। মনে হল, দূরে—বহুদূরে অন্য কোন জগতে যেন তাঁর মনটা ঘোরাফেরা করছে। তাঁর ধারালো মুখখানা ম্লান। বিষণ্ণ।

যুবরাজের এই অদ্ভুত মনোভাব প্রসঙ্গে আঠারো বছর পরে ব্রিটেনের বিখ্যাত শ্রমিকনেতা ক্লিমেণ্ট অ্যাটলী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন—হিজ একসেলেন্সি কিং এডওয়ার্ডকে কেমন ভীত আর অসুস্থ মনে হচ্ছিল। কিসের যেন দুশ্চিন্তায় মুখখানা থমথম করছে।

আজ প্রায় দু-দুটো দশক পেরিয়ে এসেও অ্যাটলীর পরিষ্কার মনে আছে—করোনেশানের সময় বলডুইনকে কেমন ডিপ্রেসড মনে হচ্ছিল। তিনি থেমে থেমে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন—নতুন এই রাজা কি সিংহাসনে টিকে থাকতে পারবেন ?

…"হিজ একসেলেন্সি তাঁর বিপুল দায়িত্ব আর সম্মানের কথা ভেবে যদি তাঁর বদখেয়াল আর ছেলেমানুষি ছাড়তে না পারেন, তাহলে সিংহাসন তাঁকে ছাড়তে হবে—এই কথাগুলোর ভেতরে বলডুইনের মতই বৃটেনের চ্যান্সেলর অফ দি এক্সচেকার নেভিল চেম্বারলেনেরও প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল

শেষপর্যন্ত বলডুইনের আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেল। সিংহাসনে বসতে না বসতেই ডাকাবুকো লোকটা দারুণ গোলমাল পাকিয়ে তুলল। কোন ভূমিকা না করে হিজ একসেলেন্সি প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন একটা চিঠি—আমি আমার নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করতে চাই…

৩ নভেম্বর, ১৯৩৬ ছিল এই ঐতিহাসিক চিঠিটার তারিখ। আর ২৭ অক্টোবর, ১৯৩৬, মাত্র সাতদিন আগে ওয়ালি ডিভোর্সের ডিগ্রি পেয়েছিল।

বলডুইনের মাথায় বাজ পড়ল। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করলেন। অষ্টম এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু এবং নামজাদা ব্যারিস্টার ওয়ালটার মঙ্কটনকে তিনি পাঠালেন তাঁর কাছে।

তুমি এসব কি পাগলামো করছো অ্যালবার্ট, দু-দুবার ডিভোর্স হওয়া একটা মহিলা হবে তোমার কুইনস কনসর্ট—

পার্লামেণ্ট অ্যাপ্রুভ না করলে হবে না।

আর তুমি ? তুমি সিংহাসন ছেড়ে দেবে ?

ওয়ালটার—হিজ একসেলেন্সির কণ্ঠস্বরটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল। পাথরে তৈরি গম্ভীর ধূসর বা।কংহাম প্যালেসের দিকে ইঙ্গিত করে যেন বহুদূর থেকে বললেন—ওয়ালটার ওই রাক্ষুসে বাড়িটার ভেতরে আমাকে তোমরা বন্দী করে রেখো না। আমার একটা আলাদা জগৎ আছে—আমারও একটা জীবনদর্শন—

তুই কী বলছিস ডেভিড—কি বলছিস—

বলছি এই পাথুরে বাড়িটার সোনার সিংহাসনে বসে তোমাদের শেখানো বানরের মত চলাফেরা করতে পারবো না।

মঙ্কটন বলডুইনকে রিপোর্ট করল—কোন লাভ নেই। ডেভিড ওয়ালি সিম্পসনকে পাগলের মত ভালবাসে। যত ক্ষতিই হোক, তাকে বিয়ে সে করবেই—

বাকিংহাম প্যালেসের বাতাসে যখন প্রচণ্ড উত্তাপ, যখন লণ্ডনের বাজারে পথেঘাটে মুখর হয়ে উঠেছে জোর গুজব—হিজ একসেলেন্সি তাঁর ভালবাসার মেয়েকেই বিয়ে করছেন এমন সময়—

ঘটে গেল একটা কাণ্ড। লর্ড রাদারমোরের পরিচালিত একটি পাত্রকা গোষ্ঠীর মুখপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো একটি খবর—হিজ একসেলেন্সি কিং অফ গ্রেটবৃটেন অষ্টম এডওয়ার্ড সিম্পসন ওয়া ল নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে., ব্রিটিশ পালামেণ্ট এবং মন্ত্রীসভা ইহাকে অনুমোদন দিবে—চঞ্চল হয়ে উঠল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা।

৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ পার্লামেণ্টের বিশেষ জরুরী অধিবেশন বসল। হিজ একসেলেন্সিকে জানানো হলো—আপনি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন—

তাঁর দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। ঠিক সাতদিন পরে ১০ ডিসেম্বর তাঁর সিংহাসনচ্যুতির দলিলে (Abdiction document) সই করে বাকিংহাম প্যালেস থেকে বেরিয়ে গেলেন –

থামলেন প্রিনস ফিলিপ।

কিন্তু জ্যাঠামশাই যা-ই করুন, অনেক বড মাপের মানুষ ছিলেন—কিন্তু সেণ্টি-মেণ্টাল ফুল, শক্ত হয়ে উঠল ডিউকের চোয়াল দুটো। ভেতরে ভেতরে অসহ্য একটা জ্বালায় পুড়ে যেতে যেতে অস্ফুটস্বরে বললেন, তিনি তো জানেন, Accession Council-এর অ্যাক্ট অফ সেটলমেণ্ট, ১৭০১, কিং হলো চার্চেরই একটা অঙ্গ। তিনিই ধর্ম নীতি আর বিশ্বাসের রক্ষক—Defender of faith। তাঁর বিয়েতে প্রধান ভূমিকা হলো চার্চের এবং আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরীর। আর তিনি কি

না, দু দুবার ডিভোর্স হওয়া একটা—উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। তীব্র ঘৃণায় ধিক্কারে জলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখদুটো।

একটা কথাও বললেন না রাণী।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুর্দান্ত আদর্শবাদী আর ডিসিপ্লিনড মানুষটার কাছে তাঁর প্রিনসিপ্যালের বাইরে কিছু বলে কোন লাভ নেই।

তুমি কি কিছু বলতে চাও লিলিবেট?

মার্গারেটের ব্যাপারে কি করতে চাও?

আমি ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি—

সে কি! কার সঙ্গে—

খুব বড় ঘরের ছেলে। যেমন পেটানো স্বাস্থ্য তেমনি চৌকশ লেখাপড়ায়। একটু থেমে আবার গর্বের সঙ্গে বললেন, ক্রাউনের ডিগনিটিও নষ্ট হবে না। এই প্রাচীন রাজবংশের সম্মানও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না—

সবই তো বুঝলাম। ছেলেটি কে?

আমাদের কোর্ট ফটোগ্রাফার অ্যাণ্টনি আর্মস্ট্রং—

॥ ছয় ॥

গাড়ির কনভয় চলছিল।

আমরা যাচ্ছিলাম জ্যামাইকার মণ্টেগু উপসাগর থেকে কিংস্টনের দিকে। প্রথম গাড়িতে ছিলেন রাণী এলিজাবেথ, এডিনবরার ডিউক এবং আমার স্বামী। পরের গাড়িটিতে আমি এবং রাণীর সখী লেডি অ্যালিস অ্যাগারটন।

পথের দুধারে হাস্যোচ্ছল জনতা। তাদের প্রত্যেকের পরনে রঙবেরঙের পোশাক। প্রত্যেকের হাতে হাতে হাতে নানারঙের ফুলের স্তবক। একবার—মাত্র একবার রাণীকে দেখার জন্য তারা সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো মুখে এতটুকু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই।

রাস্তার দুপাশের সেই বর্ণাঢ্য অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার চোখ ছিল রাণীর গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে। এই দ্বীপবাসী জনতার উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনায় রাণীর প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে?

হ্যাঁ। রাণী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝেই তিনি গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছেন। স্নিগ্ধ আর মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে নিচ্ছেন তাদের প্রীতির উপহার—ফুলের গুচ্ছ। কখনো বা হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আবার কখনো বয়সের ভারে নুয়ে পড়া কোন বৃদ্ধকে কুশল প্রশ্ন করছেন। আবার সাধারণ মানুষের

স্বতোৎসারিত সেই প্রীতি আর শুভেচ্ছার বিপুল জোয়ারে ভেসে ভেসে রাণী চলেছেন। কিন্তু—

এ কী! রাণীর দুধসাদা রঙের রোলস রয়েস থেমে গেল কেন? আমাদেরও থেমে যেতে হল। রাণী নিজে নেমে এলেন। বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে জমাট ভিড়ের ভেতর থেকে নেহাতই অত্যন্ত সাধারণ এক বৃদ্ধা কৃষক রমণীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, আমি—আমি আপনাকে দেখতে পাই-নি মা—মার্জনা করবেন, —একটু থেমেই আবার চঞ্চল হয়ে বললেন, কই দিন আপনার ফুল, সাদরে হাত বাড়িয়ে নিলেন গ্রামবৃদ্ধার উপহার—

কৃষাণীর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কোঁচকানো মুখে হাসি ঝিকমিক করছে। চোখের জলে হাসির আলোয় অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি।

তারপরে যেই গাড়ি থামল, অমনি ছুটে এলেন রাণী। বললেন তার বান্ধবীকে —অ্যালিস তুমি বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিয়েছে তো—ঠিকানা নিয়েছো? একটু থেমে আবার ছটফট করতে করতে বললেন, ভিড়ের ভেতরে আমি প্রথমে বৃদ্ধাকে দেখতেই পাইনি—ইস নজরে না পড়লে কী রকম খারাপ হতো বলো তো। অ্যালিস, আমি বৃদ্ধাকে চিঠি দেব—

আরো একদিন।

জ্যামাইকা সফরেরই আরো একটি ঘটনা। সেদিন আমরা চলেছিলাম লিনস্টেডের দিকে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল তার ভার। আমরা বেশ খানিকটা এগিয়েছি। এমন সময় নামল ঝুম বৃষ্টি। সেইসঙ্গে শুরু হলো মাথা-পাগলা বাতাসের এলোপাথাড়ি ঝড়। বাইরের পৃথিবীর সেই দুর্যোগের ভয়াল দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা দিব্যি গাড়ির ভেতরে বসে চলেছি।

থামাও গাড়ি—হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন রাণী। পথের দুধারে সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বয়স্কাউটের ছেলেরা। মুষলধারা বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে তাদের ইউনিফর্ম। ভিজে চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ইস বেচারারা একেবারে যে ভিজে গেল, ঠিক মায়ের মতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রাণী। ব্যাকুল হয়ে বললেন এতটুকু-টুকু বাচ্চা সব—ওদের ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে, একটু থেমে আবার বললেন, আমাকে গার্ড অফ অনার দিতে হবে না—ওদের চলে যেতে বলো,এবার তাঁর কথাগুলো আদেশের মত শোনালো।

জ্যামাইকার গভর্নর স্যার হিউফুটের পত্নী লেডি ফুট ছিলেন তাঁর সফরসঙ্গী।

তাঁর মনোজ্ঞ বিবরণেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় রাণীর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর আন্তরিকতা। তাঁর এই এই প্রগাঢ় মানবিকবোধ, তাঁর সহৃদয়তা, তাঁর অন্তহীন মমতার জন্যই ইংল্যাণ্ডের রাণীর জনপ্রিয়তা দেশের সীমানা ডিঙিয়ে কমনওয়েলথের দেশগুলোর পরিধিও ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

রাণীর অফিসঘরের ডেস্কে শোভা পায় সুদৃশ্য কারুকার্যকরা দুইটি বিশাল ফুল-দানীতে গাঢ় রক্তবর্ণ 'রেডকারনেশন' ফুলের স্তবক। রাণী ভালবাসেন ফুল। ভালবাসেন রংবেরংয়ের দেশবিদেশী ফুলের সমারোহ। কিন্তু বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তাঁর টেবিলে নিত্যি নতুন নতুন ডিজাইনের ফুলদানিতে চাই স্নিগ্ধ সতেজ রাশি রাশি রেডকারনেশন। আর ডেস্কের অদূরে একটি মেহগনির টিপাইয়ের (তেপায়া) ওপরে রামধনুরঙের কাঁচের জারে টলমল করছে সোনারঙের স্বচ্ছ মিষ্টি মদ।

হ্যাঁ। এই একটিমাত্র পানীয়-ই ভালবাসেন রাণী। আর ভালবাসেন রকমারি পোশাকের বৈচিত্র্য। কোনোদিন শিশিরের মত নরম আর স্বচ্ছ নীলাভ রেশমের জামা আর ধবধবে সাদা স্কার্টে মোড়া তার দীর্ঘ তন্বী দেহটা যেন আগুনের শিখার মত জ্বলজ্বল করে—আবার কোনোদিন বা গাঢ় সবুজ রঙের পোশাকে তাঁকে স্বপ্নের পরীর মত মনে হয়।

না। কখনোই রাণীকে কোন প্রসাধনের পরিপাটির জন্য সময় নষ্ট করতে হয় বলে মনে হয় না।' লিপস্টিক না দিতেই তাঁর মিহি ঠোঁট দুটো ডালিমের দানার মত টুকটুকে লাল। 'তাঁর দেহের ত্বক এত মসৃণ আর ঝকঝকে ও নিভাঁজ যে পাউডার-ক্রিম পমেডের কোন প্রয়োজনই হয় না। তাঁর একরাশ ঢেউখেলানো বাদামী রংয়ের চুলে ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রীতে ঘণনীলাভ বড় বড় দুটো চোখে বিধাতা তাঁকে উজাড় করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত রূপের ঐশ্বয।

রাণী লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। তাঁর কণ্ঠ মরালের মত। অতি ধীর পদক্ষেপে চলেন। কথা বলেন আস্তে আস্তে। আর কণ্ঠস্বরটাও অত্যন্ত স্নিগ্ধ আর মধুর।

প্রতিদিন সকালে মরালীর মত ধীর পায়ে রাণী তাঁর অফিসঘরে আসেন। ঘরে পা দিয়েই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেন—ফুলদানি পালটানো হয়েছে কি না, রেডকারনেশন ফুলগুলো যথেষ্ট টাটকা আছে কি না; টেবিল ক্যালেণ্ডার—ওয়াল ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয়েছে কি না।

রাণী ডেস্কে বসতেই প্রথমেই তাঁর নজরে পড়ে সেই গাঢ় লালটকটকে বাক্স। 'সিক্রেট রেড বক্স'। বাক্সের ওপরে সোনার জলে লেখা একটি শব্দ—

'দি কুইন'।

যে সব সরকারী বিশেষ জরুরী কাগজপত্র এবং চিঠি রাণীকে দেখতেই হবে, শুধু সেগুলোই এই বাক্সে ভরে পাঠানো হয়, তাঁর কাছে। রাণী কিন্তু এই বাক্সটা সরিয়ে রেখে প্রথমেই দেশের নগণ্য আর সাধারণ মানুষের লেখা চিঠির পাঁজা নিয়ে বসেন। কোথায় দেশের দূরপ্রান্তে কোন গ্রামের পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ে হয়তো পেন্সিলে আঁকিবুকি কেটে কি সব লিখে পাঠিয়েছে। সে চিঠিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন এবং তার উত্তরও দেন। কারা যেন রাণীর আশীর্বাণী চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যেও বাণী পাঠিয়ে দেন। প্রতিবছর রাণীকে অন্তত খুব কম্ করেও হাজার দেড়েক বাণী পাঠাতে হয়।

হার একসেলেন্সি যখন সকালে এইসব কাজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকেন, ঠিক তখনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় 'মাস্টার অফ দি হাউসহোল্ডে'র লোক। তার হাতে থাকবে সেদিন কি কি রান্না হবে, তার মেনুর খসড়া। লাল পেন্সিলে টিক দিয়ে নির্দেশ দেন কোন কোন 'আইটেম' রান্না হবে। আর অমনি কখনো বলতে ভুলে যান না—আর কার কার জন্য কি কি স্পেশাল মেনু তৈরি করতে হবে।

বাবুর্চিকে বিদায় করেই আবার কাজে মন দেন। কিন্তু আবার এসে দাঁড়ায় বাকিংহাম প্যালেসের টেলারিং ডিপার্টমেণ্টের হেড দর্জি। তিনি জেনে নেন, রাণীর কোন বিশেষ প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাকের প্রয়োজন আছে কি না। প্রতিবছরই বড়দিনের আগে ও অন্যান্য বিশেষ উৎসবের আগে রাণী নিজে বাজার ঘুরে ঘুরে পছন্দমত জামা-কাপড় কেনেন। পোশাক পছন্দ করার কাজে রাণীর দারুণ আগ্রহ।

বাকিংহাম প্রাসাদের মত বিশাল প্যালেসের পরিচালনা বা তাঁর ঘরসংসারের কাজ থেকে শুরু করে বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং তাঁদের পত্নীদের অভ্যর্থনা, কোথাও মিটিং, কোথাও দ্বারোদ্ঘাটন—সারাদিনে তাঁর অফুরন্ত কাজের ভেতরে একমুহূর্তের জন্যও তিনি ভুলতে পারেন না—তিনি মা, একজনের স্ত্রী। আর স্বামীর ভাল-বাসা ও সন্তানদের কলকণ্ঠে মুখর স্নেহমমতায় ঘেরা একটি সংসারের তিনি সর্বময় কর্ত্রী। প্রতিদিনই তিনি একটা সময়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। কখনো বা তাদের নিয়ে পিকনিকে মেতে ওঠেন কিম্বা তাদের ঘোড়ায় চড়া শেখান।

প্রাসাদের ভেতরে কি নিজের পরিবারের, কি বাইরের লোকজনের প্রত্যেকের সঙ্গে রাণীর ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিক এবং স্নিগ্ধ ও মধুর।

আপনাদের রাণী মানুষ হিসেবে কেমন ? একবার এক রিপোর্টার প্রশ্ন করে-ছিলেন বাকিংহাম্ প্যালেসের এক প্রবীণ কর্মচারীকে। এই ভদ্রলোকের কোন

আবেগটাবেগের বালাই ছিল না কোনকালে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের রাণী খুব ভালো লোক—একেবারে ভেতর থেকে ভালো—এই একটি মাত্র কথাতেই রাণী এলিজাবেথের সমস্ত চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বলা দরকার রাণী এই সরল, অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারটি পেয়েছেন তাঁর মা কুইন মেরীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে। তাঁর জীবনীকার হেক্টর বলিয়েঁা জানিয়েছেন—এলিজাবেথ বোয়েস নিওন বা কুইন মেরীর অনেক সদগুণের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের জীবনে।

জেনে রাখবি, মেয়েরা হলো বাড়ির অলঙ্কার। তাদের ব্যবহার হবে মধুর। তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। গানেগল্পে বাড়ি মুখর করে রাখবে—মেয়েদের প্রায়ই বলতেন লেডী স্ট্র্যাথসমোর (রাণীর মা কুইন মেরী)-দূরে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলতেন—আমরা গরীব ছিলাম। কিন্তু আমাদের সংসারে একটা শ্রী ছিল। পরিচ্ছন্ন রুচি আর আভিজাত্যের হাওয়া বইতো। আমরা বোনেরা প্রত্যেকে গান জানতাম। আমাদের ব্যবহারের খুব সুখ্যাতি ছিল—

তিনি যেমন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি করেই মেয়েদেরও মানুষ করেছিলেন। হার একসেলেন্সি কুইন এলিজাবেথের জীবনীপ্রণেতা হেক্টর স্পষ্টই বলেছেন—কুইন মেরী তাঁর সদগুণগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথের ওপরে।

অনায়াসেই বলা যায়, ইংল্যাণ্ড যে পেয়েছে এক আদর্শ সম্রাজ্ঞী তাতে লেডী স্ট্র্যাথসমোরের অবদান সবচেয়ে বেশি।

তবে শুধু নাচ গান আর ম্যানারস নয়। কুইন মেরী মেয়েদের শেখাতেন বেশি করে ঘরকন্নার কাজ। তিনি নিজে ছিলেন নিপুণ গৃহিণী। মেয়েদের বলতেন, শোন, মেয়েদের রান্না করা আর সেলাইফোঁড়ার কাজ,ঘর গোছানোতে —অঙ্ক শেখার চেয়ে ঢের বেশি লাভ—

রাণী এলিজাবেথ যে সংসারের সমস্ত কাজে পটুত্ব অর্জন করেছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল বাকিংহাম প্রাসাদের নিপুণ পরিচালনায়। প্যালেসের ছোটবড় প্রতিটি কর্মচারী রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর এই সাফল্যের রহস্য কি?

তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ মহল থেকে জানা যায় প্রাসাদের ভার পাওয়ার পর একদিন শুধু কার কি কাজ জেনে নিলেন। কাউকে যেমন ছাঁটাই, তেমনি কাউকে অদলবদলও করলেন না। আর কাউকে একবার কোন কাজের ভার

দিলে, আর কখনো তাতে নাক গলাবেন না। মানুষের ওপরে অগাধ বিশ্বাস, তার মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি।

রাণীর এই সরল, আন্তরিক এবং মানবিক ব্যবহারের জন্যই লণ্ডনের বাসিন্দাদের তো একেবারে বড় কাছের মানুষ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কখনো কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়ে কলিয়ারীর কুলিবস্তিতে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, কখনো বা শিশুদের জন্য একটা হাসপাতাল তৈরি বা আর কোন জনহিতকর কাজ নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন।

তবে বলা দরকার রাণীর জনসেবার এই প্রবণতা আছে তাঁর বংশানুক্রমিক রক্তধারায়। আজও—আজও দেখা যায় লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় অলিগলিতে অসুস্থ আর পঙ্গু মানুষদের সেবা করে বেড়াচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধা। প্রায় নব্বইয়ের কোঠায় এসে পৌঁছেচে তাঁর বয়স। সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছেন। গুলিসুতোর মত অজস্র রেখা আঁকা মুখে—কিন্তু নেই এতটুকু ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ। সারা লণ্ডনের লোক তাঁকে আদর করে ডাকে কুইনমাম বা রাণীমা বলে।

ইনিই রাণীর মা, মেরী এলিজাবেথ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত বাকিংহাম প্যালেসে সেই বিপদ মাথায় নিয়েও আহত সৈনিকদের সেবা করতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্বামী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। তাঁর একচল্লিশ বছর আগে হিজ একসেলেন্সি জর্জ দি সিক্সথের পিতামহ সপ্তম এডওয়ার্ডও ছিলেন লণ্ডনের জনসাধারণের একেবারে নিতান্তই আপনজন। এক একদিন এক এক রকম স্টাইলের পোশাক পরে রাস্তায় বেরোতেন। স্ফূর্তিবাজ। দিলদরিয়া মানুষ। লণ্ডনের সাধারণ মানুষের সমাজে এত বেশি অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছিলেন যে কয়েকটা স্ক্যাণ্ডেলে বা কলঙ্কজনক ঘটনায় জড়িয়েও গিয়েছিলেন। তা হোক—ইতিহাসে আছে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয় নৃপতি—An immensely popular Sovereign…

আজ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যেমন গরীবদুঃখীর সাহায্যের জন্য চাঁদা আদায় করে বেড়াচ্ছেন, কোথাও হাসপাতাল কোথাও বা স্কুল তৈরি করে দিচ্ছেন তেমনি তাঁর পনের ষোল বছর আগে তাঁর পিতামহ হিজ একসেলেন্সি পঞ্চম জর্জও জনসাধারণের নানা কল্যাণকর কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। মে মাসে, ১৯৩৫ সালে তাঁর শাসনকালের রজত জয়ন্তী উৎসবের বর্ণাঢ্যসমারোহেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রতি প্রজাদের অন্তহীন প্রীতি আর গভীর শ্রদ্ধা।

আসলে রাণী এলিজাবেথকে তৈরিই করা হয়েছিল তাঁর পূর্বসূরী নৃপতিদের আদলে।

কিন্তু কিছুই করতে হতো না। কোন প্রয়োজনই হতো না রাজকুমারী আলেকজান্দ্রাকে ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার তালিম দেওয়ার। রাজবংশের অত্যন্ত সাধারণ রমণী হয়ে রাজঅন্তঃপুরের এক প্রান্তে নিতান্ত অবহেলায় জীবন অতিবাহিত করতেন। কোনদিনই, কখনো বিশাল পৃথিবীর জনতাব সামনে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়াতেন না—যদি—

১৯৩৬ সালে অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে না যেতেন। তিনি তাঁর নিবিড় প্রেমের মহিমাকে শাশ্বত করে রেখে নিতান্তই তুচ্ছ সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করেছিলেন। শূন্য হয়ে গিয়েছিল সিংহাসন। রাজবংশের শত শত বছরের অবিরাম প্রবাহ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই রাণীর পিতা—বার্টি বা ডিউক অফ ইয়র্ক ষষ্ঠ জর্জকে নাম নিয়ে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল। আর তক্ষুনি তাঁর বড মেয়ে দশ বছরের ফুটফুটে কিশোরী রাজকুমারী লিলিবেটের রাণী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

যেদিন কিং জর্জ দি সিক্সথের অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হলো সেদিন থেকেই এলিজাবেথের স্কুলের পডাশুনা চুকিয়ে দেওয়া হলো। তাঁকে পডতে দেওয়া হলো দেশবিদেশের সংবিধান এবং শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বিবর্তন আর আইন। সেই সঙ্গে সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস। পডাশুনায় ছিল তাঁব অসম্ভব অনুরাগ। বছর চারেক পরে তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

১৯৪০ সাল। জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জোর যুদ্ধ চলছে। আজ এখানে কাল সেখানে বোমা পডছে। সেই ভয়ানক দুর্যোগ আর দুস্বপ্নের দিনে হঠাৎ লণ্ডন বি. বি. সি.র ছোটদের আসরে এক দারুণ বক্তৃতা শুনে চমকে উঠল দেশবাসী। সেই ভাষণে ছিল দেশের ভীত আর অবসন্ন মানুষকে শক্ত হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রেরণা ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

এই ছোট মেয়েটি কে জানি না, সেই বেতারকথিকা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন আফ্রিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার গারট্রুড মিলিন, "আজ থেকে এক যুগ পরে যদি পৃথিবীতে তখনো রাজারাণী থাকে তাহলে মেয়েটি নিশ্চয়ই একদিন আদর্শ রাণী হবে।

ঠিক তাই হয়েছিলেন। বি. বি. সি.র সেই 'টকার' চোদ্দ বছরের রাজকুমারী এলিজাবেথ সত্যিই আদর্শ রাণী হয়েছিলেন। আর সেই যে দেশের বিশাল জনসমাজের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর কোনদিন ফিরে যেতে

পারেননি। তারপরে তিনি কখনো গ্রিনেডিয়ার গার্ডসের কলোনেল, কখনো রক্ষী-বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে তাদের উৎসাহ দেওয়া আবার কখনো বা দুস্থ শিশুদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা শিশুক্লেশনিবারণী সমিতি বা ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশান অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেনের প্রেসিডেণ্ট হয়ে গ্রামে-নগরে জনপদে বক্তৃতা করে বেড়ানো এবং এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে আবার বাবা ও মার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া আরও কত অজস্র জনহিতকর ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকতেন। আজ বাষট্টি বছর বয়সেও তাঁর অবসর বলে কিছু নেই।

মনে হয় মেয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তৎপরতা যে কোন কাজে নিষ্ঠা দেখে ষষ্ঠ জর্জ তার অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাই যখন যুদ্ধে ইতালীর কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে চলে গেলেন কুমারী এলিজাবেথকে নিযুক্ত করে গেলেন কাউন্সেলর অফ স্টেট। এই সময় তিনি সরকারী কাগজপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দলিলে রাজার হয়ে স্বাক্ষর করতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। আর তখনো রাণী হয়ে তাঁর সিংহাসনে বসতে পুরো আটটি বছর বাকি ছিল।

কত অত্যন্ত জরুরী সরকারী কাজ, সমাজসেবা কত অফুরন্ত কাজের শ্বাসরোধী ব্যস্ততার ভেতরেও কিন্তু এলিজাবেথ পড়াশুনা এবং গানবাজনার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু কি তাই?

খেলাধুলোয় তার দারুণ উৎসাহ। তেজী ওয়েলার ঘোড়ার পিঠে চেপে চাবুক কষে তাকে বিদ্যুতগতিতে ছুটিয়ে চলে যেতেন উইণ্ডসর গ্রেটপার্কের একেবারে শেষপ্রান্তে। যেমন দারুণ ঘোড়সওয়ার তেমনি দুর্দান্ত সাঁতারু। মেয়েদের ভেতরে ঘোড়ায় চড়া আর সাঁতারে তার জুড়ি পাওয়া যেত না।

হ্যাঁ। তিনি জানেন। খুব ভালো করেই জানেন—ছোটবেলা থেকেই দেখছেন—উদ্দাম প্রাণশক্তিতে ভরপুর আর দুরন্ত আবেগে টগবগ করে ফুটছে তাঁর লিলিবেট। এইখানেই হয়েছে মুশকিল, বলেছেন ডিউক অফ এডিনবরার জীবনী-কার ডেনিস জুডো। প্রিনস্ ফিলিপ মনে করেন যাঁর ওপরে দেশশাসনের মত একটা কঠিন দায়িত্ব। তিনি যদি এত সরল উদার আর অমায়িক হন তাহলে তাঁকে একটু সংযত করে রাখার দরকার হয় বৈকি। আর রাণী এলিজাবেথের স্বামী বা কুইনস্ কনসর্ট হিসেবে এ কাজটা তাঁকেই করতে হয়। তাই ডিউক বলেছেন—He could act as a public watchdog.

প্রিনস ফিলিপ অনেক—অনেক ভেবেছেন, কি হওয়া উচিত কুইনস কনসর্ট হিসেবে তাঁর ভূমিকা! তিনি কি রাণীর সব কাজে নাক গলিয়ে আর খবরদারি করে ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের মত ভারচুয়্যালি কিংবা মূলত রাজা হয়ে বসবেন ?

না। তাঁর লিল্লিবেটের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয় ম্লান হয়ে যায় তাঁর 'ইমেজ' এমন কোন কাজ তিনি করতে পারবেন না। তাঁকে একদিকে রাজমুকুট বা ক্রাউনের সম্মান আর একদিকে দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও স্বার্থরক্ষার কাজে সতর্ক প্রহরী হতে হবে। তাঁর ভূমিকা হবে—ত্রাণকর্তার ভূমিকা—protective role।

কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। কঠিন আর বড় দুরূহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাজারো আইনকানুন বা প্রোটোকল এবং রাণীর অত্যন্ত অদ্ভুত মনের গঠনের জন্যই। বড় বিচিত্র মানসিকতার মহিলা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

একবার বৃটেনের খুব নামী একটা খবরের কাগজের রিপোর্টার প্রিন্স বলেছিলেন (এই ঘটনাটা ডেনিস জুডোকে) যাকে রাণী এবং তিনি যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক হঠাৎ রাণীর বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্বেষ আর আক্রোশে ভরা এবং ডাহা মিথ্যে একটা প্রবন্ধ লিখে বসলেন। বলা বাহুল্য প্রিন্স তো রাগে গরগর করতে করতে বললেন, প্রথম সুযোগেই আমি ওকে দেখে নেব—সে কত বড় সাংবাদিক—

না না—অমন কাজ কখনো করো না, সঙ্গে সঙ্গে রাণী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, উনি মানুষ কিন্তু খুব ভালো। কোন কারণে বোধ হয়—স্বামীর শক্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। আপন মনেই আবার বিড় বিড় করে বললেন, কোন না কোন পরিস্থিতি পড়েই তো মানুষ অন্যায় করে—

এই হলেন রাণী। কখনো কোন অবস্থাতেই কাউকে খারাপ ভাবতে পারে না; কখনো সহজে কারো নিন্দা করেন না তাঁর এই আশ্চর্য লিব্যারাল বা উদার মনোভাবের কারণ, ডিউকের মনে হয়, রাণীর জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অস্থিরতা আর উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের ঘণঘটার ভেতরে। কলকারখানায় লাগাতার ধর্মঘট চলছিল। উৎপাদন কমে গিয়েছিল হু হু করে। বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবন। তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

তিনি শেষরাত্রে ইয়র্ক বংশের প্রথম দৌহিত্রীর জন্মের শুভসংবাদটা পেয়ে উল্লসিত হয়ে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, দেশের দিকে দিকে নিদারুণ দুর্যোগ

এবং নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের ঘনায়মান কালো মেঘের ভেতরে যেন নবোদিত সূর্যের রশ্মির মতই মনে হচ্ছে এই নবজাতকের জন্ম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরে সেতারের রাগিণীর মত ঝঙ্কৃত হচ্ছে একটি প্রার্থনা—যদি কখনো এই নবজাত দৌহিত্রী ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন হয় তাহলে সে যেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়—শত্রুকেও ক্ষমা করতে সক্ষম হয় আর মহত্ত্ব ও উদারতা দিয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সফল হয়…

তাঁর এই আকুল বাসনা সার্থক হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে। অবশ্যই বলাবাহুল্য নাতনীর সাফল্যের পটভূমিকাটিও তিনিই প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। কেমন করে?

তাহলে একটু পেছিয়ে যেতে হয়। ইংল্যাণ্ডের এই শ্রমিক ধর্মঘটের মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল বর্তমান শতকের একেবারে শুরুতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্ব চলছে। সেই সময়েই জন্ম হয়েছিল বৃটেনের সবচাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল—শ্রমিক দল বা লেবর পার্টির। তখন থেকেই ধণী অভিজাতদের একচেটিয়া ক্ষমতা একটু একটু করে মেহনতী জনতা বা শ্রমিক মজুরদের কুক্ষিগত হচ্ছিল। তারপরে পঞ্চম জর্জের আমলে এই আন্দোলন রীতিমত পুষ্ট এবং গতিশীল হয়ে উঠেছিল—যার প্রভাব এতটুকু কমেনি বর্তমান রাণীর রাজত্বকালেও।

রাণীর পিতামহ পঞ্চমজর্জের ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা। ছিল শ্রমিক মজুরদের প্রতি তীব্র সহানুভূতি। তাই তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়। তিনি নাতনীকে নিজের কাছে রেখে মনের মত করে বড় করেছিলেন। রাণী মেরীর (পঞ্চম জর্জের মহিষী) ডায়েরীতে আছে ১৯২৮-২৯ সালের শীতে জর্জের ফুসফুসের কঠিন অসুখ থেকে কিছুটা সেরে ওঠার পরে ডিউক অফ ইয়র্ককে (পরে ষষ্ঠ জর্জ) জানালেন বগনরের কাছে গ্র্যাগওয়েলের প্রাসাদে লিল্লিবেট তাঁর সঙ্গে থাকবে।

তাই ডিউকের মনে হয় দু বছর বয়স থেকে খোলামেলা মনের এক উদারচেতা নৃপতির সান্নিধ্যে বড় হয়েছে বলেই লিল্লিবেট যে কোন শাসকের পক্ষে বেমানান রকমের লিব্যারেল।

তাঁরই হয়েছে সবচাইতে মুশকিল, ডিউক অফ এডিনবরার জীবনীতে লিখেছেন ডেনিস জুডো রাণী কোথায় কি বক্তৃতা করবেন তা তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দিতে হয়। কোথাও কোন বেফাঁস প্রমিজ বা শপথ করে রাণী পরে

বিপদে না পড়েন। শাসনতান্ত্রিক কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

আবার সময় সময় এমনও হয় রাণীর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে পাবলিককে বুঝিয়ে দিতে হয়। রাণী যা বলতে পারেন না তা তিনি অনায়াসেই খোলাখুলি বলে দিতে পারেন। এই তো কিছুদিন আগে কয়লাখনির ধর্মঘটী শ্রমিকদের সভায় রাণী আন্দোলনের নেতাদের সম্বন্ধে কঠোর কথাগুলো বলতে ইতস্তত করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স ফিলিপ উঠে দাঁড়িয়ে তাব্র এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় তাদের সমালোচনা করলেন। ধর্মঘট করে কয়লার উৎপাদন কমিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য শ্রমিকনেতাদের রীতিমত ভৎর্সনা করলেন যা রাণীর পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু রাণীর কাজে খবরদারি করার জন্য কখনো কোন সময় তাদের মনোমালিন্য হয়নি। রাণী কখনো বুঝতে ভুল করেন না যে তিনি জটায়ুর মত দুটো ডানা মেলে তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলেছেন আর ডার্ট-মাউথের সেই রয়্যাল নেভির রামধনুর মত রঙীন আর উত্তাল সেই দিনগুলোতে যেমন তেমনি আজও তিনি রাণীর বিশ্বস্ত বন্ধু। শুভাকাঙ্ক্ষী। আর বলতে কি, রাণীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখেই ডিউকের জীবন আবর্তিত হয়।

—পারিবারিক জীবনে আমি অত্যন্ত সুখী—জুডোকে বলেছিলেন প্রিন্স ফিলিপ, রাণী বলে লিল্লিবেটের এতটুকু অহমিকা নেই। সুগৃহিণী বুদ্ধিমতী।

ডেনিস জুডো জানিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যেমন তেমনি আজও রাণী ও ডিউকের পরস্পরের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত গভীর। তাদের নিবিড় প্রেমের স্বাক্ষর বহন করে বিয়ের এক বছর পরেই প্রথম জন্ম হয়েছিল পুত্রের—প্রিন্স চার্লস। তার দু বছর বাদে এল কন্যা প্রিন্সেস অ্যান। দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স অ্যানড্রু জন্ম হলো তার দশ বছর পরে। আর ১৯৬৪ সালে তৃতীয় বা কনিষ্ঠতম পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ডের জন্মের পরে চারটি সন্তানের জননী হলেন সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

সবচেয়ে আশ্চর্য চার-চারটি ছেলেমেয়ে মানুষ করে এবং সংসারের ঝক্কি সামলে ও বাইরে রাজকীয় নানা জটিল কাজের দায়দায়িত্ব বহন করেও তাদের ভালবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি। আজও তারা যে কোন বিষয়ে অনর্গল কথা বলতে বলতে মুখর হয়ে ওঠেন। হো হো করে হাসেন। বয়সের ভার তাদের একটুকু স্তিমিত করতে পারেনি। ম্লান বা বিষণ্ণ করতে পারেনি। পারেনি প্রৌঢ়ত্বের অনিবার্য পরিণতি সেই অকারণ খিটিমিটি, রাগ এবং বিরক্তিতে তাদের জীবনকে দুঃসহ করে তুলতে।

এই যে পারেনি আর তার ফলে তাদের প্রেমভালবাসায় ভরা আনন্দ-টলোমলো জীবনের আড়ালে আছে—ডেনিস জুডো বলেছেন,—ডার্টমাউথের রয়্যাল নেভির বেস্ট ক্যাডেট প্রিন্স ফিলিপের টগবগে তেজী ঘোড়ার মত অফুরান প্রাণশক্তি। তাঁর রক্তের ভেতরে আগুন ধরানো অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, শিকারের দুর্বার আকর্ষণ এবং পৃথিবীর দূরদূরান্তরে অজানা দেশের গ্রামে জনপদে ভ্রমণের দুরন্ত অভিলাষ—সবই প্রথম যৌবনেই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন লিল্লিবেটের ভিতরে।

আরো জানা যায় ডিউকের জাবনী থেকে—রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথম কয়েকটা বছর কারোই নজর এড়ায়নি যে রাণী কোন জনসমাবেশে স্বচ্ছন্দ ও জড়তামুক্ত হতে পারতেন না ডিউক সঙ্গে না থাকলে। ডিউকের মত দিলখোলা আর স্পোর্টিং স্পিরিটের লোক যদি তার স্বামী না হতেন তাহলে কিছুতেই তাঁর আড়ষ্ঠতা কাটতো না। সত্যি বলতে কি, সেই প্রথম পরিচয়ের পর থেকে বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যও জড়তা কি অবসাদের ভেতরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেননি তাঁর আদরের লিল্লিবেটকে।

বলা দরকার, শুধু ডিউক নয়—ভ্রমনের নেশাটা রাণী এলিজাবেথেরও ছিল। তার মা এলিজাবেথ বোয়েসের জীবনীকার হেক্টর বলেছেন লিল্লিবেট ছোটবেলায় তাঁর মায়ের সঙ্গে গ্ল্যামিসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের কি উইণ্ডসর প্যালেসের আশেপাশে কণ্ডাক্টেড 'টুর' পরিচালনা করতেন। হিজ একসেলেন্সি ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গেও পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন। সেইরকমভাবেই ডার্টমাউথের নেভি কলেজে রয়্যাল ভিজিটে বাবার সঙ্গে গিয়েই প্রিন্স ফিলিপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সমৃদ্ধি এবং সর্বঙ্গীণ উন্নতিতে ডিউকের অবদান কতটুকু? ডেনিস জুডো জানিয়েছেন—এই বিষয়টা নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। এবং নানা মুনির নানা মত। কিন্তু তাঁর মতে প্রিন্স ফিলিপ যেমন প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসার এবং বিধ্বংসী পরিবেশদূষণ প্রতিরোধের জন্য তেমনি, বিনা দ্বিধায় বলা যায়, মনার্কি বা ব্রিটিশ রাজতন্ত্র তথা বৃটেনের ইমেজকে আধুনিকীকরনও করেছেন এবং তাকে সমুজ্জল করেছেন।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের আগে আর কোন বৃটিশ রাষ্ট্রপ্রধান সীমাহীন দারিদ্র্য আর অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে

গিয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান শতকের চল্লিশের দশক থেকেই পৃথিবীর দূরদূরান্তরে অনুন্নত এবং অবহেলিত দেশগুলোতে গণজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সময়েই তৈরি হল—কমনওয়েলথ। আর বৃটেনের বৈদেশিক নীতিই হল—কমনওয়েলথের দেশগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। এখন বলা যায় তারই ফলশ্রুতিতে এবং রাণীর উৎসাহ ডিউকের দুর্বার ভ্রমণস্পৃহাতেই সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর দূরতম ও অজ্ঞাত এবং দুর্গম দেশে তাঁদের শুভেচ্ছা সফর। করোনেশানের আগেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কেনিয়ায়। আবার অভিষেকের পরের বছর ১৯৫৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের মে মাস—এই সাত মাসে রাণী ও ডিউক পরিভ্রমণ করেছিলেন বারমুডা, জ্যামাইকা, ফিজি, টঙ্গা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, উগাণ্ডা, মাল্টা এবং জিব্রাল্টর। যখন যে দেশে গিয়েছেন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা পেয়েছেন। সহস্রকণ্ঠে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি—

—জয় হোক—রাণী ও ডিউকের—

—দীর্ঘজীবী হন—রাণী ও ডিউক।

ফিজির কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ টঙ্গার প্রধানমন্ত্রী তো আবেগ সংযত করতে না পেরে বলেই ফেলেছিলেন—ইংল্যাণ্ডের মত দেশের রাণী যে আমাদের এই দ্বীপে পায়ের ধুলো দেবেন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কিন্তু এত উচ্ছ্বাসের! কারণ কি? তাঁর জীবনী লেখার আগে ডেনিসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারে ডিউক বলেছিলেন, দেখুন, আমার মনে হয়, মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা জ্যামাইকা, ফিজির মত এক একটা দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর কাছে ইংল্যাণ্ড হলো স্বপ্নের দেশ। আর সেই স্বপ্নের দেশ থেকে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে এসেছেন তিনি পুরুষ নন। রমণী। সুন্দরী। তাই হয়তো তাদের মনে হয়েছিল—সেই স্বপ্নের দেশ থেকে তিনি পরীর মত নেমে এসেছেন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে তাদের একটানা অভাব অনটনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে—

তারপর কখনো নাইজেরিয়া, কখনো ক্যানাডার সমুদ্রসন্নিহিত দুর্গম ও অজ্ঞাত এক একটা জায়গা আবার কখনো নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ডেনমার্ক—প্রত্যেক বছর নিয়মিত পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরা।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথ মশলা আর মসলিনের ব্যবসা করার অনুমতি বা চার্টার দিয়ে গুটি কয়েক ইংরেজ বণিককে পাঠিয়েছিলেন যে দেশে, আর বাণিজ্য করতে এসে যে দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে শাসনের নামে নির্বিচারে শোষণ করেছিল, যেখানকার মাটিতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কত তিক্ততা, কত বিদ্বেষ, কত ঘৃণা—সেই ভারতে এলেন তার তিনশো বছর পরে আর এক এলিজাবেথ (দ্বিতীয়)। এলেন বন্ধু হয়ে সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে। একবার নয়। দু বার। ১৯৬১তে টানা তিন সপ্তাহ ধরে দিল্লী, বোম্বে, আমেদাবাদ, কলকাতা, মাদ্রাজ ঘুরে রাণী তাঁর অমায়িক ব্যবহারে ডিউক তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় ভারতবাসীর মন জয় করে চলে গিয়েছিলেন। আবার বাইশ বছর পরে ৮৩তে দিল্লীতে কমনওয়েলথ সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসেছিলন রাণী আর ডিউক। আর এই বছরেই বৃটেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্যের জন্য ভারতকে দিয়েছিল ১৭১৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয় বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বা ইউরোপীয় কমিউনিটিগুলির মাধ্যমে ভারতে যেসব সাহায্য পাঠানো হয় তার সিংহভাগ বৃটেনের অংশ। তাঁদের শুভেচ্ছা সফরে সাংস্কৃতিক সখ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধের ভিতটাও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

ভারতবাসী কিন্তু প্রকৃত বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষাকে চিনতে ভুল করেনি। তাই প্রথমবারেই ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুরশাহকে যে বয়েত বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন উর্দু সাহিত্যের দিকপাল কবি মারজা গালিব দিল্লীর নগরপ্রধান রাণী এবং ডিউককে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন ঠিক সেই বয়েত আউড়ে—

তুম সেলামত রহো হাজারো বরষ
হর বরষকা দিন হো পঁচাশ হাজার।

তুমি বেঁচে থাকো হাজার বছর, সেই হাজার বছরের প্রতিটি বছরে থাকুক পঞ্চাশ হাজারটি দিন।

॥ সাত ॥

গাড়ি চলছে।

চলছে বড্ড আস্তে আস্তে। জানোয়ারগুলোর দানাপানি খাওয়ার সময় হলে আর নড়তে চায় না। কিন্তু—

তাড়াতাড়ি—খুব তাড়িতাড়ি যত শীগগির সম্ভব যেতে হবে। যন্ত্রণায় এডওয়র্ডের মাথার ভেতরটা জ্বলতে থাকে। এখনও অনেক—অনেক পথ বাকী। এখনও তারা রাইন নদীই পেরোতে পারেনি। রাইনের পরে রাইখসহ্বাল্ডের রিজার্ভ ফরেস্ট। বনের পরে ক্লেফে। ক্লেফে পেরোলে নীমভেগেনে পৌঁছতে পারলে জার্মান সীমান্ত!

আঃ—উঃ—মাগো—মরে গেলাম—গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে তীব্র একটা যন্ত্রণার অস্ফুট আর্তনাদ ভোরের বাতাসকে শিউরে দিয়ে চলে গেল।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এডওয়ার্ড।

শেষ পর্যন্ত লুইসি যেতে পারবে তো? তার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল চাপ চাপ অন্ধকার। তার মনে হলো সে যেন একটু একটু করে একটা অতল গহ্বরের ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

উঃ গড—আর পারছি না—পারছি না—নিদারুণ যন্ত্রণার গোঙানিটা যেন হঠাৎ ককিয়ে থেমে গেল।

তবুও সামনে এসে ছইয়ের ভেতরে উঁকি দিতে সাহস পেল না এডওয়ার্ড। এই বিদেশবিভুঁইয়ে—এই ধুধু ফাঁকা মাঠে কি করবে সে—কি করতে পারে! যদি কিছু হয়ে যায়—হবে। ছোটবেলা থেকেই তো সে অদৃষ্টের সঙ্গে দু হাতে লড়াই করে চলেছে, এখনও করে যাবে।

তার তো এখন উইণ্ডসর ক্যাসেলে কি বাকিংহাম প্যালেসের রাজকীয় বিলাস-বহুল জীবনের নিশ্চিন্ত আরামও স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে থাকার কথা। কই, তা তো হয়নি। জন্মভূমি ছেড়ে স্বজনপরিজন ছেড়ে কোথায়—কতদূরে জার্মানির এক নগণ্য জনপদ অমরবেচায় বেশ কয়েক বছর প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে এখন ইংল্যাণ্ডে ফিরছে। ফিরতে হচ্ছে।

কোন উপায় নেই। যেতেই হবে। তাই যাওয়া। যেতেও হচ্ছে নিতান্তই গরীব-দুঃখীর মত—দুটো হাডজিরজিরে মরকুটে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে। চলতে চলতে কখন যে ঘোড়া দুটো মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তার ঠিক নেই। ওদিকে হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই। নেহাতই পরের লোকেরা তাকে কিছু সাহায্য করেছিল। তাই রাস্তায় বেরোনো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এমন অসহায় হয়ে গরীব কাঙালের মত কেউ কখনো পথে বেরোয় না। অথচ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। সে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত রাজবংশের—

রাজপুত্র।

সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীও বলা যায়।

আঃ—উঃ—আমাকে বাঁচাও—আমি আর পারছি না—আবার সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার করুণ আর্তনাদে আড়ষ্ট ব্যথায় চমকে উঠল বাতাস। এবার ছটফট করে উঠল এডওয়ার্ড। চিৎকার করে ডাকল—ব্লম—বা—র্গ—

যে কজন বিশ্বস্ত অনুচর তার সঙ্গে ছিল তাদের ভেতরে একজন ব্ল-ম-বার্গ।

সে ছুটে এল। এডওয়ার্ড ব্যাকুল হয়ে বলল, দেখ তো ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোথাও শোয়ানো যায় কি না—

অনেক খোঁজ করে একটু দূরে পাওয়া গেল রাস্তার পাশে একটা ঘোড়ার আস্তাবল। আস্তাবলের লাগোয়া ঘোড়া দলাই-মলাই করার একটা ছোট খুপরিও আছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সেই খুপরিতেই পাথরের মেঝেতে টান করে ত্রিপল পেতে শোয়ানো হলো—ভিক্টোরিয়া লুইসি মারিয়াকে। যে-সে ঘরের মেয়ে নয়। স্যাকসে কোবার্গের ডিউকের আদরের বোন। আর সে ইংল্যাণ্ডের প্রিন্স—হতভাগ্য রাজকুমার তার স্ত্রী। অসামান্য রূপসী। দীঘল দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর খরযৌবনের সৌন্দর্য তাকে করে তুলেছে আরো মোহময়া। কিন্তু—

তার সুডৌল মুখখানার দিকে তাকাতে পারল না সে। যন্ত্রণায় নাল হয়ে গিয়েছে তার সেই সুন্দর মুখশ্রী। আর অসহ্য ব্যথায় মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তার সারা দেহ। এখন কি করবে সে—

একটা উপায় হলো। ঈশ্বর সহায় থাকলে সবই হয়। তা না হলে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ, তাঁর পিতা তো তাকে কম কষ্ট দেননি। আর সব ছেলেদের দরাজ হাতে টাকা-পয়সা দিতেন। নানাভাবে সাহায্য করতেন। আর যত কড়াকড়ি হিসেবে আর রাশ টেনে ধরা ছিল তাঁর বেলায়। তাঁর বিয়েও দিয়েছিলেন একেবারে নমো নমো করে। বিয়ের পর তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর খাওয়াপরা বাবদ দিতেন বছরে মাত্র ছ হাজার টাকা। এই সামান্য টাকায় সংসার চালানো যায়? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই দেশ ছাড়তে হলো। কোন একটা হিল্লে হবেই ভেবে চলে এসেছিল মারিয়াদের দেশ জার্মানির স্যাকসে-কোবার্গে। তার স্ত্রী লুইসির আগের স্বামীর দেওয়া অময়বেচার রাজপ্রাসাদে থাকতে পেরেছিল বলে রক্ষা।

বাবার পর বড়দা চতুর্থ জর্জ নাম নিয়ে বসলেন। তিনি আরও কঠোর আরও নির্মম হলেন। বাবা যা একটু-আধটু সাহায্য করতেন কখনো-সখনো, সে সব তো বন্ধ হলোই উপরন্তু চক্রান্ত করতে লাগলেন যাতে সে আর কখনই কোনোদিনও ইংল্যাণ্ডে ফিরতে না পারে।

কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। হওয়ার নয়। সেই কথায় বলে না, ভগবানের মার দুনিয়ার বার। চতুর্থ জর্জের ছেলেপুলে হলো না। তার পরের ভাই, ফ্রেডরিক ডিউক অফ ইয়র্কেরও সেই একই হাল হলো। কোন সন্তান কি-কন্যা-কি পুত্র উপহার দিতে পারল না ফ্রেডারিকের পরে তৃতীয় ভাই চতুর্থ উইলিয়মের স্ত্রী।

সর্বনাশ! ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে। হ্যাঁ—এইখানে এই ক্ষেত্রে তাঁর পোড়খাওয়া ভাগ্যটা যেন আশার আলোয় চিকচিক করে উঠল। লুইসির গর্ভে সন্তান এসেছে। তাঁর জীবনে অন্ধকার দিগন্তে রামধনুর রঙ ধরেছে। এখন শেষরক্ষা হলেই হয়।

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের তো বায়নাক্কা কম নয়। সিংহাসনে বসবে যে তার জন্ম শুধু রাজবংশে হলেই হবে না তাকে ভূমিষ্ঠ হতে হবে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। চতুর্থ জর্জকে আর্জি জানিয়েছিল—ডাচেজকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বা আনুষঙ্গিক খরচপত্র পাঠাতে।

যথারীতি নামঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল তার আবেদন। ইংল্যাণ্ডেশ্বর কোন সাহায্য তো করলেনই না বরং এমন ন্যক্কারজনক চক্রান্ত করেছিলেন যাতে মারিয়া লুইসিকে নিয়ে দেশে ফিরতেই না পারে। কিন্তু—

কপাল ভালো হলে কেউ ঠেকাতে পারে না। সারা ইংল্যাণ্ডে চাউর হয়ে গিয়েছিল তাঁর সংবাদটা—তৃতীয় জর্জের অভিশপ্ত পরিবারে বন্ধ্যা পুত্রবধূদের ভেতরে একমাত্র তাঁর স্ত্রী-ই একটু আশার আলো জ্বালিয়েছে। ইংল্যাণ্ডে যারা তাঁকে ভালবাসে তারা খুশি হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের সৈনিকরা। দীর্ঘকাল সে সেনাবিভাগের প্রধান অধিনায়ক ছিল। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রণনৈপুণ্য, তাঁর বীরত্ব ও সাহস দেখে তারা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো ভালবাসতো দেবতার মত। সেও তাদের পুত্রের মতই স্নেহ করতো। তারাই ছদ্মবেশে বিশ্বস্ত কিছু অনুচরকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল জার্মানিতে। তাদের এবং জার্মানির কিছু স্থানীয় লোকের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল এই—

আঃ—উঃ মরে গেলাম—ও গড্ আমি আর বাঁচবো না—ককিয়ে চিৎকার করে উঠল লুইসি।

এক ধাক্কায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল মারিয়ার মুখের ওপর। কে একজন ছুটে এসে বলল, অমরবেচা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ভেতরে একজন ডাক্তার আছেন—আসছেন।

এলেন ডাক্তার ভয়মারলি। তিনি অনেকক্ষণ মরিয়াকে পরীক্ষা করে বললেন, মাত্র সাত মাস—সবই তো ঠিকঠাক আছে দেখছি—তাকে ইসারা করে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, দেখুন প্রিন্স ডাচেজ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে, একটু থেমে কি ভেবে আবার বললেন রাস্তায় যেতে যেতে যতটুকু সম্ভব আমোদস্ফূর্তির পরিবেশের ভেতরে রাখতে হবে ওঁকে—বলতে বলতেই হঠাৎ রোগিনীর কাছে

মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, হার হাইনেস—মনে কিছু করবেন না—আপনার খিদে পেয়েছে—খাবেন কিছু ?

আমার ভীষণ ব্যথা ডাক্তার—

ও কিছু নয় হার হাইনেস আপনি একটু হুল্লোড় করে আমাদের সঙ্গে থাকুন তো—খাওয়াদাওয়া করুন গপ্পোসপ্পো—

আমি খাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি—ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ব্রামবার্গ চিৎকার করে ছুটে চলে গেল পাশের ঘোড়া দলাইমলাইয়ের ছোট কুঠুরিতে। সেখানে বোধ হয় আর সব লোকরা রান্নাবান্না করছিল। কিছুক্ষণ পরই একটা বড় থালায় করে ব্রামবার্গ নিয়ে এল অনেকগুলো বাদামী রঙের জার্মান রুটি আর অনেক পরিমাণে মাংসের ঝোল আর প্রচুর আলু। লিভার সসেজের একটা টিন, মাখন, চিজ, স্ট্রবেরীর জেলী আর সিগারেট এবং আরও অনেক কিছু—

ডাক্তার নিজে হাতে আঙুল পরিমাণ পুরু করে রুটির ওপরে লিভার সসেজ এবং মাখন মাখিয়ে দিল ম্যাডামকে। লুইসি গপ গপ করে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। আর আস্তে আস্তে সে (ডাচেজ) কেমন শান্ত আর নিস্পন্দ হয়ে এল।

এবার ঘুমিয়ে পড়ুন তো ম্যাডাম বলেই তাঁর নাকের কাছে একটা শিকড় ধরল। আর কয়েক মুহূর্তের ভেতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া লুইসি মারিয়া।

একটা কথাও বলছিল না সে। শুধু একভাবে দেখছিল তার পরম আদরের লুইসিকে। তাকে বিয়ে করে শুধু একটানা কষ্টই পাচ্ছে—একদিনের জন্যও কোন সুখ সৌভাগ্যের মুখ তাকে দেখাতে পারেনি—

কি এত ভাবছেন হিজ হাইনেস—

কোন ভয় নেই তো ?

আপনি নিজের চোখেই তো দেখলেন ডাচেজ অ্যাবসলিউটলি ভাল আছেন, একটু থেমে আবার হেসে বললেন ডাক্তার ডয়মারলি, আর আমি তো সঙ্গেই আছি—আপনার চিন্তা কি—

ডাক্তার কি জানবে, তার চিন্তা কি একটা ? প্রথম কথাই হলো এখনো জার্মান সীমান্তেই পৌছতে পারেনি। লুইসিকে নিয়ে নিরাপদে পৌছতে পারবে তো ! নির্বিঘ্নে প্রসব হবে তো ? যদি মারিয়া মরে যায় তাহলে ? আর ভাবতে পারে না। তার বুকের ভেতরটা ব্যথা করে।

শুধু কি তাই? গিয়ে যদি শোনে তার মেজদাদা ফ্রেডরিকের স্ত্রীও সন্তানসম্ভবা হয়েছে। আর তার যে বাচ্চা হবে, সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক সে কি রাজনীতির মারপ্যাঁচ আর শরিকদের চক্রান্তের জাল পেরিয়ে সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে?

গাড়ি চলে।

দুপাশে ধু ধু ফাঁকা ন্যাড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে তার ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ধারে আগুনে পোড়া এক একটা বাড়ি। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া কিম্বা দোমড়ানো এক একটা আস্তাবল। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। লিপজিগে নেপোলিয়নের সঙ্গে জার্মানির সেই সর্বনাশা যুদ্ধ!

দূরে বহুদূরে একটা বার্চগাছের নিচে শকুনের পাল সাঁড়াসির মত লম্বা ঠোঁট বের করে মরা একটা ঘোড়ার নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছে। একটানা শাঁ শাঁ বাতাসের করুণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর মনে হলো—মনে হলো যেন তাঁরই পোড়খাওয়া জীবনের চিত্রটা এই বন্ধ্যা মাঠ জুড়ে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

গাড়ি চলে।

এসব ১৮১৯ সালের কথা।

॥ আট ॥

সেই সময়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃষিবিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সারা ইউরোপ। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের নতুন চিন্তায়, নতুন প্রেরণায়, নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত এক নতুন সমাজব্যবস্থার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

অভিনব এবং নতুন ধরনের শিল্পোদ্যোগে কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের মজুরি ছিল সামান্য। আর ধনী এবং অভিজাত বা বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যের ছিল অগ্নিমূল্য। ফলে বিত্তবানরা যেমন আরও ধনী হয়ে উঠছিল তেমনি গরীবরা ক্রমশ আরও গরীব হতে হতে একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল। তাই ধনী আর দরিদ্র এই দুটো শ্রেণীর ভেতরে ফারাকটা আরও বেড়েই চলেছিল।

ওদিকে শিল্পবিপ্লবের আলো জ্বলেছিল বটে। কিন্তু তার নিচে অন্ধকার ঘন হয়ে জমে ছিল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টারী আইনকানুন সব ছিল কারখানার মালিকদের অনুকূলে। শ্রমিকদের স্বার্থ এবং দুঃখদুর্দশার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতো না রাষ্ট্র। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল।

শ্রমিক মজদুররা একজোট হয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। জন্ম হয়েছিল ট্রেডইউনিয়ন মুভমেণ্টের। দেশের চিন্তাশীল মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক-মালিকের মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করলেন। আর সেই আলোচনা থেকেই সৃষ্টি হলো একটা ইজমের—

সোশ্যালিজম। সমাজতন্ত্রবাদ।

সেই সময়।

সেই উত্তাল সময়ের ঝড়ো হাওয়ায় যখন শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—মজুর শ্রমিকদের ধরে ধরে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছিল বা দূরের কোন অজানা দেশে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছিল যখন তাদের ওপরে আরো নানাধরনের রাজকীয় উগ্র দমননীতির খাঁড়া নেমে এসেছিল, সেই সময়—তখন—

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে লণ্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদে লুইসি মারিয়া ভিক্টোরিয়া নির্বিঘ্নেই জন্ম দিলেন একটি শিশুর। ফুলের মত সুন্দর আর ফুটফুটে একটি কন্যা।

না। প্রাসাদের কোথাও কোন আনন্দ উৎসব হলো না। কোন উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি শোনা গেল না। নবজাতকের জন্মের শুভ বার্তাকে বহন করে চার্চের কোন ঘণ্টাধ্বনি চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল না। বরং একেবারে উল্টো হলো।

চতুর্থ জর্জ ফ্রেডরিক বা ডিউক অফ ইয়র্ক এবং চতুর্থ উইলিয়ম—বড় তিন ভাইয়ের বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল। আর কেন্সিংটন প্যালেসের তিন-মহলের তিনটে জানলায় ভেসে উঠল তিনটি মুখ। তিন রাজপুত্রের তিন মহিষীর বিষণ্ণ বিক্ষুব্ধ মুখ। তারা প্রাসাদের উদ্যানের এক দূর কোণে সৌভাগ্যবতী লুসিয়ার প্রসূতি কক্ষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর তাদের চোখে দারুণ একটা জ্বালা আর বন্য হিংসা ধু ধু করতে লাগল।

একমাত্র বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী তৃতীয় জর্জ নাতনির জন্মের সংবাদে খুশি হয়েছিলেন। শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী দেখে যেতে পারলেন। আর তাঁর বংশের সন্তানহীনতার দুঃসহ অভিশাপের জ্বালাটা বুকে নিয়ে মরতে হলো না। কিন্তু—

নবজাতকের জন্য আনন্দ উল্লাস করবে কে? তার পিতা এডওয়ার্ড যে দস্তুরমত চতুর্থ রাজপুত্র হয়েও অবহেলিত। ভাইদের রাজকীয় চক্রান্তে চরম দরিদ্র। তবুও—তবুও সদ্যজাত রক্তবর্ণ গোলাপকুঁড়ির মত মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর

অন্ধকার মুখে হাসির আলো চিকচিক করতে লাগল। যেন মিষ্টি কোন সুখস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, মে ফ্লাওয়ার—মে ব্লসম—

ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের প্রথাকে অনুসরণ করে জন্মের ঠিক পাঁচদিন পরেই স্যালিশবেরীর ধর্মযাজক জাতককে দীক্ষা দিলেন। কেসিংটনের ধর্মমন্দিরে এডওয়ার্ড আর লুইসি তাদের কন্যার সুদীর্ঘ পরমায়ু ও নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবনের জন্য প্রার্থনা জানালেন। আর তার পরে ঠিক আট মাস অতিক্রান্ত হলে (২৪শে ডিসেম্বর ১৮১৯) এডওয়ার্ড প্রবল পরাক্রান্ত তখনকার রুশ সম্রাটের নাম অনুযায়ী তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কন্যার নামকরণ করলেন—আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।

একমাত্র সন্তানের দীর্ঘ পরমায়ুর জন্য এডওয়ার্ডের আকুল প্রার্থনা হয়তো বিধাতা শুনেছিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া। প্রাচীন বটগাছের মতই ডালপালা ছাড়িয়ে আর দিকে দিকে হাজারো ঝুরি নামিয়ে দিয়ে বা ইউরোপের দেশে দেশে অসংখ্য নাতিপুতি আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বিরাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আর বেঁচে থাকতেই 'গ্র্যাণ্ডমাদার অফ ইউরোপ' বলে আখ্যা পেয়ে কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন। রাজত্ব করেছিলেন পুরো একটি দুটি নয়—ছ-ছটি দশকেরও বেশি সময় জুড়ে। কারো অজানা নেই তাঁর সুদীর্ঘ শাসনকাল শুধু যে বৃটিশ রাজতন্ত্রেরই গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, তা নয়। নতুন চিন্তায় নতুন আদর্শে, নতুন একটা প্রেরণায় স্বনামেই একটা বিশেষ যুগ বা ভিক্টোরিয়ান এরার সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহ্যবাহী ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃতির বেগবান ধারাটিও যেন আরও সমৃদ্ধ—আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সময়েই চার্লস ডিকেন্স তাঁর সময়েই থ্যাকারে (উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে) তাঁর সময়েই লর্ড মেকলে—রবার্ট ব্রাউনিং কার্লাইল জর্জ ইলিয়ট, কে নয়? স্বর্ণপ্রসূ সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অসামান্য প্রতিভাধরদের বর্ণাঢ্য মিছিল।

তবে মনে হয় ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে বড় অবদান হলো মনার্কি বা রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা। তাঁর অভিষেকের সময় মনার্কির যে দুরবস্থা ছিল সেই শ্রীহীনতা—সেই দৈন্য থেকে উদ্ধার করে রাজতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। করেছিলেন গৌরবোজ্জ্বল। এমন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরও রাজতন্ত্রের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সুনিশ্চিত ছিল। কখনো স্তব্ধ হয়নি। কোন ছেদ পড়েনি নিরন্তর প্রবহমান ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে।

আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।

১৮৩৭ সাল থেকে সংযুক্ত রাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের অধিশ্বরী হয়েছিলেন। তার ঠিক বিশ বছর পরে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পর এই উপমহাদেশের সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন।

কিন্তু কেন্সিংটন রাজবাড়ির অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসে দুঃখী এডওয়ার্ড আর রুগ্ন লুইসি তাদের কন্যার এই আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাও করতে পারেনি। সম্ভবও তো নয়। এসব তো একেবারেই আকাশকুসুম চিন্তা। অসম্ভব। অবাস্তব।

তবুও—তবুও ভাগ্যতাড়িত সেই কর্তা গিন্নী তাদের গোলগাল নাদুসনুদুস মেয়েকে কোলে নিয়ে ভাবে। কষ্টকল্পনা হলেও ভাবতে ভাল লাগে—এখনও—এখনও অসুখেবিসুখে জর্জরিত একাশি বছরের প্রাচীন দেহটা নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর পরে সিংহাসনে বসবেন তাঁর বড়দাদা চতুর্থ জর্জ। তাঁর অবশ্য একটি মেয়ে ছিল—শারলোটি। স্যাকসে কোবার্গের লিওপোল্ডের সঙ্গে বিয়ের পরে মারা যায়। এখন নিঃসন্তান। তাঁর পরে সিংহাসনের হকদার মেজদা ফ্রেডরিক ডিউক অফ ইয়র্ক। ছেলেপুলের বালাই নেই। সেজ—ক্ল্যারেন্সের ডিউক। পর পর দুটো মেয়ে হয়ে মারা গেছে। আর কোন বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ? সেজ বৌঠানের বয়স আছে—স্বাস্থ্য আছে—এত বাধা—পায়ে পায়ে এত প্রতিবন্ধক পেরিয়ে তাঁর মেয়ে কি কখনো গৌরবের মুকুট পরতে পারবে?

দিন কাটে। মাস যায়। ঘা খাওয়া দুটো মেয়েপুরুষ এডওয়ার্ড আর লুইসি রঙীন স্বপ্নের জাল বুনে চলে। বিধাতা হাসে।

এল ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর। গভীর শীত আর তুষার ঝড় শুরু হলো লণ্ডনে। মেয়ে হওয়ার পর প্রায়ই নানা রোগে ভুগছিল লুইসি। এডওয়ার্ড তাকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে এল উলব্রুকের কটেজে। সেই যে এল আর ফিরতে পারল না। কয়েক দিনের সামান্য জ্বরে মারা গেল এডওয়ার্ড।

ভাই এবং ভাইবৌদের কুটিল হিংসা আর জঘন্য চক্রান্তের এক দুঃসহ শ্বাসরোধী পরিবেশে মাত্র আট মাসের কন্যা আর অসহায় বিধবা স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে গেল এডওয়ার্ড। তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহের ভেতর তৃতীয় জর্জ দেহ রাখলেন। সিংহাসনে বসলেন তাঁর বড় ছেলে চতুর্থ জর্জ। তার সেই সূত্রেই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের ভেতরে ভিক্টোরিয়া তৃতীয় দাবীদার হয়ে

গেলেন। কেননা এডওয়ার্ডের পরে ফ্রেডরিক ও ক্ল্যারেন্সের ডিউকের ভবিষ্যতে আর কোন ওয়ারিশ না থাকলেই আইনত সিংহাসনে ভিক্টোরিয়ারই হক।

মেয়ের সুখ ও আর সৌভাগ্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠায় খুশি হলো লুইসি। তাঁর রোগা মুখে হাড় বের-করা গালে হাসি চিকচিক করতে লাগল। কিন্তু সাবধান—মেয়ের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে ব্যাপারটা। যদি ওর লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে যায়।

সে ক্ষতি সামলানো তো তার হাতের ভেতরে। নির্জন ঘরে একা বসে ভাবে লুইসি। কিন্তু তার মেয়ের যে ক্ষতির সম্ভাবনা—যে আশঙ্কা নিশিদিন তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে তা আটকাবে কি করে? সে একেবারে একা। একটা মেয়েমানুষ। তার ভাসুর কি দেওর এবং জারা কেউই খুব সরল সোজা মনের লোক নয়। তাদের কারো ছেলেপুলে নেই বলে তাকে হিংসে করে। আলেকজেন্দ্রিনার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায়। সিংহাসনের হকদার বলে ওকে যদি মেরে ফেলে! বুকের ভেতরে কান্না পাক দিয়ে ওঠে। মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে যেতে থাকে।

চতুর্থ জর্জ রাজা হওয়ার পরে আদাজল খেয়ে লাগলেন। একদিন বললেন লুইসিকে বৌমা-মেয়েকে নিয়ে তুমি আবার জার্মানিতে ফিরে চলে যেতে তো পারো, একটু থেমে চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে আবার বলল স্যাকসে কোবার্গের অমরবেচা প্যালেসে থাকবে—তোমার পুরনো জায়গা—

কোন কথা বলল না মারিয়া।

তাহলে তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করি?

না। আমি ইংল্যাণ্ডেই থাকবো, শান্ত কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে বলল মারিয়া, আমাদের তো এখানে থাকার দাবী আছে—

দাবী! কুটিল হাসি ফুটল জর্জের এবড়োখেবড়ো মুখে।

লুইসিকে সরানো গেল না। অতএব অকথ্য দুর্ব্যবহার শুরু হল। অবস্থা যখন ভয়ানক দুঃসহ তখন করুণাময় ঈশ্বরই যেন পাঠিয়ে দিলেন মারিয়ার দাদা লিওপোল্ডকে। আর সেই যে বিধবা বোন আর ভাগ্নীর দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন, তারপরে টানা এগারোটা বছর (১৮৩১ খৃ) বেলজিয়ামের রাজা হয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের নিয়েই ছিলেন।

কেন্সিংটন প্যালেসে বেশ শক্ত কড়া প্রকৃতির মানুষ—মামা লিওপোল্ড বুদ্ধিমতী মা এবং স্যাকসে কোবার্গেরই এক তরুণী লুইসি লেহজানে (ভিক্টোরিয়ার গভর্নেস) স্নেহচ্ছায়ায় বড় হতে লাগল ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ভিক্টোরিয়ার গোল মুখে বড় বড় ডাগর দুটো চোখে হাসি হাসি সরলতা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা জিরানিয়াম ফুলই যেন এক একটা করে পাঁপড়ি মেলে ধরছে। সত্যিই মে ফ্লাওয়ার! ভাগ্নীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিওপোল্ডের চোখের দৃষ্টি কেমন গভীর আর অগাধ হয়ে ওঠে। আর অনেক—অনেক দূর ভবিষ্যতের একটা মিষ্টি রোমাণ্টিক কল্পনা তাঁর মনের ভেতরে আনা-গোনা করে। বোনকে ডেকে চাপাগলায় কতগুলো কথা বলেন লিওপোল্ড। দেখ দাদা—তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে—বুক উজাড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে মারিয়া, তার আগে দেখ—ওর কপালে কি লেখা আছে—

ও তুই কিচ্ছু ভাবিস না—দ্যাটস্ সিওর অ্যাণ্ড সার্টেন—

লিওপোল্ডের কথাই ফলে যেতে লাগল ।

১৮২৭ সালে মেজ রাজপুত্র ফ্রেডরিক মারা গেলেন। ভিক্টোরিয়া তখন আট বছরের মেয়ে। ঠিক তার তিন বছর পরে চতুর্থ জর্জও ওপারে যাত্রা করলেন। ১৮৩০ সালে তৃতীয়পুত্র ডিউক অফ ক্ল্যারেন্স চতুর্থ উইলিয়ম হয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর কোন ওয়ারিশ নেই। অতএব রাজমুকুট একেবারে কাছে এসে ভিক্টোরিয়াকে হাতছানি দিতে লাগল। কিন্তু—

মেয়ের সৌভাগ্যের দিন যত এগিয়ে আসে ততই আরও বেশি করে লুইসি সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখে তাকে। উইণ্ডসরের রাজবাড়ি থেকে কোন আমন্ত্রণ এলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সে। নানারকম টালবাহানা করে সেখানে যাওয়াটা বাতিল করতে চেষ্টা করে—

একবার উইণ্ডসর থেকে চতুর্থ উইলিয়ম খবর পাঠালেন। ১৩ আগস্ট রাণী অ্যাডিলেডার জন্মদিন, তার ন দিন পরে তাঁর নিজের জন্মদিন। অতএব ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে এখুনি চলে এলে ভাল হয়। এবং ২১শে আগস্টের আগে উইণ্ডসর থেকে যাওয়া হবে না—

তা কি করে সম্ভব হিজ একসেলেন্সি? কেসিংটন থেকে উত্তর এল—এই আগস্টেরই ১৫ তারিখে যে তার নিজের (লুইসি) জন্মদিন—অতএব তাঁর অনুষ্ঠানটা হয়ে যাবার পর ২০ তারিখ নাগাদ যেতে চেষ্টা করতে পারেন—

চতুর্থ উইলিয়ম রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বারুদের স্তূপের মত নিঃশব্দে বসে ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হতে লাগলেন। ২০ আগস্ট লুইসি মেয়েকে নিয়ে যেই উইণ্ডসরে পা দিল অমনি বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তুমি আমাদের অবিশ্বাস করো কেন

বলো তো—দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে চতুর্থ উইলিয়ম বললেন, তুমি কি মনে করো—তোমাকে—তোমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে আমরা মেরে ফেলব।

তাঁর এই কথাটাই যে ঠিক—এই সন্দেহটাই যে দারুণ জ্বরের মত তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকে—সেটা কি করে বলবে ভাসুরকে। তাই ডাচেস অফ কেণ্ট—লুইসি চুপ করে রইল। কিন্তু তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। মাকে কাঁদতে দেখে তার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভিক্টোরিয়া।

এই ঘটনার উল্লেখ করে অনেক—অনেকদিন পরে ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন—ছোটবেলা থেকে দারুণ প্রতিকূল পরিবেশে বড় হয়েছিলাম। তাই জীবনের একেবারে গোড়া থেকে খুব সাবধানী আর সতর্ক হতে হয়েছিল। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তবে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতাম। সাবেক দিনের বিষাক্ত স্মৃতি কিছুতেই আমাকে সহজ হতে দিত না···

কিন্তু ভিক্টোরিয়া যতই নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক আর তার মা তার চারদিকে বেড়া তুলে আটকে রাখুন না কেন, কেন্সিংটন প্যালেসের সেই কিশোরী মেয়ের দেহ ছাপিয়ে একদিন উথালপাথাল যৌবন আসে। তখন সেই উত্তাল যৌবনসরসীতে অনেকেই মরাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

॥ নয় ॥

কাজলকালো জলের ঐশ্বর্যে টলমল করছে একটি জলাশয়।

দুপুরের সাবালক সূর্যের খররোদে তরল অগ্নিধারার মত জ্বলছে পুকুরের জল। সাউথ্যাম্পটনের মিউনিসিপ্যালিটির বাসিন্দারা পানীয় জলের জন্য তৈরি করেছে এই জলাধার। কিন্তু—

এত বেলা হয়ে গেল। যিনি উদ্বোধন করবেন, তিনি এখনও আসছেন না কেন? উদ্যোক্তারা অস্থির হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে লণ্ডনের রাস্তার দিকে।

খট্-খট্-খট্—হঠাৎ দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বেজে উঠল। জনতার ভেতর থেকে উল্লসিত গুঞ্জন শোনা গেল—ওই যে এসে গেছেন—এসে গেছেন—

প্রথমে মার্চ করে এল একদল বন্দুকধারী সৈনিক। তারপরেই এল চারটি সুসজ্জিত তেজী ঘোড়ায় টানা একটি বিশাল সুদৃশ্য গাড়ি। তার ভেতর থেকে নামলেন ডাচেস লুইসি মারিয়া আর তাঁর মেয়ে—ফুটফুটে ফুলের মত সুন্দরী এক কিশোরী—ভিক্টোরিয়া আলেকজেন্দ্রিনা।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবার মঞ্চে উঠে পাঠ করতে শুরু করলেন

তাঁর অভিভাষণ—মাননীয়া ডাচেস আপনার পদধূলিতে ধন্য হলো আমাদের এই জনপদ···আরো অনেক প্রশস্তির কথা বলে অভিনন্দন জানালেন লুইসিকে। তার উত্তরে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিলেন ডাচেস। প্রায় দু হাজার মানুষের হাততালির শব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠল।

এবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন চেয়ারম্যানসাহেব। আচমকা ভিক্টোরিয়ার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, ম্যাডাম আপনিই প্রথম রিজারভার থেকে জল তুলবেন—বলেই সোনার পাতে মোড়া একটা জগ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

না না—আমি—আমি আমি কেন, তাব বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে আরও কি যেন বলতে চাইলেন ভিক্টোবিয়া। কিন্তু ডাচেসও যেই বললেন, কেন ওকে এসবের ভেতর টানছেন—কে কি ভাবে নেবে—

আপনি বলছেন কী হার হাইনেস? অনেক লোক একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠে বলতে চেষ্টা করল—উনিই তো আমাদের ভাবী ইংল্যাণ্ডেশ্বরী আমাদের ফিউচার এমপ্রেস—

আপনারা এসব কি বলছেন? ডাচেসের বিষণ্ণ ম্লান মুখে চাপা হাসির আলো চিকচিক করতে লাগল। তাঁর মেয়ে সম্বন্ধে এরা সব খোঁজ খবর রাখে দেখা যাচ্ছে। আর সেই বিশাল জনসমাবেশের দিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর মনে হল, তাঁর মেয়ে আসবে জেনেই নিশ্চয় এত জনসমাগম হয়েছে।

কিন্তু কেউ জানে না। কল্পনাও করতে পারবে না। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—তাঁর মেয়ে। জনসাধারণ তাঁকে কি চোখে দেখে, কতটুকু তাঁর জনপ্রিয়তা—এসব জরিপ করতেই সে এই মিটিং-এ আসতে রাজি হয়েছে।

এসব ১৮৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের কথা।

ভিক্টোরিয়া নিজেও যে তাঁর ভবিষ্যৎ একেবারেই জানতেন না, তা নয়। তখন তিনি আরো ছোট। বয়স এগারো হবে—

ক্লাসে পড়াচ্ছেন ডেভিস সাহেব। তিনি ছেলেমেয়েদের বললেন, তোমরা ইংল্যাণ্ডের রাজারাণীদের একটা চার্ট তৈরি করো তো—

সবচেয়ে আগে ভিক্টোরিয়াই মাস্টারমশায়ের কাছে জমা দিলেন তাঁর খাতা। একবার চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়ার কাছে। মাথা নিচু করে কিসের যেন লজ্জায় কুঁকড়ে বসে রয়েছেন তিনি।

—কি ব্যাপার, আলেকজেন্দ্রিনা, এই জায়গাটা গ্যাপ রেখেছে কেন? চার্টটা তুলে ধরলেন ছাত্রীর সামনে—ইংরেজ রাজত্বের শুরু সেই নরম্যাণ্ডিবংশের দ্বিতীয়

হেনরী (১০৬৬ খৃঃ) থেকে শুরু করে প্ল্যান্টাজেনেট, টিউডর, স্টুয়ার্ট ইত্যাদি বংশের রাজারাণীদের নাম দিয়ে হ্যানোভার বংশে এসে তাঁর জ্যাঠামশাই চতুর্থ উইলিয়মে এসে থেমে গিয়েছেন।

তারপর ?

ফিউচার তো কেউ বলতে পারে না স্যার, অস্ফুটস্বরে বললেন ভিক্টোরিয়া। তোমার নামটা বসিয়ে দিতে পারতে—

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া। তীব্র একটা উত্তেজনায় আর লজ্জায় তাঁর মুখখানা আরো রক্তিম হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত করে অস্ফুটস্বরে শুধু বললেন, নিজের নাম নিজেই জাহির করা আ মি পছন্দ করি না স্যার—

আমি অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে সাধারণ ঘরের মেয়ের মতই বড় হয়েছিলাম— অনেক অনেক পরে ভিক্টোরিয়া নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন। আর সেইজন্যেই তাঁর জীবনীকারদের ধারণা, তাঁর মানসিক গঠনটাই ছিল খুব উঁচুদরের। কোন অহংকার ছিল না, রাগ ছিল না। ব্যবহার ছিল সরল খোলামেলা আর অমায়িক।

একদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরী এবং গভর্নেস লেহজান বললেন, শোন আলেকজেন্ড্রিনা তোমার জ্যেঠিমার যদিও দু-দুটো বাচ্চা ছোট থাকতেই মারা গেছে, কিন্তু হার হাইনেসের বয়স কম বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল লেহজান।

তাতে কি হয়েছে—থামলে কেন ?

যদি তাঁর কোন ছেলেপুলে হয় তাহলে তো তোমার চান্স—

তুমি বিশ্বাস করো লেহজান আমি এতটুকু দুঃখিত হবো না। জ্যেঠিমা আমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন, বলতে বলতে কেমন গাঢ় হয়ে উঠল ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর। আবার আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে বলল, জ্যেঠিমার আর একটি সন্তান হোক—আর সে রাজা বা রাণী হলে আমি খুশিই হবো—

ভিক্টোরিয়া কিন্তু সুন্দরী ছিলেন না। দীর্ঘাঙ্গীও না। কিন্তু তাঁর মনটা যেমন ছিল সহজ সরল—সেই সরলতার একটা শান্ত ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তাঁকে সুশ্রী ও কমনীয় করে তুলেছিল। ছিল যেটা, সেটা হলো দুরন্ত আর উচ্ছল একটা প্রাণ—'লাইফ'। কোনদিন তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতেন কেন্সিংটন প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির দিকে, আবার কোনদিন বা হাইড পার্কে চক্কোর দিতেন। নাচ গান ভালবাসতেন। ভালবাসতেন খেলাধুলো।

সেদিন নাচের আসর থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে

হলো। মার ঘরের বন্ধ দরজাটা পেরিয়ে যেতে তার পা উঠল না। খুব নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন মা আর মামা লিওপোল্ড। তাঁদের সেই অস্পষ্ট চাপা ফিসফিসানির ভেতরে পরিষ্কার কানে এল তাঁর নামটা। তাঁকে নিয়ে কেন—কিসের এই ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর। মা তো তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতই মেলামেশা করেন—এসব কথা তো মা-ই তাঁকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারতেন।

কৌতূহল হলেও আড়ি পাততে রুচিতে বাধল। তিনি নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন। অবশ্য কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন কিসের এত শলাপরামর্শ।

॥ দশ ॥

উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদ থেকে সম্রাট উইলিয়মের (চতুর্থ) এল জরুরী তলব—ভিক্টোরিয়া যেন আজই একবার দেখা করে।

ডাচেসের মনের ভেতরে দুলে উঠল সন্দেহ—আবার নতুন কোন ষড়যন্ত্র নয় তো? কিন্তু আর মেয়েকে বাধা দিলেন না। মেয়ে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ বুঝে নিতে পারবে।

ভিক্টোরিয়া উইণ্ডসরে এসে দেখল বিছানায় শুয়ে রয়েছেন তাঁর জেঠিমা (এডিলেড)। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। তাঁর একটা হাত ধরে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমি আর বাঁচবো না রে আলেকজেন্দ্রিনা। তোর জ্যাঠামশাইয়ের পরে তুই-ই তো সিংহাসনে বসবি—

এসব কি বলছো জেঠিমা, ছটফট করে উঠলেন ভিক্টোরিয়া। তাড়াতাড়ি পরমযত্নে এডিলেডের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাঁচবে না কেন জেঠিমা—

যা বলছি শোন—পরে আর হয়তো সময় পাবো না রে। জ্বরের ঘোরে রক্তাভ চোখদুটো দূরের দেওয়ালে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর ছবির দিকে ছড়িয়ে আস্তে আস্তে ভবিষ্যদ্বাণী করার মত করে বললেন এডিলেড। তুই এমন সুন্দর করে রাজ্যশাসন করবি যে তোর জন্যই এই বংশের মুখ উজ্জল হয়ে উঠবে—আমি—আমি ওপর থেকে সব দেখতে পাবো—

না না জেঠিমা তুমি তুমি এসব কি—তীব্র উত্তেজনা আর আবেগে ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। শুধু অস্থির হয়ে এডিলেডর বুকের ভেতরে জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে অঘোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

আলেকজেন্দ্রিনা—এসেছিস মা! কোমরটা বেঁকিয়ে ভারি দেহটা কোনরকমে টেনেটুনে নিয়ে উইলিয়ম এলেন। সস্নেহে ভিক্টোরিয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন,

তোর জ্যাঠাইমার হাল তো দেখছিস। আমারও শরীরের অবস্থা ভালো নয়, একটু থেমে বাতাসে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে যেন বহু—বহু দূর থেকে বললেন, আমরা আর বেশিদিন নেই মা।

এসব কথা কেন বলছেন জ্যাঠামশাই—

শোন তোর মাকে খবর পাঠিয়েছি—আজ তোর কেসিংটনে ফেরা হবে না। ভিক্টোরিয়ার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উইলিয়ম বললেন, বিকেলে উইণ্ডসরে একটা পার্টি হবে। পার্লামেণ্টের মেম্বাররা এবং মিনিস্টাররাও থাকবেন, বলতে বলতে কিসের যেন উত্তেজনায় তার গলাটা যেন আটকে এল। কয়েক মুহূর্ত ভিক্টোরিয়ার দিকে একভাবে তাকিয়ে হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অত্যন্ত দ্রুতকণ্ঠে বললেন, খুব—খুব জরুরী মিটিং—তোর থাকা দরকার।

উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের উদ্যানের গাছে গাছে রঙবেরঙের আলোর ফুল ঝলমল করছে। যেন হাজার আলোর মালা পরে রূপসী হয়ে উঠেছে নানা রঙের ফুলে ভরা সেই বাগান। তার একদিকে পার্টি বসেছে। টেবিলে টেবিলে জোর খানাপিনা চলছে। ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম ঘুরে ঘুরে বিশিষ্ট অতিথিদের খোঁজখবর করছেন। কিন্তু—

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ড্রাম বেজে উঠল, বেজে উঠল ক্ল্যারিনেট। আর বাজনার তালে তালে মরালীর মত ভেসে ভেসে এল আলোকোজ্জ্বল নৃত্যরত এক নর্তকী। তার সুঠাম তনুতে আঠারো বছরের উত্তাল যৌবন। রক্তবর্ণ রেশমের স্কার্ট আর ব্লাউজের ওপরে শোভা পাচ্ছে স্বচ্ছ আর হালকা কমলারঙের গাউন। সেই প্রায় আস্বচ্ছ বস্ত্রাবরণ যেন তার যৌবনপুষ্ট দেহশ্রীকে আরও মনোরম—আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

পার্টির লোকদের খাওয়া থেমে গেল।

বাজনা উত্তরোল হয়ে উঠেছে। তার তালে তাল মিলিয়ে উদ্দাম বেগে নাচতে লাগল সে। তার সোনালী চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার উত্তুঙ্গ বুকের ওপরে।

দর্শকদের চোখে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি।

ব্যাপারটি কে হিজ একসেলেন্সি—আর কৌতূহল চাপতে না পেরে একজন তো মুখ ফুটে বলেই ফেললেন।

আগে ওর নাচ দেখুন, পরে সব বলবো। তার মনের ভেতরের ছটফটানিকে আরো তাতিয়ে দিয়ে চলে গেলেন উইলিয়ম।

বিভোর হয়ে নাচছে সে।

যেন তার নিজের পা দুটোর ওপরে তার কোন বশ নেই। চেষ্টা করেও থামাতে পারবে না তাদের। কখনো পারেনি।

কেউ তো জানে না, নাচ আছে তার রক্তে, আছে তার সমস্ত সত্তায়। নাচটা নিশ্চয়ই অনেক—অনেক ভেবে দেখছে সে। ঈশ্বরেরই দান। তা না হলে অনেক—অনেকদিন আগে এক বসন্তের নির্জন দুপুরে যখন চারদিকে বরফ গলে গলে জল হয়ে কেন্সিংটনের রাজপ্রাসাদের বাগানের পপলার গাছের রাশি রাশি পাতা থেকে চোখের জলের মত জল ঝরছিল—টপ-টপ করে ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। পপলারবীথির মর্মর, পাইনবনে বাতাসের ঐকতান হঠাৎ তার সুঠাম দুটো পায়ে নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলল। সে নাচছিল—নিস্তব্ধ সেই দুপুরে, জনমানবহীন সেই উদ্যানে, উদার আকাশের নীচে আত্মমগ্ন একটা শিল্পীর মতই বিভোর হয়ে নেচে চলেছিল সে।

বাজনা থেমে গেল।

শেষ হলো নাচ। বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়ম ছুটে গিয়ে তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিলেন।

অভ্যাগতরা তো অবাক। একটা ডান্সার আর উনি এম্পারার—বুড়ো খুব হাসিখুশি, 'জোভিয়াল'। তারা জানে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানটা বরাবরই কম। মাঝে মাঝে মূর্খের মত এমন এক একটা কাণ্ড করে বসেন, তার হ্যাপা সামলাতে তারা হিমসিম খেয়ে যায়।

লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন—অনারেবল মিনিস্টারস অ্যাণ্ড মেম্বর অফ হাউস অফ লর্ডস। ঘোষণা করার ভঙ্গিতে গলা চড়িয়ে বললেন চতুর্থ উইলিয়ম, ইনিই আমার ভাইঝি,—আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া। ইনি বর্তমানে রাজপরিবারে সর্বকনিষ্ঠা—আসুন তাঁর সুস্বাস্থ্যের কামনায় আমরা সুরাপান করি।

উনিই তো আপনার সাকসেসর হিজ একসেলেন্সি—সকলে একসঙ্গে বলে উঠল। আর চারদিক থেকে হাততালির প্রবল শব্দে আর কারো কথাই শোনা গেল না।

সেদিনটা ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ সাল।

এই ঘটনার পর থেকে লণ্ডনে জনসাধারণের ভেতরে গুঞ্জন উঠল—ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞী হচ্ছেন। আর দেখতে দেখতে বাতাসের বেগে ইউরোপের দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর—প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া রাণী হবেন।

সেদিন থেকেই ডাচেস লুইসি মামিয়ার কাছে ইউরোপের নানা দেশ থেকে

রাজপুত্র এবং তরুণ নৃপতিদের দূত বা পত্র আসতে শুরু করল ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে।

লিওপোল্ডের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন ডাচেস। ভিক্টোরিয়া লক্ষ্য করেন মামা আর মায়ের আলোচনার যেন শেষ নেই। যেন তাঁর বিয়েটা ছাড়া এই বিশ্বসংসারে আর কোন কাজ নেই। কিন্তু—

মাঝে মাঝে ওঁরা ফিসফিস করে কি বলেন? অস্বস্তিতে তাঁর মাথার ভেতরটা জ্বলে যায়।

একদিন ভরদুপুরে কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আর যেন বাতাসের বেগে ছুটে এলেন লুইসি। এলেন লিওপোল্ড। তাঁদের চোখমুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

এসো এসো, রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো?

খুট—জানলার একটা খড়খড়ি একটু তুলল সে। তার ডাগর দুটো বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাদের দিকে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। কিন্তু না—একজনকেও চেনে না সে।

আলেকজেন্দ্রিনা—আয়—আয় এদিকে আয়—বাজখাঁই গলায় ডাকলেন মামা লিওপোল্ড। বললেন, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করে—ইনি আমার দাদা তোমার বড়মামা—স্যাকসে কোবার্গের ডিউক।

ইস, মার কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি—আরও কি যেন বলতে গিয়ে থমকে চুপ করে গেলেন ভিক্টোরিয়া। প্রায় তাঁর বয়সী একটা সুন্দর চেহারার ঝকঝকে স্মার্ট ছেলে তাঁর দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে! ও কে?

তোর কাজিন—কেন যেন মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বললেন ডাচেস, তোর মামাতো ভাই—দাদার মেজ ছেলে—

একটা কথাও বললেন না ভিক্টোরিয়া। বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর মনে পড়ে গেল মামা আর মায়ের সেই অন্ধকার ঘরে কি বারান্দায় বসে ষড়যন্ত্র চাপা ফিসফিসানির মত করে তাঁদের গোপন পরামর্শ। আর তাঁদের আলোচনার ভেতর থেকে দু-একটা নাম কি কানে পড়ে তাঁর—হ্যাঁ—তাহলে ইনিই স্যাকসে কোবার্গের সেই প্রিন্স—প্রিন্স অ্যালবার্ট। আর তখুনি জলের মত তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল নিজের পছন্দ-অপছন্দ স্বপ্নকল্পনা সব—সব জলাঞ্জলি দিয়ে এই ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দিতে হবে তাঁকে। মুহূর্তে তাঁর মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল।

"এই লাল টুকটুকে কাঠবিড়ালীটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে—ইংল্যাণ্ডের প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করার জন্যই যেন ওর জন্ম হয়েছে—অ্যালবার্ট ভাবে,

সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে দেখেই ঠাকুমা নাকি এই কথাগুলোই বলেছিলেন।

বলা দরকার প্রিন্স অ্যালবার্টের জন্ম ২৬শে আগস্ট, ১৮১৯। ভিক্টোরিয়ার থেকে চার মাসের ছোট। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের ভেতরে নয়। যখন প্রথম অ্যালবার্ট ইংল্যাণ্ডে এসেছিল—প্রায় মাসখানেক কেন্সিংটনের প্রাসাদেই বাসও করছে তখন—তখন সেই সময় সেই উথালপাথাল আঠারো বছরের দুটো যুবক-যুবতীর ভেতরে কখন কি কথা হয়েছিল, প্যালেসের কোন নির্জন কক্ষে তাদের প্রণয়-গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছিল কি না, পরস্পরের নিবিড় কবোষ্ণ সান্নিধ্যে তাদের সেই দিনগুলো ছন্দোসুরভিত হয়ে উঠেছিল কি না—এসব তথ্য জানা যায় না।

শুধু জানা যায়, ভিক্টোরিয়া ছিলেন নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কল্পনা-প্রবণ ভাবুক রোমান্টিক মন। আর নাচেগানে আর খেলাধুলোয় উদ্দাম ও প্রাণবন্ত জীবনের অভিলাষী—থম্পসন থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়ার প্রায় সমস্ত জীবনীকাররা বলেছেন—She was very fond of vigorous life…আর ভিক্টোরিয়া তাঁর মামা লিওপোল্ডকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন "এখুনি বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা কি বাসনা আমার মনের কোথাও আস্তানা গাড়তে পারেনি এখনও। জীবনের কতটুকু দেখেছি বলুন তো…

স্যাকসেকোবার্গের রাজকুমার অ্যালবার্ট ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর চালচলন রকমসকম দেখে বুঝতে দেরি করেনি—প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া তাকে বিয়ে করবেন। ভালবাসবেন—এসব দুরাশা।

না। অসম্ভব স্বপ্নকে সে কখনো প্রশ্রয় দেবে না। মন থেকে ওসব চিন্তা ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিয়ে সে স্যাকসেকোবার্গে পাড়ি দিয়েছিল।

বাকিংহাম প্যালেসের সেই পার্টিতে ভিক্টোরিয়ার সুস্বাস্থ্যের কামনায় সুরাপান করিয়েছিলেন উইলিয়ম (চতুর্থ)। আর ভিক্টোরিয়াই যে তাঁর পরে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবেন তার পরিষ্কার আভাসও দিয়েছিলেন। এবং আর একটি রাজপ্রাসাদ কেন্সিংটনে যখন লিওপোল্ড ও ডাচেজের একান্ত ইচ্ছায় প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার আলাপ পরিচয়ের পর্ব চলছিল তখন—তখন কিন্তু সারা ইংল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল। কারণ—

১৮৩২ সালের পার্লামেন্টারি রিফর্ম অ্যাক্ট। এই আইন সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশার শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিল। তাঁদের সভাসমিতি

এবং যে কোন জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে করে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু যেই তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

গভর্ণমেণ্টও কঠোর হয়ে উঠল। বহু লোককে নির্বাসনে পাঠালো। শ্রমিক মিছিল এবং জনসভার ওপরে নির্বিচারে গুলি চালানো হল। কিন্তু—

এতে করে কিছুতেই কিছু হলো না। যে অসন্তোষের আগুন জ্বলেছিল তা আর নিভল না। বরং নগরে বন্দরে জনপদে সহস্র শিখায় জ্বলে উঠল। কারণ—

জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভ একটু একটু করে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল বহুদিন ধরে। শ্রমিকদের মজুরির হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদিকে ধনী অভিজাত জমিদার ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম করা হয়েছিল আগুন। ফলে গরীব আরও গরীব হয়ে যাচ্ছিল। আর বড়লোক আরও ধনী আরও বিত্তবান হয়ে উঠেছিল। 'হ্যাভ' আর হ্যাভনটস' দুটো সম্প্রদায়— দুটো শ্রেণীর ব্যবধানটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই পার্লামেণ্টারা রিফর্ম অ্যাক্ট— জনসাধারণের জীবনে সেই সর্বনাশা অভিশাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দেশের মানুষ। তাবা জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর সব তুচ্ছ করেও সমিতি তৈরি করেছিল—আর সেই সমিতির তরফ থেকে কয়েকদফা দাবী জানিয়ে যে সনদ দিয়েছিল, তার নাম চার্টার। তাই এই আন্দোলনকে বলা হয় চার্টার মুভমেণ্ট।

দেশ জুড়ে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন দুর্বল মনের এবং ভীতু প্রকৃতির মানুষ—ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম। হয়তো প্রধানমন্ত্রী মেলবোর্ণকে এবং পার্লামেণ্টকে গোলমালটা আপোষে মিটিয়ে নিতে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থায় তো রাজা বা মনার্কের কোন ভূমিকা নেই। অতএব অশান্তি চলতেই লাগল।

১৮৩৭ সালে হোম সেক্রেটারী অত্যন্ত দুঁদে প্রকৃতির মানুষ লর্ড রাসেল ঘোষণা করলেন—যেমন করে হোক রিফর্ম অ্যাক্ট পাস করতেই হবে—

দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে বৃদ্ধ নৃপতি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে তিনি মারা গেলেন উইণ্ডসর প্রাসাদে। সেদিনটা ছিল ২০শে জুন, ১৮৩৭। রাত তখন দুটো।

খট্ খট্-খট্—সেই রাত্রেই তখুনি কেন্সিংটনে ভিক্টোরিয়ার ঘরের দরজায় কড়া বেজে উঠল।

॥ এগারো ॥

ঘুম থেকে উঠে এলেন ভিক্টোরিয়া।

তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না কিছুই। খুব খারাপ খবর ছাড়া রাতদুপুরে কেউ কাউকে ডাকে!

ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ লর্ডচেম্বারলেন, হোম সেক্রেটারী মারকুইস ক্যানিংহ্যাম ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গায়ে নীলাভ নাইটগাউনের ওপরে কারুকাজ করা কাশ্মীরি শাল। রক্তপদ্মের পাঁপড়ির মত ছোট ছোট দুটো পায়ে শোভা পাচ্ছে মরোক্কো স্লিপার।

তখনো—তখনো ঘুমের আবেশ জড়িয়ে রয়েছে তাঁর বড় বড় ডাগর দুটো চোখে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কমলা রঙের শালের আবরণে মোড়া একটা অগ্নিশিখাই যেন দাউ দাউ করে জলছে। উদ্দাম যৌবনের প্রদীপ্ত মূর্তি।

জ্যাঠামশাই—হিজ একসেলেন্সি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন—না? ভেতরে ভেতরে অসহ্য একটা ব্যথা নিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সংযত করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এখন কি করতে হবে বলুন—

আসছে কাল বেলা ১১টার সময় ওয়েস্টমিনিস্টার্ অ্যাবিতে পরলোকগত নৃপাতর আত্মার শক্তির জন্য এক প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে—থামলেন বৃদ্ধ আর্চবিশপ। কেন যেন কয়েক মুহূর্ত ভিক্টোরিয়া সরল নিষ্পাপ মুখখানার দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন। আস্তে আস্তে বললেন, সেই সভায় যে সংবাদটা ঘোষণা করা হবে—সেটা আমি সরকারীভাবে আগাম জানাচ্ছি।

"ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের তিরোধানে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আমাদের পূজনীয়া আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়াকে ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবীর দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির শাসনভার দেওয়া হলো—

পরদিন। ২১ জুন, ১৮৩৭। মাত্র আঠারো বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞীর পদে সমাসীন হয়ে বিপুল এক গৌরবের মুকুট পরলেন। আশ্চর্য, তাঁর কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস নেই, চঞ্চলতা নেই, নেই এতটুকু গর্বের লেশ। সেদিন ভিক্টোরিয়াকে দেখে দর্শকদের মনে হয়েছিল, রাজসিংহাসন নয়—তিনি যেন প্রশান্ত গাম্ভীর্যে কোন মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করছেন।

লর্ড চ্যান্সেলার তাঁকে দিয়ে রাণী হওয়ার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করালেন।

সম্রাজ্ঞীর ছোট দুই কাকা আরনেস্ট বা ডিউক অফ ক্যাম্বারল্যাণ্ড এবং ডিউক অফ সাসেকস আলগোছে তাঁর করতল চুম্বন করলেন।

আশ্চর্য! বড় ছোট আত্মীয় অনাত্মীয় প্রত্যেকের সঙ্গে সমান সরল মধুর ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে গেলেন অভ্যাগতরা। এই বয়সেই মহারাণীর এত ম্যাচিওরিটি—সমৃদ্ধ মানসিক গঠন।

২২ জুন ১৮৩৭ সালে প্রথম পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করলেন ভিক্টোরিয়া। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করে বললেন, আপনাদের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদই আমার একমাত্র পাথেয়…

আর ঠিক তার ছদিন পরে ২৮শে জুন লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভীড় উপচে পড়ল। এখুনি মহারাণীর অভিষেকের মিছিল শুরু হবে। যে পথ দিয়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা আসবে, সেই রাস্তার ধারের বাড়ির জানলাগুলো চড়া দামে ভাড়া হয়ে গেল। সেণ্ট জেমস স্ট্রীটের বাড়িগুলো একদিনের জন্য ভাড়া হলো ২০০০ টাকা। বসার এক একটি আসনের দাম ১০ থেকে ৫০ টাকা।

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম—বাকিংহাম প্যালেস থেকে তিনবার তোপধ্বনি হলো। বেলা দশটা বাজল। শুরু হলো করোনেশনের মিছিল।

মিলিটারী ব্যাণ্ডের দূরাগত গম্ভীর আওয়াজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আর বাজনার তালে তালে মার্চ করে এগিয়ে এল একদল সশস্ত্র সৈনিক। তারা দূরে মিলিয়ে যেতেই রাজপথ-কাঁপিয়ে অশ্বখুরের ধ্বনি বেজে উঠল।

মহারাণী—মহারাণী ভিক্টোরিয়া আসছেন, জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল।

কিন্তু না। চারটি সুসজ্জিত তেজীয়ান ঘোড়ায় টানা একটি বিশাল গাড়িতে এল বিদেশী মন্ত্রী এবং রাজদূতরা। তারপর আসতে শুরু করল একটির পর একটি গাড়ি। কোনটায় আছেন সম্রাজ্ঞীর মা ডাচেজ লুইস মারিয়া, কোনটায় রাণীর কাকারা—কেমব্রীজের ডিউক, সাসেক্সের ডিউক—

কিন্তু মহারাণী—মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোথায়—তিনি কখন—কতক্ষণ পরে আসবেন, জনসাধারণ অধৈর্য হয়ে ওঠে।

বলা দরকার, ইংল্যাণ্ডের মনার্কির একটি বহু প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিক উৎসব এই করোনেশান সেরিমনি। সেই নরম্যাণ্ডির উইলিয়ম থেকে শুরু করে প্রায় হাজার বছর ধরে নদীর অফুরান স্রোতের মতই প্রবহমান। ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জাঁকজমক বা সমারোহের দিক থেকে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার অভিষেকের কোন পার্থক্যই নেই। সেই জর্ডনের পবিত্র মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ তেল মাখিয়ে রাজা বা রাণীকে পবিত্র করানো, সেই অ্যাবির আর্চবিশপের

বাইবেল থেকে প্রার্থনা পাঠ আর তারপরেই এক হাতে সোনার ঘুঘুপাখি আর এক হাতে রাজদণ্ড দিয়ে রাণীকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়ার ভেতরে কোন বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন নতুনত্ব। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার অভিষেকই যেন সমারোহ বেশি হয়েছিল আর জনসাধারণের আনন্দোচ্ছ্বাস যেন ঝরণার মত অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু কেন?

Accession of a young woman was always a romantic affair —ঐতিহাসিক বলেছেন উদ্ভিন্নযৌবনা কোন রমণীর সিংহাসনে আরোহণপর্ব সব-সময়েই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেছিলেন সাতাশ বছর বয়সে। আর পঁচিশ বছর পুরতে না পুরতে সম্রাজ্ঞীর মুকুট পরেছিলেন স্বর্ণযুগখ্যাতা এলিজাবেথ (প্রথম)। কুইন অ্যান পুরো আটত্রিশটি বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। আর সেখানে ভিক্টোরিয়া মাত্র আঠারো বছরে ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন—এটি জগতের ইতিহাসেই একটা বিরল ঘটনা।

তাই তো সেদিন করোনেশান প্রসেশান দেখতে দেখতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল জনতা—রাণী কোথায়—কতক্ষণ পরে আঠারো বছরের সেই সুন্দরী তরুণী সম্রাজ্ঞীকে দেখে তারা চোখদুটো সার্থক করবে—

খট্ খট্ খট্ সারা মিছিলকে সচকিত করে এল বাকিংহাম প্যালেসের খাস ক্যাভালরি—বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিকের দল। তারপরেই বারোটি হৃষ্টপুষ্ট ওয়েলার ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য বিশাল করোনেশান ক্যারেজে এলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

সোনার কারুকাজ করা মখমলের গাঢ় হলুদ রঙের পোশাকে তাঁকে দূর কোন অজানা গ্রহের এক জ্যোতির্ময় দেবীমূর্তির মত মনে হচ্ছে। মাথায় স্বর্ণ কিরীটি। রূপোর চুমকি বসানো রত্নখচিত মুকুটটি আবার ঘন নীলবর্ণ মসলিন দিয়ে আবৃত। বিচিত্র সেই মুকুটের ঠিক মাঝখানের ওপরের দিকে জ্বলজ্বল করছে একটি উজ্জ্বল নীলকান্ত মণি। তার চারদিকে দুলছে একটি করে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড এবং একটি মুক্তো।

ঐতিহাসিকদের মতে আর কোন রাজা কি রাণীর অভিষেকে এত মহার্ঘ রাজমুকুট ব্যবহার করা হয়নি—হয়নি আর কোন করোনেশানে একসঙ্গে এত গণ্যমান্য লোকের সমাবেশ।

অভিষেক শেষ হয়েছে।

সেই অতি মূল্যবান রাজমুকুট তার বিশেষ ধরনের বাক্সে বন্দী করা হয়েছে। রাণীর সেই মখমলের জমকালো পোশাকও ভরে রাখা হয়ে গিয়েছে একটা লম্বা বড় ব্যাগে।

জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্টোরিয়া। দেখছেন একদল সৈনিক করোনেশানের আলোকসজ্জার সাজসরঞ্জামগুলো বহন করে নিয়ে চলেছে। ওরা উৎসবের সমারোহের কোন চিহ্ন রাখবে না। রাখতে দেবে না। কোনদিন চেষ্টা করলেও থাকে না। সব চিহ্নই মুছে যায়—কিন্তু স্মৃতি যায় না কেন—

এত বেলা হলো। এখনও তিনি আসছেন না কেন—ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ভিক্টোরিয়া। এমন সময় বাতাসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বেজে উঠল—খট্-খট্-খট্—উইণ্ডসর প্রাসাদের প্রধান তোরণ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন অরেঞ্জ প্রদেশের রাজকুমার। সূর্যের প্রদীপ্ত আলোয় রক্তবর্ণ ভেলভেটের পোশাকে আবৃত যৌবনোদ্ধত দীর্ঘ দেহটা জলজল করছে।

দেখ দেখ—দেখেছ কীরকম লাল গনগনে আগুনের মত দেখাচ্ছে ওঁকে, তাঁর সহচরীকে বলেছিলেন ভিক্টোরিয়া। তাঁর এই কথার ভেতরেই আভাস পাওয়া গিয়েছিল—এই ডাচ যুবককে তিনি ভালবেসেছিলেন।

আরো একজন। লর্ড বংশের এক যুবক। রূপবান। এলফিনস্টোনকেও তিনি ভালবেসেছিলেন। হয়তো মনে দোলা দিয়েছিল। কিন্তু সেই পর্যন্তই। নিজের সম্মান নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে ছিলেন তিনি বরাবরই অত্যন্ত সচেতন। তাই খুঁটি ছিল শক্ত। তাই প্রেমের উত্তাল জোয়ার তাঁকে কথনোই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তা না হলে কোথায় তলিয়ে যেতেন তিনি। আর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসটাই বদলে যেত।

শুধু রাণী বলে নয়। বয়স কম বলেও নয়, ভিক্টোরিয়ার সরল সাধাসিধে ব্যবহারের ভেতরে এমন মাধুর্য ছিল যে একবার তাঁর সান্নিধ্যে আসত সেই তাকে ভালবেসে ফেলতো।

প্রতি বুধবার আর পাঁচজন সাধারণ রমণীর মতই গীর্জায় যান ভিক্টোরিয়া। তিনি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানেন না, একজন অনুসরণ করছে তাঁকে। এমন কি প্রার্থনা সভাতেও ধ্যানস্থ ভিক্টোরিয়ার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুগ্ধ দুটো চোখের তন্ময় দৃষ্টি কেমন উদাস আর করুণ হয়ে ওঠে। তারপর মাথা নিচু করে কাগজে কি আঁকিবুকি কাটে। একদিন জানা যায়, সে পেন্সিল দিয়ে মহারাণীর একটি অনবদ্য ছবি এঁকেছে।

কিন্তু প্রেম ভালবাসা আগুনের মত। ধীরে ধীরে তার তেজ বাড়ে। দগ্ধ

করে। জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে চেতনাকে একেবারে বিশৃঙ্খল আর উন্মন করে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন হলো—শুধু চার্চে নয়, ভিক্টোরিয়া যেখানে যায়, সেইখানেই তাঁকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়।

একদিন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় যায়। রাজার কানেও যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্বার প্রেমিক, সেই উদ্দাম যুবক—ভিক্টোরিয়ার অন্তঃপুরের বা বেডচেম্বারের প্রধান কর্মচারী লর্ডবংশের এক অভিজাত তরুণ উইলিয়মকে মাদ্রাজের গভর্ণর করে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন—

খুট—তার পরিচারিকা এসে খবর দিল…লর্ড মেলবোর্ন এসেছেন।

মেলবোর্ন। শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়। তাঁর বাবা তাঁর বন্ধু তাঁর গাইডের মত তিনি। কি করবেন—তিনি কি মেলবোর্নকে বলবেন—ভারত থেকে উইলিয়মকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তাহলে যে জানাজানি হয়ে যাবে—উইলিয়মকেই প্রিন্স কনসর্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য দেশের রাজপুত্রেরা হিংসায় জ্বলতে থাকবে।

না। হার একসেলেন্স মৃদুকণ্ঠে বললেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ন, উইলিয়মকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কোনমতেই ঠিক হবে না। শত্রু বাড়বে—চুপ করে গেলেন মেলবোর্ন। আবার নিজের ভেতরে কিছুক্ষণ মগ্ন থেকে আস্তে আস্তে বললেন, আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ চলছে। লিভারপুলে শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালানো হয়েছে। দিনের পর দিন চার্টিস্টদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। আবার থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

ভিক্টোরিয়ার ম্লান বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী আপনার মামা লিওপোল্ডের যখন এত ইচ্ছা প্রিন্স অ্যালবার্টকেই বিয়ে করে ফেলুন না হার হাইনেস।

না। তা হয় না মিঃ মেলবোর্ন, অসহ্য একটা যন্ত্রণায় জ্বলে উঠলেন ভিক্টোরিয়া। বললেন, আমারই এই অল্প বয়স। তিনি আমার চেয়েও মাস তিনেকের ছোট—ওঁকে কি বিয়ে করবো? একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার গাঢ় গলায় বললেন, জীবনের কতটুকু দেখেছি বলুন তো? এখুনি বিয়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না।

কথাটা ঠিকই বলেছেন হার একসেলেন্সি মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন মেলবোর্ন, তবে কি জানেন, প্রিন্স অ্যালবার্টকে নিয়ে আপনার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বারদের এবং মন্ত্রীদের মহলে জোর গুঞ্জন চলছে—হঠাৎ থেমে গেলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিক্টোরিয়াও একটা কথা বললেন না। বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাজ্ঞীর

মন্ত্রণাকক্ষে নেমে এল প্রগাঢ় স্তব্ধতা।

টক্ টক্ টক্ টক্—শুধু দেওয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের একটানা শব্দটা সেই নিস্তব্ধতাকে আরো অস্বস্তিকর—আরো অসহ্য করে তুলছিল।

অনেক—অনেকদিন আগে কেসিংটনের প্রাসাদের বারান্দায় বসে মা আর মামার গোপন পরামর্শ; হঠাৎ ধূমকেতুর মত স্যাকসেকোবার্গ গোথার থেকে ডিউকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে চলে আসা আর এই যে শহরময় তাকে নিয়ে গুজব—যত—সব কিছুর মূলেই তো আছে তার মামার কারবারী হাতের মারপ্যাচ—ভিক্টোরিয়ার মনের ভেতরে ঝাপসা হয়ে এসে ছবিগুলো একে একে প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ব্যাপার কি জানেন, হার হাইনেস রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে মেঘলা দুপুরের কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারে মোড়া আকাশের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেন বহু—বহু দূর থেকে ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, রাণীর সেই শুভাকাক্ষী অসমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধু—রাজনৈতিক দিক থেকে এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ শান্তির জন্যই বিয়েটা খুবই জরুরী প্রয়োজন। আচমকা থেমে গেলেন। আবার সোজা হয়ে বসে রাণীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বেশ প্রত্যয়ের সুরে বললেন, আর আপনিই তো একদিন বলেছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্টকে বিয়ে করলে কতগুলো বাড়তি সুবিধে আছে—

কিন্তু অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার—যেন ভেতরে ভেতরে অসহ্য একটা যন্ত্রণাকে চেপে অত্যন্ত সংযত ও গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ভিক্টোরিয়া কিন্তু আমি প্রিন্সকে আর একবার না দেখলে কিছুতেই 'ডিসিশান' নিতে পারবো না—নো—নেভার—

সার্টেনলি—সার্টেনলি—আপনাদের দুজনের একবার মুখোমুখি দেখা হওয়া দরকার—দেখি সেই ব্যবস্থাই করছি—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন লর্ড মেলবোর্ন।

॥ বারো ॥

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু-দুটো বছর।

টেমস নদীতে যেমন অনেক জল গড়িয়ে গেল তেমনি ইংল্যাণ্ডের ঘটনা জটিল ইতিহাসে অনেক সংঘাত, অনেক সংঘর্ষ এক গর্জনমুখর ঝড় তুলে চলে গেল

দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

ভিক্টোরিয়া দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার খবরাখবর রাখেন। সব পলিটিক্যাল পার্টির মুখপত্র, বিভিন্ন দৈনিক কাগজ তাঁর টেবিলে চাই-ই চাই। পার্লামেণ্টের প্রত্যেকটি বিল প্রতিটি ডকুমেণ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নিয়ে সই করেন। কোন রেকর্ড তাঁকে দেখানো না হলে তিনি রেগে আগুন হয়ে যান।

বৃটেনের ইতিহাসের এক আশ্চর্য সম্রাজ্ঞী—কুইন ভিক্টোরিয়া! বয়সে নবীন। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিশালিনী। তাঁর স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল দেহশ্রীতে বিশ বছরের উত্তাল যৌবন। তিনি গলা ছেড়ে গান করতে ভালবাসেন। ভালবাসেন নাচতে। ঘোড়া ছুটিয়ে দূরদিগন্তে উধাও হয়ে যেতে পারলে তিনি খুশি হন।

কিন্তু নাচগানের মতই পলিটিক্সেও তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। ভক্ত যেমন করে দেবতার পুজো করে তেমনি করে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতি বুঝতে চেষ্টা করেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন—Queen Victoria took keen interest in riding, dancing and she was fond of vigorous life. But she took politics too very seriously and she attended to the details of administration with an unusual amount of devotion and energy…

এখন আর নাচতে-টাচতে যাস না মা—যদিও অনেকবার ডাচেজ রাণীকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নাচ ছাড়েনি। ছাড়তে পারেনি ভিক্টোরিয়া। সারাদিনই সরকারী কাজকর্ম কিম্বা ভিজিটর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শুধু সন্ধ্যাবেলার সময়টুকু রেখেছেন তাঁর নিজের জন্যে—রাণীও তো মানুষ। তাঁরও তো একটু 'লেজার' চাই। তাই সন্ধ্যায় কখনো কারো সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। তবে—

একমাত্র প্রাইম মিনিস্টার হঠাৎ কোন কাজে এসে পড়লে দেখা করেন। দেখা করতে বাধ্য হন। তাঁকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু—

সেদিন হঠাৎ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটে গেল।

কুয়াশা ঘেরা লণ্ডনে সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। বাকিংহাম প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দের দুধারে সুদৃশ্য আর অতিকায় দীপাধারে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল লাইটম্যান। মহারাণীর খাসকক্ষেও জ্বলে উঠল হাজার ঝাড় বাতির আলো। কিন্তু—

ভিক্টোরিয়া ধীর পায়ে তাঁর আলোকোজ্জ্বল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এলেন আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভেতরের দিকের ঝুলানো বারান্দায়। সময় সময় অত্যন্ত বেশি আলো, লোকজন ভালো লাগে না। শুধু ভালো লাগে স্তব্ধ

নির্জনতার ভেতরে অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকতে—বেশ নিজের মনের মুখোমুখি হওয়া যায়।

বসা হলো না তাঁর। প্রাসাদের চত্বরের ভেতরেই ডানদিকে অপরূপ কারুকার্য খচিত বিশাল এক গম্বুজ বসানো সেই গোলাকার ঘর—বাকিংহামের ড্যান্সিং হল বা নাচঘরের দিকে নজর পড়তেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

আজ কি বলনাচের আসর বসার কথা আছে? তাহলে দেওয়ালে দেওয়ালে নানারঙের সমারোহে সমুজ্জ্বল স্ফটিক পাত্রে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে কেন—কেন নৃত্যস্থলী জোরালো আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে?

আরে—আরে—ওই তো জোড়ায় জোড়ায় নাচিয়েরা আসছে। পরিচারকরা ছুটে এসে তাদের গায়ের গাউন বা আচ্ছাদন সযত্নে খুলে দিচ্ছে। তাদের কেউ কেউ আবার নাচের মেঝেটাকে মোম দিয়ে আরও মসৃণ—আরো পালিশ করে তুলছে।—ইফ উইণ্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড—(শীত যদি আসে, বসন্ত কি দূরে থাকতে পারে?) ক্ল্যারিওনেট আর ফ্লুটের মধুর সুরের মূর্ছনায় গানের এই কথাগুলো ফুটে উঠল।

সেই দূরাগত গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজনার সুমধুর ঐকতান ভিক্টোরিয়ার স্নায়ুকে মাতাল করে তুলল। আর এই গানের উপযোগী নাচের বোলগুলো নিঃশব্দে তাঁর চেতনার ভেতরে মর্মরিত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর যৌবনপুষ্ট দেহবল্লরীতে তাঁর সুঠাম দুটো পায়ে প্রবল বেগে উদ্দাম নৃত্যের একটা দুরন্ত আবেগ যেন স্পন্দিত হয়ে উঠল।

না। আর পারলেন না ভিক্টোরিয়া। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলে গেলেন নাচঘরে। খরযৌবনা নৃত্যপটিয়সী সম্রাজ্ঞীর আকস্মিক আবির্ভাবে আলোকোজ্জ্বল সেই নাচের আসর নতুন একটা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বিপুল একটা উল্লাসে তীব্র আর উদ্দাম হয়ে উঠল কনসার্ট। আর আত্মমগ্ন এক শিল্পীর মতই নৃত্যের উন্মাদনার ভেতরে একেবারে তলিয়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া।

ক্রীং-ক্রীং—

ভিক্টোরিয়ার অন্তপুরে ঘণ্টি বেজে উঠল। সম্ভ্রান্ত কোন ভিজিটরের সঙ্কেত।

লেহজান সসম্মানে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল বেলজিয়ামের নৃপতি লিওপোল্ডকে। দাদাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন ডাচেজ। বললেন, বেলজিয়াম থেকে কবে এসেছো দাদা?

তোর চিঠি পেয়েই চলে এসেছি। কি রে আলেকজেন্দ্রিনাকে দেখছি না—

কেন, ও তো একটু আগেও ওর নিজের ঘরে ছিল—

কনফারেন্স হলেও তো দেখলাম বলে মনে হলো না।

উদ্বিগ্ন ভাই বোনের অস্বস্তি দূর করল লিওপোল্ডের দেশের মেয়ে; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্নেস লেহজান। বলল, আলেকজেন্দ্রিনা নাচঘরে গিয়েছে—আমি দেখেছি—

ছিঃ ছিঃ! দারুণ একটা ঘৃণার ধিক্কারে যেন জ্বলে উঠলেন ডাচেজ। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বললেন, কত করে কতবার মেয়েকে বুঝিয়েছি এখন আর ড্যান্সিং হলে যাস না—তীব্র ক্ষোভ আর দুঃখের উজান ঠেলে আর একটি কথাও তিনি বলতে পারলেন না। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সোফায় বসে পড়লেন। নিতান্ত অসহায় মানুষের মত অস্ফুট ক্ষীণস্বরে বললেন, কী করি বলো তো দাদা—

আমি তো তোকে বহুবার বলেছি বিয়ে সাদি না দিলে ওর মন স্থির হবে না লুসিয়া—

কৈ সেদিকেও তো মাথা পাতছে না মেয়ে।

কোন কথা বললেন না লিওপোল্ড। শুধু তাঁর রেখাজটিল বহুদর্শী মুখে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। হঠাৎ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন কতগুলো কথা।

লিওপোল্ড যাই বলুন ডাচেজ। খুশি হলো বলে মনে হলো না। তাঁর সদা বিষণ্ন মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া থমথম করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, তুমি যে দাদা এসব করছো, যদি আলেকজান্দ্রা চটে যায়। আর কেঁদেকেটে অনর্থ করে—

নারে না, ওর গুরু প্রধানমন্ত্রী অনারেবল মেলবোর্ন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি। হঠাৎ থেমে গেলেন লিওপোল্ড। আবার যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, ও যে নিজের মুখেই মেলবোর্ণকে বলেছে—

ম্যাডাম কনফারেন্স হলের পরিচারিকা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এসেছেন—একটু থেমে ডাচেজের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, হার হাইনেসকে খুঁজছেন—খুব না কি জরুরী কাজ—

এখন কি হবে! ভয়ে উত্তেজনায় ডাচেজের চেতনা যেন বিকল হয়ে যায়। অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলেন—কত কতবার যে লেহজানকে নিষেধ করেছি এখন উনি কী মনে করবেন—

তুই সব তাতে বড্ড আপসেট হয়ে পড়িস, লিওপোল্ড বললেন আমি ওঁকে অ্যাটেণ্ড করছি—তুই আলেকজান্দ্রাকে খবর পাঠিয়ে দে।

বলতে বলতেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন লিওপোল্ড।

গুড ইভিনিং মিঃ মেলবোর্ন বলেই মেলবোর্নের দিকে তাকিয়ে কেমন থমকে গেলেন লিওপোল্ড।

টেবিলে মাথা নিচু করে বসে আছেন মেলবোর্ন। সামনে স্তূপাকৃতি ফাইল। তার কোন কোনটার গায়ে লাল রঙের লেবেল আঁটা 'আরজেন্ট'।

আপনার কী শরীর খারাপ?

তাঁর কথা যেন শুনতেই পেলেন না মেলবোর্ন। কেমন উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বললেন, হার হাইনেসকে কাইণ্ডলি একটু খবর দেবেন—বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কোন বিপদ নয় তো মিঃ মেলবোর্ণ—

না না, দেখছেন না দেশের সিচুয়েশান—চার্টিস্ট মুভমেণ্ট, আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ—বলতে বলতে থেমে গেলেন মেলবোর্ন। দরজার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন।

খবর পাঠিয়ে দিয়েছি মিঃ মেলবোর্ন—লেহ্‌জান—আইমীন আপনাদের কুইন এখুনি এসে পড়বেন—

সরি—ভেরি সরি—এই সময় তো আমি কখনো আসি না—তাঁকে বিরক্ত করি না—কি করবো, যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বললেন মেলবোর্ন—এমনি অবস্থা—

এমন করে বলছেন কেন মিঃ মেলবোর্ন। আমার ভাগ্নী আপনার মেয়ের মত। তাঁর কাছে যখন খুশি—যতবার খুশি—

শুনুন, তাঁকে হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করলেন মেলবোর্ন। চারিদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, স্যাকসেকোবার্গে খবর পাঠিয়েছেন কবে আসছেন প্রিন্স—

আপনি একেবারে ভাববেন না মিঃ মেলবোর্ন। আমি অ্যালবার্টকে আসতে লিখে দিয়েছি।

কবে?

প্রায় নিঃশব্দে মহারাণী এলেন মন্ত্রণাকক্ষে।

ক্ষণকাল আগের সেই সুযৌবনা সম্ভ্রান্ত নর্তকীকে আর চেনাই যায় না। গায়ে সোনার চুমকিবসানো শ্বেতশুভ্র মখমলের জামা। পরনে রূপোর জরি দেওয়া হলুদবর্ণ আবরোয়ান মসলিনের একেবারে পায়ের নিচে পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়া

স্কার্ট। মাথায় শোভা পাচ্ছে সুবর্ণ কিরীট, আর কেমন গম্ভীর, বিষণ্ণ ও চিন্তাচ্ছন্ন মুখাবয়ব।

একমনে কি এত ভাবছেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ?

ও! এসেছেন—বসুন বসুন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মেলবোর্ন। বললেন, প্রথমেই হার একসেলেন্সির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—এই অসময়ে—

আরে এসব কি বলছেন, আপান—কাজের কথা বলুন মিঃ মেলবোর্ন ?

চুপ করে বসে রইলেন মেলবোর্ন। মনে হলো তাঁর মনের ভেতরে নিদারুণ কোন দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না। হয়তো বা বলতে চাইছেনও না।

এসব কিসের ফাইল ?

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি—যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মেলবোর্ন। আর এক একটা ফাইল টেনে নিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, জানেন বোধ করি 'কর্ণ ল' (শস্যসংক্রান্ত আইন) নিয়ে প্রচণ্ড অ্যাজিটেশান চলছে।

কেন, কি চায় তাঁরা ?

রিপিল। কর্ণ লকেই পুরোপুরি বাতিল করতে চায় আন্দোলনকারীরা।

কিন্তু কর্ণ ল তাদের কা ক্ষতি করেছে ?

এই আইনের বলে শস্যের আমদানী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারাররা যে পরিমাণ জিনিস তৈরি করতো—তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ তৈরি করছে। থেমে গেলেন বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী। কয়েক মুহূর্ত আবার কি ভেবে বললেন খুব আস্তে আস্তে, ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—এটা মূলত তাঁদেরই আন্দোলন। এখন অবশ্য সাধারণ মধ্যবিত্তরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কেন, কর্ন ল তাদের কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে ?

শস্য আইনের জন্য দৈনন্দিন পণ্যের দাম যে চড়ে গিয়েছে ম্যাডাম। সাধারণ লোকের রিচের বাইরে।

তা আপনার ক্যাবিনেট কি স্টেপ নিতে চাইছে ?

কোন কথা বললেন না মেলবোর্ন।

আবার চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেলেন। অজানা একটা আশঙ্কায় ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাঁপতে লাগল—মন্ত্রীপরিষদে কোন কিছু নিয়ে মতবিরোধ হয়নি তো!

এই ফাইলের ভেতরে এই মুভমেন্টের বিবরণ আছে—দেখবেন, চোখ নিচু

করে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে ক্ষীণ গলায় বললেন আর জানেন বোধ হয়—ক্যানাডা আর ইউ এস এর (সংযুক্ত রাষ্ট্র) সেই অনেক কালের পুরনো সীমান্ত বিরোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—

হ্যাঁ—টাইমসে দেখেছি—আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ উপকূলটাই তাদের সীমানা হিসেবে দাবী করছে, থেমে থেমে ভিক্টোরিয়া বললেন, আর ক্যানাডার তরফ থেকে আমরা বলছি, কলম্বিয়া নদী পর্যন্ত আমেরিকার বাউণ্ডারি হওয়া উচিত।

হ্যাঁ। ঠিকই পড়েছেন ম্যাডাম। কিন্তু ওয়াশিংটন হোয়াইটহাউস থেকে জানিয়েছে কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় মেলবোর্ন বললেন—তাদের দাবী না মানলে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

কী! থ্রেটনিং? দপ করে জ্বলে উঠল ভিক্টোরিয়ার শান্ত আর সরল চোখদুটো। কিন্তু মুহূর্তের ভেতরে নিজেকে সংযত করে নিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি শাসনতান্ত্রিক সম্রাজ্ঞী, আমার তো কিছু করার নেই। তবে আমার মনে হয়—হঠাৎ থেমে গেলেন মহারাণী।

তাঁর কথার দিকে মনোযোগ নেই মেলবোর্নের। জানলা দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে কি দেখছেন তিনিই জানেন। রীতিমত ক্ষুণ্ণ হলেন রাণী।

আপনার কি হয়েছে অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার? বেশ কঠিন শোনালো ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর। বললেন, অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি—

তাঁর কথা যেন শুনতেই পেলেন না মেলবোর্ন। হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার কাছে সরে এসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, আমি কিন্তু আপনার মামা অনারেবল লিওপোল্ড সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছি।

কি—কি জানিয়েছেন?

প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে একবার মুখোমুখি দেখা না হলে আপনি কোন ফাইনাল ডিসিশান নিতে পারছেন না।

সত্যি বলছেন? ভিক্টোরিয়ার চোখদুটো প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। আর বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিণী বেজে যেতে লাগল। ধারালো ঝকঝকে চেহারার এক যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভেতরের দুরন্ত উত্তেজনাকে সামলে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, মামা কি স্যাক্সেকোবার্গে কোন খবর পাঠিয়েছেন?

বললেন তো পাঠিয়েছেন।

আচ্ছা একটা কথা বলবো, এবার ভিক্টোরিয়া তাঁর কাছে এসে অন্তরঙ্গ সখীর মত বললেন, আমার বিয়েতে আপনার এত ইণ্টারেস্ট কেন ?

শুভাকাঙ্ক্ষী বলে,—আবার মাথা নিচু করলেন মেলবোর্ন। মনের ভেতরে কি যেন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অস্পষ্ট গলায় বললেন, ম্যাডাম, আপনি যতই কুইন হোন—আপনি মেয়ে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। ঘরে বাইরে শত্রু বেড়েই চলেছে—এসময় একটু থেমে ভিক্টোরিয়া দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনার একজন বন্ধু দরকার।

কেন, আপনিই তো আছেন ?

কোন কথা বললেন না মেলবোর্ন। শুধু কেমন অসহায় আর করুণ চোখে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকালেন। ডাইনে বাঁয়ে মাথাটা দুলিয়ে বললেন, আমি রিজাইন করছি ম্যাডাম—

রিজাইন করতে হচ্ছে—বলছেন কি আপনি ?

কর্নল নিয়েই ক্যাবিনেটে আমার সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে ম্যাডাম—আমি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা মেজরিটি হারিয়েছি। অতএব—থেমে গেলেন বৃদ্ধ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী। চলে যেতে যেতে বললেন, আমার ব্যবহারে কখনো কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা—

আপনি এসব কি বলছেন ? এত কাণ্ড কবে হলো—কে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ? দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে একসঙ্গে আরো অনেক—অনেক প্রশ্ন করলেন ভিক্টোরিয়া। তার মনে হল—মনে হল তাঁর পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। ভারি—খুব ভারি আর অনড় একটা শবদেহের মত তিনি যেন তলিয়ে যাচ্ছেন একটু একটু করে গভীর অন্ধকারে কালো জলের স্রোতে। আর অনেক—অনেক দূরে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন তীরভূমিতে যেন নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে এক দীর্ঘ জ্যোতির্ময় পুরুষ।

বাকিংহাম প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দে মেলবোর্ন সাহেবের ভারি জুতোর মসমস শব্দ ক্রমশ বাতাসে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে। আর কেমন অসাড় হয়ে আসছে ভিক্টোরিয়ার চেতনা। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোথায়—কত দূরে—কবে—কবে আসবেন যুবরাজ আর শ্বাসরোধী এই অন্ধকারের রাজ্য থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন অবারিত আলোর জগতে—

কি রে আসবো ? সন্তর্পণে এলেন লিওপোল্ড, বেলজিয়াম অধিপতি লিওপোল্ড।

এসো মামা, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন ভিক্টোরিয়া, আজ সকালেও তোমার

এসারসারভের (লণ্ডনের উপকণ্ঠে লিওপোল্ডের প্রাসাদোপম বাসগৃহ) বাড়িতে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম।

তখনও আমি পৌঁছাই নি। আমি দুপুরে এসেছি ; একটু থেমে বললেন, চুপচাপ আসতে হয় রে। জানাজানি হয়ে গেলেই প্রোটোকল, গার্ড অফ অনারটনারের হাজারো ঝক্কি পোয়াতে হয়—কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

একটু আগে তোদের প্রাইম মিনিস্টার মেলবোর্ন এসেছিলেন—কোন খারাপ পরিস্থিতি নয় তো ?

হ্যাঁ মামা—খুব—খু-উ-ব-ই খারাপ খবর। মেলবোর্ন রিজাইন করছেন—নিস্তব্ধ ঘরে ভিক্টোরিয়ার কথাগুলো কেমন কান্নার মত শোনালো। থেমে থেমে আবার অস্ফুটস্বরে বললেন, ওরকম আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং কি তাঁর সাকসেসরের সঙ্গে কখনো হবে—

হবে রে হবে, তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? পরমস্নেহে তাঁর ভাগ্নীর মাথার একরাশ সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, পলিটিকসের ডামাডোলে মন্ত্রী অদলবদল তো হবেই—হঠাৎ থেমে গেলেন লিওপোল্ড। ভ্রূ কুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কি ভেবে আবার আস্তে আস্তে বললেন, আর সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তো প্রধানমন্ত্রী, সংঘাতের কিছু নেই—তোদের ইংল্যাণ্ডের যা কনস্টিটিউশান—

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া।

বাকিংহাম প্রাসাদের বহু প্রাচীন সেই বিশাল মন্ত্রণাকক্ষের দূর কোণ থেকে একটা পোকা ডেকে উঠল—চিপ্—চিপ্—চিপ্—চিপ্—

এখন কাজের কথা শোন, যে জন্য বেলজিয়াম থেকে ছুটে এসেছি।

তুমি কি বলবে আমি জানি, লিওপোল্ডের দিকে না তাকিয়েই ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন ভিক্টোরিয়া।

কি বল তো ? অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন বেলজিয়াম অধিপতি।

স্যাকসেকোবার্গের প্রিন্সের—

কিন্তু এটা কি—এসব কি লিখেছিস বলেই প্যান্টের পকেট থেকে মোটা খামে একটা চিঠি বের করে টেবিলে রাখলেন—

কি লিখেছি, মনে নেই মামা—হাজার ঝামেলায় থাকি—

শোন তোর চিঠির যেখানে যেখানে আমার খটকা লেগেছে—আমি তোকে পড়ে শোনাচ্ছি—

…মামা, তুমি জেনে রেখো আমার এই বিশবছর বয়স পর্যন্ত আমার স্বাধীন

ইচ্ছায় কোন বাধা কি প্রতিবন্ধক কখনো কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই ভয় হয় প্রিন্স অ্যালবার্ট (যদিও তাঁর সম্বন্ধে লোকের মুখে অনেক প্রশংসাই শুনেছি) কি আমাকে মানিয়ে নিতে পারবেন? যদি সংঘাত বাধে! তাই মামা, আমার বর্তমান কুমারী জীবনের অবসান ঘটিয়ে কারো গলায় মালা দেওয়া বা এখনকার জীবনধারা পাল্টানোর ইচ্ছে আমার আপাতত নেই।

আরও একটা আশঙ্কাও আছে শুনেছি তিনি খুব বুদ্ধিমান বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট—কিন্তু মামা তাঁর যদি আমাকে ভালো না লাগে। অবশ্য সন্দেহ খুব অল্পই আছে যে তাঁর আমাকে ভালো না লাগার! এটা ভাইসি-ভারসা, মানে উল্টোটাও আছে আমারই যদি তাঁকে একটু পছন্দ না হয় —ভালো না লাগে। তবে কি জানো মামা, কখনো কেউ আগে থেকে কারো অনুভূতির কথা বলতে পারে না। এমনও হতে পারে আমার তাঁর ওপর কোন টানই এল না—ভবিষ্যতের সুখ শান্তির জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন।

আবার তাঁকে (প্রিন্সকে) বন্ধুর মত ভাইয়ের মত পছন্দ হতে পারে হয়তো চেষ্টা করেও তাকে স্বামীর মত করে ভালোই বাসতে পারলাম না—এই সব কারণেই বিয়েতে আমার মন টানছে না মামা। আর এই জন্যেই তোমাকে এখন পর্যন্ত কথা দিইনি—দিতে পারিনি।

আচ্ছা মামা, প্রিন্সের বাবা মা দুজনেরই আমার সঙ্গে বিয়েতে মত আছে তো? আর তুমি যে, প্রিন্সকে বিয়ে করার জন্য বার বার বলছো—সেটা অ্যালবার্ট জানে?

দেখো মামা, প্রিন্সের বাবা আর্নেস্টকে আমার কথা সব খোলাখুলি নিশ্চয়ই বলবে। কী সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় যে আমি আছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

প্রিন্স এখন কোথায়? তিনি কবে ইংল্যাণ্ডে আসবেন। তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাতের জন্য আমি অত্যন্ত—অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছি…

বেলজিয়াম নৃপতি লিওপোল্ড থামলেন।

তুই তো জানিসই কোবার্গের প্রিন্সের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য তোর মা যেমন তেমনি আমরাও উদগ্রীব হয়ে আছি বহুদিন থেকে—থেমে গেলেন তিনি। ভাগ্নীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আবার আস্তে আস্তে বললেন, আর প্রিন্সের বাবা মানে আমার দাদাকে বলতে হবে কেন তিনি তো তোকে গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন…থেমে গেলেন তিনি। আবার একটু মুচকি হেসে বললেন, আমি কিন্তু অ্যালবার্টকে আসতে লিখে দিয়েছি—

কবে—কবে? তীক্ষ্ণ আর মিষ্টি একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলেন সাম্রাজ্ঞী—তুমি কি পার্টিকুলার কোন ডেট দিয়েছো? অবরুদ্ধ আবেগের উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না।

তুই যেদিন বলবি আমি সেইদিন তাকে আসতে বলবো—

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া। মাথা নিচু করে চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেলেন। তাঁর হঠাৎ মনে হল—তাঁর মনে হল প্রিন্সের জন্য যেমন যন্ত্রণা আর আকুলতা তেমনি কি তার জন্য প্রিন্সের মনেও আছে? অ্যালবার্টকে যাচাই করা দরকার।

মন্ত্রীদের সঙ্গে যেমন ভাবলেশ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাণী কথা বলেন তেমনি করে বললেন। প্রিন্স যেন কখনোই ৩০শে সেপ্টেম্বরের আগে না আসেন—এই সময় মিনিস্টারদের সঙ্গে আমার জরুরী মিটিং আছে।

আচ্ছা তাই হবে—অক্টোবরের কবে অ্যালবার্ট আসবে। তোকে জানাবো—যেতে যেতে বললেন আমাকে আজই বেলজিয়াম ফিরে যেতে হবে।

"আমাকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত. নিতে হবে। আমার বিয়ে হবে এমন একটা আদর্শ বিয়ে যা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমিক ধারায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনুসরণ করে যাবে।

হ্যাঁ। আমি ও আমার স্বামী শুধু পরস্পরকে নিবিড় ভাবে ভালবাসবো—এটাই শেষ কথা নয়। আমার যিনি স্বামী হবেন তাঁকে হতে হবে উত্তরকালের ইংল্যাণ্ডের সার্থক জনক—এই কথাগুলো একদিন কথায় কথায় ভিক্টোরিয়া মেলবোর্নকে বলেছিলেন।

মানুষ স্বপ্ন দেখে। কত রকমের অসম্ভব স্বপ্ন। কত রঙীন স্বপ্ন। সে সব সত্য হয়ে ওঠে খুব কমই। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার সেই দূরভিলাস, সেই স্বপ্ন একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।

বেলজিয়াম থেকে চিঠি এসেছিল।

লিওপোল্ডের চিঠি—৬ অক্টোবর প্রিন্স অ্যালবার্ট ইংল্যাণ্ডে পৌছবে।

উত্তেজনায় আনন্দে আর অজানা আশঙ্কায় ভিক্টোরিয়া যেন একেবারে নির্বেদলোকে পৌছে গেলেন। তাঁর বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ল। মাথার ভেতরটা টলতে লাগল। প্রথমে কি বলবে তাঁকে—কেমন করে অভ্যর্থনা করবে। কিন্তু—

আশ্চর্য! অক্টোবরের ৬ তারিখটা এল। এলেন না প্রিন্স। উদ্বেগ আর

অস্থিরতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন মহারাণী। তাঁর বুকের ভেতরে নিঃশব্দ একটা হাহাকার যেন কান্নার মত বেজে যেতে লাগল—কেন—কেন তাঁর ওপরে প্রিন্সের কতটা টান জরিপ করার জন্য তারিখটা পেছিয়ে দিয়েছিলেন! অ্যালবার্টের অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

পরদিনও এলেন না প্রিন্স।

পাগলের মত হয়ে উঠলেন ভিক্টোরিয়া। আট আর ন' তারিখটাও এল এবং পেরিয়ে গেল তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যারন স্টকমারকে বেলজিয়াম এবং সেখান থেকে স্যাকসেকোবার্গে পাঠালেন যেদিন সেইদিনই উইণ্ডসর প্যালেসে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত মহামান্য অতিথিটি এলেন।

সেদিনটা ছিল ১০অক্টোবর। ১৮৩৯ সাল।

তিন বছর আগে যখন দেখেছিলেন তখন প্রিন্সের কৈশোর সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন ভরাযৌবনের সৌন্দর্য আর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চোখমুখ তাকে অসামান্য রূপবান করে তুলেছে। ভিক্টোরিয়ার মনে হলো স্যাকসেকোবার্গ নয়। মর্ত্যলোকের কোন ভূখণ্ড থেকেই নয়—স্বপ্নের দেশ থেকে নেমে এসেছেন কোন রাজপুত্র! তাঁর অপলক দুটো চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর সেদিনের অনুভূতির কথা লিওপোল্ডকে জানিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া—

জানো মামা, টেম্পেস্টের মিরান্দার ফার্দিনান্দকে দেখে যা বলেছিল, আমারও মনে হয়েছিল সেই মধুমাখা কথাগুলো—

I might call him
A thing divine for nothing natural
I never saw so noble…

তারপর?

যা হওয়া উচিত তাই হয়েছিল।

১৬ জানুয়ারী ১৮৪০ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয়ের বার্তা ঘোষিত হলো। আর ঠিক তার পঁচিশদিন পরে ১০ ফেব্রুয়ারী বাকিংহাম থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথের দুপাশে হাস্যোচ্ছল জনতার বর্ণাঢ্য সমাবেশ হলো। বেলা যত বাড়ে ভীড় তত উপচে পড়ে। প্রত্যেকের চোখের উৎসুক দৃষ্টি রাস্তার দিকে—কখন—কখন—কোন সময় মাত্র একুশ বছরের সেই তরুণী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কনের বেশে আসবেন! রাস্তার দু পাশের বাড়ির ছাদ, বারান্দা এবং জানলা এক টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া হয়ে যেতে লাগল।

আরও এক কাণ্ড ঘটল। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ভার ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ ঝরছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই শুরু হয়ে গেল তুষারের ঝড় আর বৃষ্টি। কিন্তু—আশ্চর্য! একটা লোক নড়ল না। যেন কিছুই হয়নি!

হঠাৎ জনতার ভেতরে গুঞ্জন উঠল। বিশাল সুদৃশ্য ওয়েডিং ক্যারেজে বড় ভাই এবং বাবার সঙ্গে এলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে চেহারা। তার পরের গাড়িটিতেই ডাচেজের সঙ্গে এলেন ভিক্টোরিয়া। গলায় দুলছে হীরের কণ্ঠহার। কানে শোভা পাচ্ছে মহার্ঘ হীরের ইয়ার-রিং! মহারাণীর মাথায় মুকুট নেই। তার বদলে সোনালী চুলে লেবু ফুলের মালা চক্রাকারে জড়ানো। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্সরী। হর্ষোৎফুল্ল জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজনা উতরোল হয়ে উঠল। আর ব্যাগপাইপ ক্ল্যারিওনেট এবং ফ্লুটের ঐকতানের সুমধুর মূর্ছনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল এক আকুল প্রার্থনা—ঈশ্বর আমাদের সম্রাজ্ঞীকে সুখী করুন—তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন!

তারপর?

আর কি! যেমন হয়েছিল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিয়েতে, যেমন হয়ে এসেছে হাজার বছর ধরে ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় বিবাহে। সেই চিরাচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠান—ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপের বাইবেলপাঠ, বর-কনেকে দিয়ে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্য পবিত্র সেই শপথ করানো, তাদের দুজনকে দিয়ে রয়্যাল ম্যারেজ রেজিস্টারে বা রাজকীয় বিবাহপুস্তকে স্বাক্ষর করানো—এ সব ক্রিয়ানুষ্ঠান যান্ত্রিক নিয়মে শেষ হয়ে গেল। হতেই হবে।

ভিক্টোরিয়ার বিয়েতে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হলো—রেজিস্টারে সিগনেচার করেই স্যাকসে কোবার্গ গোথার রাজকুমার প্রিন্স অ্যালবার্ট প্রথম তাকালেন তাঁর নবপরিণীতা পত্নী ভিক্টোরিয়ার দিকে। তাঁর মুগ্ধ দুটো চোখ আস্তে আস্তে কেমন অপলক হয়ে উঠল।

ভিক্টোরিয়ার কপালে কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে দিল। কোন কথা বললেন না। বলতে পারলেন না। শুধু তাঁর নীলাভ ডাগর দুটো চোখে ঘন বর্ষার [illegible] মত কি যেন টলমল করে উঠল। তাঁর সেই স্নিগ্ধ কমনীয় দৃষ্টি যেন নিঃশব্দে বলতে লাগল—আমার অন্তর উজাড় করে তোমাকে ভালবাসবো—সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়ে তোমাকে ভালবাসবো। আমার গভীর প্রেম তোমার [illegible] পূর্ণ [illegible]—সার্থক করবে।

[illegible] ভিক্টোরিয়ার হাত দুটো নিজের হাতের [illegible] টেনে নিলেন

প্রিন্স। ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতর দিয়ে যেন রেলগাড়ির চাকা চলে যেতে লাগল শব্দের ঝঙ্কার তুলে। তাঁর মনে হল যেন মধুর এক স্বপ্নের সুন্দর একটা অজানা দেশের ভেতর দিয়ে তিনি চলেছেন। বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী। আর—

আশ্চর্য! ঠিক সেই সময় আকাশের ঘন কালো মেঘ কেটে গেল। আর নরম হলদে রোদ সিল্কের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়ল লণ্ডন শহরে।

প্রকৃতির সেই লীলাবৈচিত্র্য যেন রাণীর দূর ভবিষ্যতের অনাগত কালের আলোকজ্জ্বল এক সুদীর্ঘ সুখী জীবনের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে এসেছিল। বাস্তবিকই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ভিক্টোরিয়ার মত যেমন বিরাশি বছরের সুদীর্ঘ পরমায়ুর তেমনি অবিমিশ্র সুখী দাম্পত্যজীবনের আশীর্বাদ আর কোন সম্রাজ্ঞীর ছিল না।

প্রিন্স অ্যালবার্ট।

ভিক্টোরিয়া।

একেবারে রাজযোটক। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের পরস্পরের প্রতি আসক্তি ছিল যেমন নিবিড় তেমনি সুতীব্র। তাই দেখা যায়—

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৬১ প্রিন্সের মৃত্যুর দিনে ভিক্টোরিয়া তাঁর জার্নাল বা ডায়েরিতে লিখেছিলেন, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃসহ শোচনীয় সেই পরীক্ষার দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে···আমার দীর্ঘকালের অবলম্বন—আমার আশ্রয়স্বরূপ আমার সর্বস্বকে হারাতে হবে···আমার হৃদপিণ্ডটা যেন বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তবুও অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রিন্সের ঘরে গেলাম। তাঁর শীর্ণ মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল ছায়া। মনে হল তিনি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। আমি শেষবারের মত তাঁর করচুম্বন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সাবেক দিনের মত স্নেহভরা সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েই মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এল। জলভরা চোখের সেই করুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমি কখনো ভুলতে পারবো না···

কেন—কেন প্রিন্সের ওপরে ভিক্টোরিয়ার ছিল এই দুর্বার আকর্ষণ—শুধু কি স্বামী বলে?

না। ভিক্টোরিয়া জানতেন, তাঁকে যেমন ছোটবেলা থেকে ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞী তেমনি অ্যালবার্টকেও কুইন্স কনসর্ট হওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর মা স্যাকসে কোবার্গের পরিবারের মেয়ে, তাঁর মুখেই শুনেছিলেন প্রিন্সরা দুই

ভাই—আর্নেস্ট আর অ্যালবার্ট। দুজনের ভেতরে ছিল আকাশপাতালের ব্যবধান। আর্নেস্ট বড়। তাই স্যাকসে কোবার্গের রাজা হয়েই তখনকার দিনের ইউরোপীয় রাজরাজরাদের মত মদ, মেয়েমানুষ আর গানবাজনা নিয়ে সারাক্ষণ মত্ত হয়ে থাকতেন।

আর্নেস্ট যেমন চরিত্রহীন, অসাধু এবং উচ্ছৃঙ্খল অ্যালবার্ট তেমনি নাকি কট্টর নীতিবাদী, দারুণ নিয়মনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী—এসব কথা বলতে বলতে তাঁর মা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। জানিস—আলেকজেন্দ্রিনা, মেয়েকে বলতেন ডাচেজ, আমার দাদার ছেলে বলে বলছি না—একালে অ্যালবার্টের মত ছেলে কল্পনাই করা যায় না বুঝলি, যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সৎ প্রকৃতির। একবার তুই ওকে যে কাজে লাগাবি—সেই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতেই থাকবে···

মার চেয়ে মামা লিওপোল্ডের কাছে শুনতেন আরও অনেক—অনেক বেশি—বড় অদ্ভুত ছেলে রে! এদিকে বেশ নরম কবি কবি মন আবার ওদিকে ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিক্যাল।

তুমি আর মা বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলো ওর সম্বন্ধে; চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে ভিক্টোরিয়া বললেন, কবিমন কি করে জানলে? ওঃ, তাহলে শোন, আমাদের একটা দুর্গ আছে স্যাকসে কোবার্গে বুঝলি, বেশ জমিয়ে বলতে শুরু করেন বেলজিয়াম নৃপতি, সেই দুর্গটা হলুদবর্ণ পাথরে তৈরি। এই হলদেরঙের পাথুরে দুর্গেই অ্যালবার্টের জন্ম হয়েছিল—ছোটবেলাটা এখানেই কাটে, থেমে গেলেন তিনি। বহু—বহুদূরের তাঁর জন্মভূমির সহস্র সোনার স্মৃতি যেন তাঁর চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল। তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার যেন নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলতে শুরু করলেন—জানিস, অ্যালবার্টকে ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করতাম—পাথুরে সেই ক্যাসেলের দোতলার জানলা দিয়ে দূরে—বহুদূরে সবুজ শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে ঘন পাইনবনের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

তুই কী দেখিস বল তো?

জানো কাকা, বাইরে বাগান আলো করে ফুটে থাকা রাশি রাশি রক্তবর্ণ গোলাপের দিকে চোখ রেখেই অ্যালবার্ট বলল, এই ফুল আর দূরে বীচ, এক গাছের নিবিড় অরণ্য, নদী, ঝরনা—এই সব—সব কিছুর ভেতরে যেন আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব দেখতে পাই।

একটা কথা বলতেন না ভিক্টোরিয়া।

শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন।

বলাবাহুল্য তাঁর মা এবং মামার এসব কথাই ভিক্টোরিয়ার চেতনার ভেতরে অ্যালবার্টকে ঘিরে এক অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল।

মা কি মামা যে একটুও বাড়িয়ে বলেননি সেটা ভিক্টোরিয়া বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, মর্মে মর্মে, তিনি একটি চৌকশ লোকের হাতে পড়েছেন।

১১ আগস্ট, ১৮৪০ সাল। বিয়ের মাত্র সাত মাস পরে সম্রাজ্ঞী তাঁর কুইন্স কনসর্টকে নিয়ে প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিলেন। ভিক্টোরিয়া প্রধান মন্ত্রী মেলবোর্ণ এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্য এবং বৃটেনের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—রবার্ট পীল, জন রাসেল, বেনজামিন ডিজরেলি প্রমুখদের সঙ্গে প্রিন্সের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! অ্যালবার্ট তাঁদের প্রত্যেককে তাঁর সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে এমন সপ্রতিভভাবে তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন—যেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কতকালের পরিচয়। ভিক্টোরিয়া তো অবাক!

পরের দিনই মেলবোর্ণ রাণীকে বলেছিলেন, প্রিন্স অ্যালবার্ট তো দারুণ স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান হার হাইনেস, থেমে গেলেন তিনি, কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে আবার আস্তে আস্তে বললেন, আপনি তো জানেন ম্যাডাম, আমি খুব শীগগিরই রিজাইন করছি। আপনি প্রিন্সকে সরকারী কাগজপত্র একবার দেখিয়ে নেবেন—দুজনে পরামর্শ করে মতামত দেবেন ম্যাডাম।

স্বামীর প্রশংসায় রাণী খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর মনের ভেতরে একটা অস্বস্তি খচখচ করতে লাগল—শুধু মেয়ে বলেই কি মেলবোর্ণ সাহেব তাঁকে একটু ইনফেরিয়র বা নিকৃষ্ট ভাবছেন—প্রিন্সের চেয়ে তাঁর কি বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম আছে? কেন তিনি একলা কোন ডিসিশান নিতে পারবেন না?

ভেতরের যন্ত্রণাটাকে চেপে একদিন ভিক্টোরিয়া তাঁর স্বামীকে বললেন, দেখো বাপু তুমি কিন্তু আমার কাজকর্মে নাক গলাতে আসবে না। একটু থেমে আবার হাসতে হাসতে বললেন, কখনো গভর্নমেন্ট ডেসপ্যাচ ঘাঁটাঘাটি করবে না বুঝলে—কাউকে ইন্টারফেয়ার করা আমার প্রিন্সিপল নয় ডার্লিং—একটু যেন ক্ষুন্ন হয়েই অ্যালবার্ট শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইলে—করবো,—একটু থেমে গুমোট পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যই স্ত্রীর কপালে আলগোছে একটা চুমু এঁকে দিয়ে আবার বললেন, জানো ভিক্টোরিয়া তুমি হলে

গ্রহ, আমি তোমার উপগ্রহ স্যাটেলাইট। তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। একটু থেমে যেন কি ভাবতে ভাবতে বহু—বহুদূরে থেকে বললেন, আমি শুধু সারাজীবন তোমার পাশে পাশে থেকে তোমাকে সাহায্য করে যাবো—

প্রিন্স কথা রেখেছিলেন। ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করে তিনি নিজের দেশ, আত্মীয় পরিজন সব—সব ছেড়েছিলেন। শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়াকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল তাঁর সারাটা জীবন। তাঁর আশ্চর্য দূরদর্শিতায় কত বড় বড় যুদ্ধ, কত সংঘর্ষ কত অন্তর্বিপ্লব এবং কত বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আরো কত বিপদের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পেয়েছিল ইংল্যাণ্ড। কিন্তু এখন থাক সে সব কথা।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময় মেলবোর্নের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে এলেন উনবাট বছরের এক প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা রবার্ট পীল! তখন কুইন ভিক্টোরিয়া মাত্র বাইশ বছরের তরুণী। তাঁর খুব দুশ্চিন্তা হলো, মেলবোর্ন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর পিতার মত। তাঁরা পরস্পরকে বেশ বুঝতেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কি বনিবনা হবে?

অবশ্যই কারণ ছিল এ সব আশঙ্কার। ভিক্টোরিয়া জানতে পেরেছিলেন রবার্ট পীল নাকি কট্টর নীতিবাদী। কখনো এতটুকু কোন অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। ল্যাঙ্কাশায়ারের এক তুলোর ব্যবসায়ীর ছেলে হলে কি হয় ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। লেখাপড়া শিখেছিলেন ইংল্যাণ্ডের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে—হ্যারো এবং অক্সফোর্ডে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর রাজনীতিতে দুর্বার আকর্ষণ। পার্লামেণ্টে নেতাদের বিতর্ক শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ এই ব্যক্তিত্ব—এই বহুদর্শী নেতার সঙ্গে তিনি কি পাল্লা দিতে পারবেন? একে মেয়ে তার ওপর নিতান্ত অল্প বয়স। হয়তো তাঁকে পাত্তাই দেবেন না।

এসব ভাবতে ভাবতে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেই চিঠি এসে গেল। খামের ওপরে লেখা 'কনফিডেনসিয়াল' আর তার ঠিক নিচে রক্তের মতো লাল অক্ষরে লেখা 'ইমিডিয়েট' কথাটির ভেতরে ঝড়ের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খুব সংক্ষেপ চিঠি। হার একসেলেন্সি—রাষ্ট্রের স্বার্থেই আপনার চাকর-চাকরানী বা হাউসহোল্ড মেম্বারদের ভেতরে কিছু রদবদল করা দরকার হয়ে পড়েছে। আমি কোন কোন পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে পুরুষ—

আর পড়তে পারলেন না ভিক্টোরিয়া। মাথায় আগুন জলে উঠল। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকলেন। কি করা যায়? হঠাৎ তাঁর মনে হলো রবার্ট পীল তো প্রিন্সকে বেশ পছন্দ করেন। প্রিন্স যদি একরোখা মানুষটাকে একটু বলে। কয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারেন—কিন্তু—

অ্যালবার্টকে বলতেই ঘটে গেল আর এক কাণ্ড। ঐতিহাসিক সেই ঘটনা। চিঠিটা হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে অ্যালবার্ট বললেন, তোমার হাউসহোলডের কর্মীদের নাম নিয়ে অনেকদিন ধরেই অনেক কমপ্লেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে—

সব—সব মিথ্যে কথা। বাজে কথা। স্রেফ আমাকে হ্যারাস করার জন্যেই—

হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করলেন প্রিন্স। স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন কতকগুলো কথা।

বলো কি!

তোমাকে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেব—

সেদিন থেকেই বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ কখনো বা সেন্ট জেমস প্যালেস আবার কখনো উইণ্ডসর প্যালেস, যখন যেখানে ভিক্টোরিয়া থাকতেন সেখানকার রান্নাঘরে মাটির নিচে ভাঁড়ার ঘর বা সেলারে (যেখানে সাধারণত মদ রাখা হয়), তৈরি খাদ্যসামগ্রীর ভাণ্ডারে এবং পরিচারিকাদের খুপরি ঘরে পর্যন্ত সময়ে অসময়ে প্রিন্সকে টহল দিতে দেখা গেল। ভৃত্যমহলে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হলো।

কয়েকদিন পর।

প্রাতরাশের টেবিলে বসে প্রিন্স তাঁর রিপোর্টটা ভিক্টোরিয়াকে দিলেন। সেটা পড়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কোনদিন কোথায় কোন কোন ভৃত্য এবং পরিচারিকা কি কি অন্যায় করেছে এবং এখনও সেইসব অপকর্ম তাঁরা অবাধে করে চলেছে তার বিশদ বিবরণ—

(১) বাকিংহাম প্যালেসের ডাইনিং হলের উত্তরদিকের গেটে উর্দিপরা খানসামাটা বসে থাকে। সে সেখানে বসে মৌজ করে ধূমপান করে থাকে। প্রায়ই তার মুখ থেকে ভকভক করে সস্তা ধেনো মদের দুর্গন্ধ বেরোয়।

(২) সম্রাজ্ঞীর অতিপ্রিয় পরিচারিকা যে চারজনকে তিনি কিছুতেই সরাতে চান না তারা প্রতিদিন রাত্রে রয়্যাল কিচেন বা রান্নাঘর থেকে খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে ফেলে বাজারে বিক্রি করে দেয়।

(৩) ভূগর্ভস্থ মদের ভাণ্ডারের কাজে নিযুক্ত দুইজন ভৃত্য মহারাণীর নামে দামী মদের অর্ডার দিয়ে ধারে কিনে নিয়ে আসে। যথাসময়ে বিল চলে আসে। বাকিংহামের রয়্যাল কাউন্টার থেকে দোকানদার পেমেন্টও পায়। কিন্তু সেই

সুগন্ধী মূল্যবান মদ কোনদিনই সেলারে পৌঁছয় না।

(৪) আরও কয়েকজন প্রবীণ পরিচারক প্রতি মাসের পয়লা তারিখে বাকিংহাম প্যালেসের ক্যাস কাউণ্টার থেকে নিয়মিত মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাজে হাজির হচ্ছে না। বাড়িতে বসে থাকছে।

(৫) গোটা মাসের মত প্যালেস ঝাড়পোছ এবং সাফাই করার জন্য ডিটারজেণ্ট পাউডার, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি অপর্যাপ্ত পরিমাণে কেনা হয়। কিন্তু শুধু বাকিংহাম প্যালেস নয়, সেণ্টজেমস প্যালেস এবং উইণ্ডসর—প্রতিটি রাজকীয় প্রাসাদের চারদিকে থুক থুক করছে রাশি রাশি নোংরা। কোথায় যায় সাবান সোডা—ডিটারজেণ্ট পাউডার ইত্যাদি ক্লিনিং মেটিরিয়েল ?

হার মেজাস্টি কুইন এমপ্রেস তো নয়ই, তাঁর বেডচেম্বার বা ঘরগেরস্থালীর কাজের সঙ্গে যুক্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মচারীও এসব কোন সময় একবার ঘুরেও দেখেন না। সরেজমিনে খোঁজ করে দেখা হয়েছে, বাকিংহাম এবং অন্যান্য প্যালেসের জন্য কেনা ডিটারজেণ্ট পাউডার সাবান, ব্লিচিং পাউডার ও নানা-রকমের দামী ক্লিনিং মেটিরিয়েল খোলা বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নিয়মিত।

কিন্তু মহারাণীর ডোমেস্টিক এক্সপেনসেস বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ সরকারী টাকার নয়ছয় হচ্ছে।

আর পড়তে পারলেন না ভিক্টোরিয়া। তাঁর মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তাঁর মাথার ভেতরটা টলতে লাগল।

প্লিজ—ডোণ্ট বি সোঁ আপসেট ডার্লিং—হাসতে হাসতে অভয় দিয়ে এগিয়ে এলেন ভিক্টোরিয়ার বিপদসমুদ্রের কাণ্ডারী-প্রিন্স অ্যালবার্ট। পরমপ্রীতি ভরে রাণীর পিঠে হাত রেখে বললেন আবার, কোন দুশ্চিন্তা করো না, আমি তো আছি। বলেই চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে স্ত্রীকে কতগুলো জরুরী পরামর্শ দিলেন। আবারও ভরসা দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—আমার এই রিপোর্ট কখনো প্রধানমন্ত্রীকে দিচ্ছি না—একটু থেকে গম্ভীর হয়ে আদেশের সুরে বললেন, আমি যেমন বললাম তেমনি করে যাও।

ঠিক তিনদিন পর লণ্ডনের বিখ্যাত 'দৈনিক টাইমসে' বড় বড় হেডিং-এ খবর বেরিয়ে গেল—হার মেজাস্টি কুইন এমপ্রেস ভিক্টোরিয়া বাকিংহাম এবং অন্যান্য রয়্যাল প্যালেসের বেডচেম্বারের কাজের (দৈনন্দিন ঘরগেরস্থালীর কাজ) সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অসাধু আচরণ এবং দুর্নীতির তদন্তের জন্য নয়জন বিচারক নিয়ে একটা কমিশন গঠিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী খুশি হলেন।

ভিক্টোরিয়ার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল।

প্রিন্স নির্বিকার।

কমিশন তাদের রিপোর্ট দাখিল করল মহারাণীর দপ্তরে। ভিক্টোরিয়া দেখলেন, প্রিন্সের রিপোর্টের সঙ্গে কমিশনের বক্তব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য। ভিক্টোরিয়া অবাক হলেন না। তিনি সবই জানতেন দুটো তদন্তের বা ইনভেস্টিগেশানের রেজাল্ট এই রকম হুবহু মিলে যাওয়ার রহস্যটা কি!

কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে যেসব ভৃত্য এবং পরিচারিকা প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত চাকরি থেকে তাঁদের বরখাস্ত করা হলো। তাদের সেই ডিসচার্জ লেটারে স্বাক্ষর করে মহারাণী নিজের হাতে একটা ছোট্ট নোট লিখলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ রবার্ট পীলের অভিপ্রায় অনুসারে বাকিংহাম প্যালেসের হাউসহোল্ডের নারী ও পুরুষ কর্মীদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে যে তদন্ত করা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে কজন পরিচারিকা এবং প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের বদলি নয়—চাকরি থেকেই জবাব দিয়ে দেওয়া হলো।

যথাসময়ে এই নোটসুদ্ধ চিঠিটার কপি চলে এল পীলের হাতে। প্রধানমন্ত্রী খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রাণীর ওপরে বিরূপ মনোভাবটা উবে গিয়ে সেখানে নেমে এল গভীর প্রসন্নতা। ওদিকে ভিক্টোরিয়ার একান্ত প্রিয় পরিচারিকা এবং ভৃত্যরা যে যেখানে ছিল, সেইখানেই রয়ে গেল। কাউকেই বদলি করা হলো না। সে সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী আর কিছু বলতে পারলেন না। ভিক্টোরিয়াও খুশি হলেন। স্বস্তি পেলেন।

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বেডচেম্বারস ইনসিডেন্ট বা অন্দরমহলের ঘটনা বলে খ্যাত। কিন্তু বলা দরকার, প্রধানমন্ত্রী আর সম্রাজ্ঞীর ভেতরে যে বিরোধ ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল যবনিকার আড়াল থেকে প্রিন্স তার সন্তোষজনক মীমাংসা করেছিলেন বলেই রাজকীয় মহল মুখর হয়ে উঠল তাঁর বিপুল প্রশংসায়। আর—

আর সেই যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তারপর থেকেই রয়্যাল সার্কেলে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতেন না। পীলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স।

দস্তুরমত বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলে অ্যালবার্ট। যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি আর

প্রখর ব্যক্তিত্ব। অতএব স্বাভাবিকভাবেই শুধু ভিক্টোরিয়ার সংসারেই নয় তাঁর সরকারী কাজকর্মের ওপরেও প্রবল আধিপত্য করতে তাঁর কোন অসুবিধাই হয়নি। এমনকি বিয়ের মাত্র কয়েক বছরের পর থেকেই ভিক্টোরিয়ার যেন আলাদা কোন সত্তাই ছিল না।

বাকিংহাম প্যালেসের খলিফা এসেছে সম্রাজ্ঞীর গাউনের মাপজোক নিতে। মাপগুলো নোট করবার পর বৃদ্ধ টেলর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হার এক্সেলেন্সি যদি অনুগ্রহ করে প্যাটার্নটার কথা একটু বলেন—

ও—নো—নো—আই হ্যাভ নো টেস্ট—নো টেস্ট, ছটফটিয়ে উঠলেন মহারাণী। তারপর টেলরকে একটু হেসে বললেন, আপনি গাউনের প্যাটার্নটা প্রিন্সের কাছে জেনে নিন। তিনি যেমন বলবেন। তেমনি তৈরি করবেন, থেমে গেলেন তিনি। টেলরের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, নো, আই হ্যাভ গট নো সেপারেট এনটিটি—I entirely depend on him.

প্রিন্সের ওপরে নির্ভর না করে ভিক্টোরিয়ার আর কোন উপায়ও ছিল না, বাকিংহামের চুরিই শুধু ধরেননি, নিয়মিত দেখাশোনা করে ভিক্টোরিয়ার সংসারের খরচ মাসিক পাঁচ হাজার থেকে একেবারে তিন হাজার পাউণ্ডে নামিয়ে এনেছিলেন। রাজপ্রাসাদগুলোর ভোলই একেবারে পালটে দিয়েছিলেন। কোন বাড়ির কোথাও এতটুকু ঝুলকালি কি ধুলোবালির নোংরা দেখা যেত না। প্রতিটি প্রাসাদের প্রত্যেকটি অলিন্দ, প্রত্যেকটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি কক্ষ একেবারে আয়নার মত ঝকঝক করতো।

শুধু ডোমেস্টিক অ্যাচিভমেণ্ট বা ভিক্টোরিয়ার অন্তঃপুরের ভেতরই প্রিন্সের অসাধারণ কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থাকেনি। গ্রেটবৃটেনের সেনাবিভাগে, নৌবাহিনীতে, ইংল্যাণ্ডের জনজীবনে এমন কি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশী কোন কোন রাষ্ট্রের নৃপতিদের ওপরেও তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই এক ইংরেজ ঐতিহাসিক কুইন ভিক্টোরিয়ার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনধারার বিবরণ দিতে গিয়ে স্যাকসে কোবার্গের রাজকুমার অ্যালবার্টের প্রসঙ্গে বলেছেন··· Such brillince astonishing versatility and cold persistence were beyond imagination.

প্রিন্সের এই বিস্ময়কর সর্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁর বিপুল কর্মদক্ষতা তাঁর কঠোর অধ্যবসায় ইত্যাদি মিলে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। তাই পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর স্নেহচ্ছায়ায়

বাইশটি বর্ষা গ্রীষ্ম দিয়ে ঘেরা নিরুদ্বিগ্ন ও সুখী দাম্পত্যজীবন কাটাতে পেরেছিলেন তিনি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে যখন রবার্টপীল, বেনজামিন ডিজরেলি, জন রাসেল প্রমুখ বাঘা বাঘা ধুরন্ধর পলিটিশিয়ানরা প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছেন তখন গ্রেটবৃটেনের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়, রাজকার্য পরিচালনায় প্রিন্সের নেতৃত্ব তাঁর বিপুল প্রতিষ্ঠা কিন্তু মাত্র তাঁর অসাধারণ যোগ্যতাতেই হয়নি। তাহলে?

ভিক্টোরিয়ার জীবনীকাররা বলেছেন তার অদ্ভুত একটা কারণ—Albert quickly progessed to the pregnancy of the queen in quick succession…

১৮৪০ সালের ২১ নভেম্বর ভিক্টোরিয়ার প্রথম সন্তান—প্রিন্সেস রয়্যাল জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর জন্ম হয়েছিল, তার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে নিয়মিত কখনো পুত্র কখনো কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তাঁর নবম গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কনিষ্ঠতম সন্তান-কন্যা-বিয়েট্রিস। অবশ্যই বলতে হবে—এসব তাঁদের সুখী দাম্পত্যজীবন এবং তাঁদের দুজনের নিবিড় ভালবাসা ও তীব্র আসক্তিরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কিন্তু একেবারে গোড়াতে যে ভিক্টোরিয়া স্বামীকে বলেছিলেন আমার কোন কাজে নাক গলাতে এসো না, মেলবোর্নের অনুরোধ সত্বেও যিনি অ্যালবার্টের সঙ্গে কোন জরুরী বিষয়েই পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করতেন না সেই সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সন্তানসম্ভবা হলেন এবং প্রসূতি ঘরে যেতে হল তখন বাধ্য হয়েই অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী সরকারী কাগজপত্রের রেড বক্স বা সিক্রেট বক্সের চাবি তাঁকে স্বামীকে দিয়ে দিতে হলো।

তারপর আর কি!

সতের বছর ধরে অত্যন্ত ঘন ঘন তাঁকে প্রসূতিঘরে যেতে হয়েছিল বলেই বাধ্য হয়ে তিনি আড়ালে পড়ে গেলেন। পিছন থেকে দেখতেন কখনো বৈদেশিক নীতি কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনো বা নৌবাহিনীর সৈনিকদের ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন করছেন—আরও কত কত কাজ আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে করে চলেছেন তাঁরই প্রিয়তম অ্যালবার্ট।

॥ তের ॥

১৮৭৭ সালে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশের নৃপতিরা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁরা এক একটি বিদেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিনায়ক বলেই আমন্ত্রিত হননি—তাঁরা প্রত্যেকে সম্রাজ্ঞীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর রক্তের সম্পর্ক। কেমন করে?

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার চল্লিশ বছর বয়সে প্রথম দৌহিত্রের জন্ম হয়েছিল। তার দুই দশক পরে তিনি প্রদৌহিত্র বা পুতীর মুখ দেখেছিলেন। তিরাশী বছর বয়সে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর সময় সারা ইউরোপের দেশে দেশে একজন দুজন নয়—তাঁর সাইত্রিশটি প্রদৌহিত্র এবং দৌহিত্রী জীবিত ছিলেন। তাই ভিক্টোরিয়াকে বলা হতো ইউরোপের মাতামহী—Grandmother of Europe। বিশাল বনস্পতির মত বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে শাখাপ্রশাখা ছড়ানো পরিপূর্ণ ও সার্থক দীর্ঘ জীবন তাঁর। এইজন্যেই হয়তো জীবিত কালেই ভিক্টোরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন কিংবদন্তী—এই কথাগুলো বলেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক ডেভিড থমসন।

সত্যিই ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যেমন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবন ঠিক তেমনি সাহিত্যে সংস্কৃতিতে শিল্প ও বিজ্ঞানে এবং কারিগরি বিদ্যায় বিস্ময়কর ভাবে সমৃদ্ধ তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর আমলেই কথা সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্র এঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন পৃথিবীবাসীকে। সেই প্রথম জানতে পারা গেল, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং অতি সাধারণ ঘরের ছেলে ডেভিড কপারফিল্ড এবং অনাথ শিশু অলিভার টুইস্টকে নিয়েও বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা করা যায়। ভুবনবিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্রতিভার বিকাশও হয়েছিল তাঁরই সময়ে। উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, লর্ড মেকলে, জন রাসকিন, কবি টেনিসন, সুইনবার্ন, অস্কার-ওয়াইল্ড, থমাস হার্ডি এবং থমাস কার্লাইল প্রমুখ ধুরন্ধর চিন্তাশীল মনীষী সাহিত্যিক শিল্পীদের এক বর্ণোজ্জ্বল শোভাযাত্রা মহিমামণ্ডিত করেছিল ভিক্টোরিয়া যুগকে।

এইখানেই বলা প্রয়োজন জগদ্বরেণ্য সাহিত্যিক শিল্পীরা যে শুধু ভিক্টোরিয়ার সমসাময়িক ছিলেন তা নয়, তাঁরা রাণীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে সম্মানও যথেষ্টই করতেন।

৫ জুলাই, ১৮৪৬ সাল। কেমব্রীজ রেল স্টেশন, সেতু রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ট্রিনিটি কলেজ এবং কেমব্রীজে কুইন ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স কনসর্টের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মঞ্চের ওপরে পাশাপাশি দুটো রত্নখচিত সুদৃশ্য চেয়ারে বসেছেন মহারাণী এবং প্রিন্স অ্যালবার্ট। সভার কাজ চলেছে। হঠাৎ দর্শকদের ভেতরে গুঞ্জন উঠল—

কি ব্যাপার ?

এক বৃদ্ধ কবি না কি তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করতে চান—

রাণীর প্রশস্তি করে লেখা অনবদ্য একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা পড়লেন। এই কবিই ছিলেন ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ—

ওয়ার্ডসওয়ার্থ।*

সাহিত্যের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং কারিগরি উন্নতিতেও বলতেই হবে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল রীতিমত ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট। অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভিক্টোরিয়ার জন্মের প্রায় একশো বছর আগেই ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। জনকের কাপড় তৈরির মেশিন ফ্লাইংসাটল, জেমস হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনী, আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেম ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যে সমারোহ শুরু হয়েছিল, সেটাই আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভিক্টোরিয় যুগে। জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন স্টিফেনসনের স্টিম লোকোমোটিভ এক ধাক্কায় সভ্যতাকে অনেক—অনেক দূর অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল যখন প্রায় দু দশকের প্রান্তসীমায় পৌছে গিয়েছিল তখন জন্ম হলো—টেলিগ্রাফের। আর ঠিক সেই সময়েই শুরু হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদানে টেলিগ্রাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লণ্ডনে বসে ইংরেজ সৈন্য-দের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভিক্টোরিয়া ঘন ঘন কম্যাণ্ডারদের কাছে খবরাখবর নিতেন টেলিগ্রাম করে। আর তিনি যে নিজের হাতে যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য কম্ফোর্টার বুনছেন, রণাঙ্গনের কাছে তিনি যে একটি চলমান হাসপাতাল বা দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন ও যুদ্ধে বীরত্ব এবং নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য তিনি যে পুরস্কার দিতে চান—এসব শুভ সংবাদ সেই দূর বিদেশের রণাঙ্গনে অত্যন্ত দ্রুত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল—টেলিগ্রাম।

* ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়ম (জন্ম ১৭৭০—মৃত্যু ১৮৫০)

যদিও টেলিগ্রাফ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পা দিয়ে মাত্র বছর পনের যেতে না যেতেই (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ করে আটলান্টিক মহাসাগরের অতল জলের নিচে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে লাইন বসানোর পরেই (ট্রান্স-আটলান্টিক কেব্‌ল্) সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডের জলে স্থলে সে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। সারা মহাদেশের দিকে দিকে মাকড়সার জালের মত ছড়ানো টেলিগ্রাফের লাইন, বাঁধানো বড় বড় রাস্তা অত্যন্ত সুগম ও উন্নত জলপথ দূরপ্রসারী রেলপথ ব্যবসা ব্যণিজ্য এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ইউরোপকে একটি অখণ্ড দেশে পরিণত করেছিল। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ছ বছর আগে আইরিশ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গুগলিয়েলমো মার্কনি বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌভাগ্যবতী সম্রাজ্ঞী দেখে গিয়েছিলেন ওয়্যারলেশ টেলিগ্রাফি বা বেতার আবিষ্কার করে মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তার প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। তাই রাণীর জীবনীকার বলেছেন তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রিন্স অ্যালবার্ট যদি থাকতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন তাঁর প্রিয়তমা টেলিগ্রাম করছেন, ওয়্যারলেশ করে দূর দূরান্তরের উপনিবেশে খবর পাঠাচ্ছেন—ফোনোগ্রাফে তাঁর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করছেন এবং ছবি তুলছেন—না সাবেক আমলের ফটোগ্রাফি নয় রীতিমত সচল ছবি তুলছেন মোশান পিকচার ক্যামেরায়।

সুদীর্ঘ জীবন ভিক্টোরিয়ার।

সুবিশাল তাঁর রাজত্বের পরিধি। পুরোপুরি পঁয়ষট্টি বছরের শাসনকাল। কত যুদ্ধ, কত বিদ্রোহ, কত উত্তাল গণবিক্ষোভে আলোড়িত সেই সময়। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—কেন সম্রাজ্ঞীকে কখনো খুব বেশি বিচলিত, বিক্ষুব্ধ বা অস্থির হতে দেখা যায়নি?

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

মনে হয় আগস্টের ৩ অথবা ৪ তারিখ হবে। বাকিংহাম প্যালেসের ভেতরের বিশাল প্রাঙ্গণে সকালের রোদ পড়েছে বাঁকা হয়ে। ব্রেকফাস্টের লম্বা টেবিলের একেবার গোড়ায় বসেছেন স্বয়ং প্রিন্স, তার পরেই সারি সারি ছয় ছেলেমেয়ে। খেতে খেতেই তাঁরা টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে খুক খুক করে হাসছেন।

অবশ্যই হাসির কারণ আছে। ছেলেবেলার এক একটি মজার গল্প বলছেন অ্যালবার্ট। প্রতিদিনই বলে থাকেন। যেমন (স্যাকসে কোবার্গ) গোথার এক কোচয়ান ছিল একেবারে বুদ্ধু। অজপাড়াগাঁ থেকে এসেছিল। কিছুতেই গাড়ির জোয়ালের সঙ্গে ঘোড়া ভালো করে জুরতে পারতো না। একবার হয়েছে কি তাঁর

দাদা আর তিনি সেই বোকা গাড়োয়ানের গাড়িতে চেপে স্কুলে চলেছে। বেশ ভালই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ হলো কি যেই দাদা তাড়া দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি চলো—স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সপাং-সপাং কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল। হয়তো রেগে গিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া দুটো। আর সঙ্গে সঙ্গে জোয়াল থেকে ঘোড়ার গলার দড়ি গেল খুলে। ঘোড়া দুটো ছাড়া পেয়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে লাগল। গাড়ি গেল উল্টে। তাঁরা আছড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে—ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

খট—খট—খট—ভারি জুতোর আওয়াজ তুলে সম্রাজ্ঞী এলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই খুশির আসর।

ভিক্টোরিয়ার মুখখানা বিষণ্ণ। চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

তুমি কি কিছু ভেবেছ?

কোন কথা বললেন না প্রিন্স। কম্ফেটারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে কিসের যেন গভীর চিন্তার ভেতরে ডুবে গেলেন। রাণী উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁর সমস্ত অগতির গতি, বিপদসমুদ্রের কাণ্ডারী—স্বামীর দিকে।

২ আগস্ট, ১৮৫৮। পার্লামেণ্ট থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গিয়েছে—সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সাম্রাজ্য শাসনের ভার আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ওপরে ন্যস্ত থাকা সমীচীন নয়। এখন থেকে মহারাণী সরাসরি ভারত শাসন করবেন। কিন্তু মুশকিল হলো—ভারতবাসীদের তো জানাতে হবে পার্লামেণ্টের এই নতুন সিদ্ধান্ত, সেই ঘোষণা পত্রের যে খসড়া করেছেন প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন, তা পছন্দ হয়নি রাণীর।

সবই জানেন অ্যালবার্ট চুয়াত্তর বছরের* প্রবীণ এই জননেতা এবং ব্রিটিশ রাজনীতিতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—এই পামারস্টোনের প্রচণ্ড দাপট, তাঁর একরোখা চালচলন একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। রাণী বার বার বলা সত্ত্বেও তাঁকে না দেখিয়েই বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড বা ডেসপ্যাচ বিদেশে পাঠিয়ে দেন। অনেক সময় সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে একবারও আলোচনা না করেই অনেক জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এসব কারণেই রাণীর সঙ্গে, তাঁর বনিবনা নেই।

তুমি কি প্রোক্ল্যামেশন ডিডটা কারেকশন করেছ? স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সসঙ্কোচে বললেন ভিক্টোরিয়া।

* লর্ড পামারস্টোন (জন্ম ১৭৮৪—মৃত্যু—১৮৬৫)

কিন্তু তোমার পছন্দ হয়নি কেন—কোন কোন কথায় তোমার আপত্তি তা তো আমাকে বলোনি—প্রিন্স যেন তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন।

দেখো—আমার তো মনে হয়েছে, প্রিন্সের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে কোম্পানির শাসন থেকে ভারতে সরাসরি ব্রিটিশক্রাউনের শাসনাধীন হচ্ছে—থেমে গেলেন সম্রাজ্ঞী। আবার আস্তে আস্তে বললেন, এই রকমের একটি ঘোষণাপত্রের ভাষা আরও নরম আরও কমনীয় হওয়া দরকার। আমাদের দিক থেকে দয়া বদান্যতা—ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা—

ঠিক—অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, প্রিন্সের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। বললেন, যা নিয়ে সিপাহীদের মনে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল—সেই ধর্ম। সেই ধর্মনিরপেক্ষতার গ্যারাণ্টি দিতে হবে আমাদের স্পষ্ট ভাষায় এবং সেটাই আসল আয় তাদের—হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ব্রীফ কেস খুলে ঘোষণাপত্রটি বের করে ভিক্টোরিয়াকে দিয়ে বললেন—এই নাও—কারেকশান করে দিয়েছি—দেখো—তোমার পছন্দ হয় কি না—

ভিক্টোরিয়া পড়লেন। আর প্রিন্সের প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো—অ্যালবার্ট তাঁর পাশে না থাকলে তিনি কি করতেন!

তুমি চিন্তা করো না—অনারেবল প্রধানমন্ত্রীকেও এই ড্রাফট্ দেখিয়েছি তিনি অ্যাপ্রুভ করেছেন, একটু থেমে আবার বললেন প্রিন্স, আর সবচেয়ে আশ্চর্য—অত কট্টর মানুষও কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করেছেন।

বলো কি গো। তীব্র আবেগের ঢেউয়ে তার গলা বুজে এল। আর একটা কথাও বললেন না। বলতে পারলেন না ভিক্টোরিয়া। তাঁর মনে হলো আকাশে বাতাসে স্পন্দিত হচ্ছে এক সুমধুর গানের সুরের মূর্ছনা। অনেক—অনেকদিন পরে তাঁর নাচতে ইচ্ছে করল।

১ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মহারাণীর আদেশে যে ঘোষণাপত্র ভারতের প্রতিটি নগরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছিলেন, যে প্রোক্ল্যামেশন ডকুমেণ্ট প্রিন্স সংশোধন করেছিলেন তার খুব প্রয়োজনীয় অংশগুলোর সারসংক্ষেপ এখানে বলা হলো।

ভারতবর্ষের মধ্যে যেসব দেশের কর্তৃত্বভার এতদিন পর্যন্ত কোম্পানির ওপরে ছিল, নানাবিধ কারণে পার্লামেণ্টের লর্ডস ও কমন্সসভার সর্বসম্মতিক্রমে আমিই

ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি হিসেবে সরাসরিভাবে ভারতশাসনের দায়িত্ব নিলাম।

(ক) রাজধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলাম। ভারতের প্রতিটি প্রজার কল্যাণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাই আমার লক্ষ্য। আশা করি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় সেই কাজ নির্বিঘ্নে এবং বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করতে পারবো।

(খ) আমাদের রাজকীয় বাসনা হলো—ভারত উপমহাদেশে আমাদের শাসনাধীন চৌহদ্দিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। খৃষ্টধর্ম সত্য—এই কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বলেই সেই ধর্ম কোন ভারতীয়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করাতে কখনো চাই না। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—প্রতিটি ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাস এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান লক্ষ্য করে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সমান আচরণ করা হবে। কখনো কারো ধর্মীয় বিশ্বাসে আমাদের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করবে না।

(গ) ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেছি। তাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই আমার কাম্য। তাদের সহযোগিতাই আমার শক্তি—আমার পাথেয়। তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আমি ধন্য হবো। আজ থেকে তাদের প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করবো···

আরও আশাবাদী—আরও মধুর প্রতিশ্রুতিও ছিল। ভারতের আমার শাসনের সীমানার ভেতরের প্রতিটি নাগরিককে ধর্মনিরপেক্ষভাবে বিনা পক্ষপাতে সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের পরিকল্পনাও আমার বিবেচনাধীন আছে—

মহারাণীর এই ঘোষণায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উল্লাসের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য পামারস্টোনের খসড়ায় শাসনভার হস্তান্তরের কথাই ছিল শুধু। ভারতের নাগরিকদের প্রতি কোন দয়া দাক্ষিণ্য তথা কোন সহানুভূতির স্বর ছিল না সেই ঘোষণায়। পরাধীন দেশের মানুষ মেনে নিত। নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু সন্তুষ্ট হতো না।

মনে রাখা দরকার, প্রিন্স মধ্যস্থতা না করলে পামারস্টোন হয়তো খসড়া সংশোধন করতে রাজী হতেন না। তাঁর প্রতি রাণীর বিরূপভাব আরও তীব্র হতো। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁদের ঠাণ্ডা লড়াই আরও জটিল আরও ভয়ানক আকার ধারণ করতো।

এই রকম আরও কত সংঘাত কত সঙ্কট কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে ভিক্টোরিয়া তথা ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করেছিলেন এই জার্মান রাজকুমার প্রিন্স।

ট্রেণ্ট।

ব্রিটিশ জাহাজ চলেছে সাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে। জাহাজটি চলছে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে। অতিকায় এবং সুদৃশ্য সেই সমুদ্রযানের গহ্বরে আছে রাশি রাশি বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য। তার ছোট ছোট কেবিনে ডেকে আরোহী বা প্যাসেঞ্জারও আছে প্রচুর।

দিন শেষ হয়ে রাত নেমে এল সমুদ্রের বুকে। বিশাল সেই জলরাশির একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত কে যেন কুচকুচে কালো ইস্পাত দিয়ে মুড়ে দিল। মাথার ওপরেও কালো আকাশে হিংস্র কোন দানবের চোখের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল রাশি রাশি তারা। মনে হলো জাহাজটা যেন মানুষজন, মালপত্র বহন করে অন্ধকার পাতালপুরীর দিকে চলেছে।

এ কী হলো! হঠাৎ চমকে উঠল ক্যাপ্টেন।

গ্যাসের উগ্র সাদা আলোর ঝলক কোথায় থেকে আছড়ে পড়ছে কেণ্টের গায়ে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারার আগেই কেণ্টের চারদিক থেকে এক এক টুকরো ঘন কালো ছায়ার মত দুলে দুলে অনেক ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকো এগিয়ে এল। আর ঘেরাও করে ফেলল দুর্বৃত্ত কিম্বা সমুদ্রের ভয়ঙ্কর হিংস্র জলদস্যুরা।

কে তোমরা—কি চাও! চিৎকার করে বলে ক্যাপ্টেন নৌকোগুলোর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলেন। কে একজন ছুটে এসে তাকে বলল জলদস্যু নয়—এরা আমেরিকান সৈন্য।

শুনুন, আপনারা এসব কি করছেন—বন্দুক পাটাতনের ওপরে ফেলে দিয়ে দু হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল ক্যাপ্টেন, এই দেখুন আমার পারমিট আছে দস্তুরমত। আমাকে কেণ্টে প্যাসেঞ্জার এবং কারগো (মাল) ক্যারি করার অনুমতি দিয়ে—ছে—ন স্বয়ং আ—মা—দে—র হা—র ম্যাজে—স্টি —ই-ই—

সাগরের সাঁ সাঁ বাতাসে কথাগুলো জলের ওপর দিয়ে দূরে বহুদূরে গিয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

কিন্তু আমাদের সরকারের পারমিশান কোথায়? বলেই মার মার করে সশস্ত্র সৈনিকরা উঠে পড়ল জাহাজে। প্যাসেঞ্জারদের বন্দী করে ফেলল। আর

দামী পণ্যদ্রব্যের পেটি কিছু কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। আর কিছু নিজেরা লুট করে নিল।

যথাসময়ে এই খবর চলে এল লণ্ডনে। ইংরেজরা তীব্র উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

এসব ২৮ নভেম্বর, ১৮৬১ সালের কথা।

মন্ত্রীপরিষদের খুব জরুরী গোপনসভা বসল। ঠিক হলো—আমেরিকার ব্রিটিশ রাজদূতের কাছে সব জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে। বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। আর নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা আবহমানকাল ধরে দুই দেশের ভেতরে বাণিজ্যিক লেনদেন হয়ে চলেছে। হঠাৎ কেন এই আচরণ··· ইত্যাদি।

তখন প্রধানমন্ত্রী লর্ড জন রাসেল। তিনি তাঁর চিঠির খসড়াটা দিলেন সম্রাজ্ঞীকে তাঁর অনুমোদন এবং স্বাক্ষরের জন্য। বুদ্ধিমতী মহারাণী দেখলেন ভাষাটা অত্যন্ত উগ্র। এমন কি সাধারণ সৌজন্য ও বিনয়ের অভাব। কিন্তু কি করা যায়?

অ্যালবার্ট যে বেশ অসুস্থ। রাতে ঘুমোতে পারে না। গলায় পিঠে অসহ্য ব্যথা। না—তাকে কিছুতেই ভিক্টোরিয়া কিছু বলতে পারবে না।

কিন্তু সম্রাজ্ঞীকে বলতে হলো না। তাঁর প্রিয়তমাকে বিষণ্ণ দেখেই অস্থির হয়ে উঠলেন প্রিন্স। জোর করে সেই চিঠির খসড়া নিয়ে সারারাত ধরে অনেক মাথা খাটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখে দিলেন।

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিল পর্যন্ত আসতে পারলেন না প্রিন্স। চেষ্টা করেও পারলেন না। কেমন কালিমাড়া দুটো চোখ। অবসন্ন দৃষ্টি। ভয়ানক দুর্বল দেহ নিয়ে বিছানাতেই বসে রইলেন। চিঁচিঁ করে বললেন—স্ত্রীকে তোমার ড্রাফট আমি নতুন করে লিখে দিয়েছি।

ভিক্টোরিয়া দেখলেন—প্রিন্সের কাঁপা কাঁপা হাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা। হু হু করে উঠল ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতরটা। বেচারির কলমটা পর্যন্ত শক্ত করে ধরার জোর হারিয়ে ফেলেছে। তবুও তাঁরই জন্য সারাটা জীবন ধরে কত কষ্ট—আর ভাবতে পারলেন না। তাঁর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

কিন্তু এইরকম গুরুতর অসুস্থ শরীর নিয়েও লেখা চিঠির ভাষা, গভীর রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রখর দূরদর্শিতা এবং শত্রুর প্রতি তীব্র বিরূপ মনোভাবের বদলে সহানুভূতির সুর দেখে মন্ত্রীপরিষদ মুগ্ধ হয়ে গেল। এই চিঠি পাওয়ার পরই আমেরিকা তার ভুল স্বীকার করল। সৈনিকদের অশোভন আচরণের জন্য করল ক্ষমাপ্রার্থনা। বন্দীদের মুক্তি দিল। ক্ষতিপূরণের পাইপয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিল।

"এইরকম রাজনীতিজ্ঞ প্রিন্স অ্যালবার্টের জন্যই দুটো জাতির ভেতরে অহেতুক রক্তপাতের আশঙ্কা ও মনোমালিন্যের আগুন নির্বাপিত হয়েছিল আর এটাই তাঁর জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ। ভিক্টোরিয়ার জীবনীকার এই কথাগুলো বলেই জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত রাজকীয় সিদ্ধান্ত এবং বৈদেশিক নীতি যে শুধু অ্যালবার্টই নির্ধারণ করতেন তা নয়। ভিক্টোরিয়াও ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী।

তখন ভিক্টোরিয়ার বয়স মাত্র পঁচিশ। বছর সাতেক আগে সিংহাসনে বসেছেন। খবর এল চীনে ইংরেজদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়েছে। ক্যান্টনে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আফিং আটক করেছে চীনা অফিসার। সেখানকার ব্রিটিশ কর্মচারীদের অপমান করে তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিচ্ছে। রীতিমত ভয় দেখাচ্ছে—তাদের দেশ ছেড়ে চলে না গেলে ইংরেজদের হত্যা করবে।

ইংরেজরাও মরিয়া হয়ে উঠল। সারা চীনে যত ইংরেজ আছে সব একজোট হয়ে শুরু করল যুদ্ধ। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করার মত লণ্ডন থেকে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করলেন, চীনে বিশ হাজার সৈন্য পাঠানো হচ্ছে।

ইংরেজ সৈন্য আসছে শুনেই রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিল চীন। রবার্ট পীল তখন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই ভিক্টোরিয়া এমন কৌশলে সন্ধির সর্তগুলো তৈরি করেছিলেন যার ফলে ইংরেজদের চীনে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার তো কায়েম থাকলই উপরন্তু চীনের তথা সমগ্র প্রাচ্যদেশের আন্তর্জাতিক সর্ববৃহৎ বন্দর নগরী হংকং তাদের অধিকারে এল।

তার তেত্রিশ বছর পরে প্রিন্স কনসর্টের মৃত্যুরও প্রায় দুই দশক পরে মহারাণীরই দূরদর্শিতায় প্রাচ্যের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ—সুয়েজখালের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে গিয়ে ইংরেজরা সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় তাদের ব্যবসাকে স্ফীত করে তুলেছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ। ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী তখন বেনজামিন ডিজরেলী। বয়সে রাণীর চেয়ে যেমন এগারো বছরের বড় তেমনি রাজনৈতিক জ্ঞানে বুদ্ধিতেও রীতিমত সমৃদ্ধ। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য ভূখণ্ডে কি করে আরও নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে ইংরেজদের সাম্রাজ্যের পরিধিকে আরও বিস্তীর্ণ করা যায়। এমন সময় তাঁর কানে এল, বছর চারেক আগে খোঁড়া ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগকারী সেই সুয়েজখালের কর্তাব্যক্তিরা না কি তার সব শেয়ার বিক্রি করে দিতে চায়।

হার ম্যাজিস্টি—প্লীজ একবার—একবার ম্যাপের দিকে ভালো করে তাকিয়ে

দেখুন, ডিজরেলী টেবিলের ওপরে পৃথিবীর মানচিত্র মেলে ধরে বলেন, এই ক্যানেলটায় আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে—

হ্যাঁ দেখেছি—এই প্যাসেজটা পেলে আমরা সম্পূর্ণ পূর্ব গোলার্ধেই প্রভুত্ব করতে পারবো, ম্যাপের দিকে চোখ রেখেই রাণী উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বললেন, মিঃ ডিজরেলী—কিনে—ফেলুন যতগুলো শেয়ার পারেন—কিনে ফেলুন—এখুনি। পারলে আজই।

ডিজরেলী সুয়েজখালের ৮০ ভাগ শেয়ারই কিনে নিয়েছিলেন, তার ফলে এই বাণিজ্যপথটি এবং কয়েকবছর পরে সমগ্র ইজিপ্তই ইংরেজদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ইতিহাসে কুইন ভিক্টোরিয়ার বিপুল খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রীদেরও অবদান কম নয়। তাঁর স্বামীসৌভাগ্যের মতই আর এক সৌভাগ্য—পামারস্টোন রবার্ট পীল, জন রাসেল, গ্ল্যাডস্টোন, বেনজামিন ডিজরেলীর মত উনিশ শতকের বৃটেনের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, চিন্তাশীল জননায়করাই অলঙ্কৃত করেছিল তাঁর মন্ত্রীসভা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অ্যালবার্টের জনপ্রিয়তার উৎস কিন্তু কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের বাদানুবাদে মুখর হাউস অফ কমন্সের সভায়, পাওয়া যাবে না বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সুনিপুণ পরিচালনায়, পাওয়া যাবে না পৃথিবীর দূরদূরান্তের ভূখণ্ডে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের পরিধি বিস্তারে। তাহলে?

যেতে হবে। যেতে হবে আরও দূরে। মহানগরী লণ্ডনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে দূর গহন গ্রামের দরিদ্র কৃষকের কুটিরে, যেতে হবে নিতান্ত সাধারণ আর নগণ্য গৃহস্থের গোশালায়, যেতে হবে অনাথ শিশুদের কলকণ্ঠে মুখরিত অনাথ আশ্রমে, আবার কখনো বা কাছেই বাকিংহাম কি উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের ভৃত্যদের ঘুপচি ঘরে।

১৮৪৫ সাল।

ভিক্টোরিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির দেশ স্যাকসেকোবার্গ গিয়েছেন। আমন্ত্রণ এল কোবার্গের উপকণ্ঠে পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদের এক অ্যাসাইলাম পরিদর্শনের। তাঁরা দুজনেই গেলেন।

ভিক্টোরিয়ার হাসি হাসি মুখে ব্যথার ছায়া নেমে এল কোবার্গের এই

হাড়কাঁপানো শীতে অসহায় ছেলেমেয়েগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে ! পরনে সব ছেঁড়া ফাটা জামা। সম্রাজ্ঞী তখুনি তাদের প্রত্যেকের জন্য নতুন জামা আনিয়ে দিলেন।

সেদিন আবার ছিল সেখানে সাধু বা সেণ্ট গ্রেগোরিয়াজের পুণ্যস্মৃতির স্মরণে উৎসব এবং ভোজের ব্যবস্থা। ভিক্টোরিয়া কি করলেন—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী স্বামীকে পাশে নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লাইন করে দিব্যি বসে গেলেন খেতে।

এই বছরেরই ২৬ আগস্ট। প্রিন্সের জন্মদিন।

সেই সকাল থেকেই কোবার্গের ধনী অভিজাত রাজপুরুষেরা নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে এসে অ্যালবার্টকে দিচ্ছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু। অভিজাতদের সেই ভিড়ের ভেতরে হঠাৎ দেখা গেল এক কৃষক দম্পতি। কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় হলঘরের এক কোণে। তাদের জীর্ণ মলিন বেশবাস। কিন্তু দুজনেরই হাতে শোভা পাচ্ছে শিশিরে ভেজা নানা রঙের সুগন্ধী ফুলের স্তবক।

আরে এস—এস—তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স দুজনেই এগিয়ে এলেন। ভরসা পেয়ে মেয়েটি এক মুখ হেসে প্রিন্সের হাতে তুলে দিল তার উপহার। আর পুরুষটি দিল ভিক্টোরিয়াকে।

প্রিন্স বিস্মিত।

ভিক্টোরিয়া অভিভূত।

প্রিন্স সেই কৃষককে মোটা বখশিশ দিয়ে বললেন, আমরা তোমাদের ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

আশ্চর্য, ইস ! জিভ দিয়ে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন ভিক্টোরিয়া।

কি হলো তোমার ?

গরীবদের ওপরে তোমার কী সহানুভূতিশীল ব্যবহার, আর—বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভিক্টোরিয়া। যেন অনেক—অনেক দূর থেকে। আবার বললেন, আর ভারতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের ওপরেও আমাদের ইংরেজ কর্মচারী কী অকথ্য অত্যাচার করে—

সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি সম্রাজ্ঞী আর রাজকুমারের গভীর সহানুভূতির আরও অনেক ঘটনা আছে।

জাহাজে যেতে যেতে সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় উঠল। বাধ্য হয়েই ভিক্টোরিয়ার জাহাজকে নোঙর করতে হলো। জায়গাটার নাম টারনিউসেন। লোকজনের বাস খুব কম। ওদিকে প্রিন্সের খুব খিদে পেয়েছে। কি করা যায়—

ভিক্টোরিয়া একটি কুঁড়েঘরের সামনে দিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই ঘরের পাশে একটা হেলে পড়া টিনের শেডে বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারার দুটো গোরু। বিদ্যুতচমকের মত মনে হল ভিক্টোরিয়ার—এরা কি গাভী? তাহলে তো একটু দুধ পাওয়া খুব কঠিন হবে না—

গৃহস্থকে বলতেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর সম্পূর্ণ গোশালাটা ঘুরে দেখিয়ে দিলেন। আকণ্ঠ দুধ খাইয়ে দিলেন প্রিন্সকে।

আপনার পয়সাটা—

না না ম্যাডাম। দুধের জন্য আমি কখনো কারো কাছে থেকে দাম নিই না—

ভিক্টোরিয়া অবাক। ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন সরল সাধাসিধে লোকটার দিকে—তাঁদের চিনতে পেরেছে না কি?

না। না চিনতেই এই ব্যবহার। তাঁরা কে জানতে পারলে—

আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন ম্যাডাম—দুধের জন্য দাম লাগবে না—

লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তাদের বহুমূল্য উপহার পাঠিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া।

প্রায়ই দেখা যায়, রাজরাজড়াদের ইতিহাসে তাঁদের পরিচারকদের কোন উল্লেখ থাকে না। তাঁরা বিশাল রাজপ্রাসাদের দূর কোনে অবজ্ঞায় আর অনাদরে ও অবহেলায় অন্ধকারে মুখ গুঁজে বসে থাকে। কিন্তু—

ভিক্টোরিয়ার আমলে হলো তার ব্যতিক্রম। উদার মনের মানুষ প্রিন্সের উদ্যোগেই রাজভৃত্যরা এসেছিল পাদপ্রদীপের আলোয় অভিজাত রাজপুরুষদের আসরে।

হ্যাঁ। সেদিন—১৮৫১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী—যথারীতি লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক কাগজ 'টাইমে' ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল তার বিজ্ঞাপন: "অদ্য উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় মহাকবি সেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অভিনীত হবে—"

উইণ্ডসর প্যালেসের ভেতরে নাট্যানুষ্ঠান! আমন্ত্রিতরা কৌতুহলী হয়ে একেবারে ঝেঁটিয়ে এসেছিল। আর তারা অভিভূত একটা আচ্ছন্নতা নিয়েই বাড়ি ফিরেও গিয়েছিল। রাজবাড়ির চাকর খানসামা বাবর্চিরা এত ভাল অভিনয় করতে পারে!

বড় আশ্চর্য মানুষ ছিলেন জার্মান রাজকুমার অ্যালবার্ট। বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে (পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড হয়ে ভারতের অধীশ্বর হয়েছিলেন)

নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সামনে পড়ল একটা পুল। ব্রীজের ট্যাক্সক্যালেক্টর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে প্রিন্স কনসর্টকে এবং তাঁর ছেলেকে অভিবাদন করল। অ্যালবার্ট সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। একটু দূরে গিয়েই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো—তাঁর ছেলে এডওয়ার্ড তো কর সংগ্রহকারীকে অভিবাদন করল না—

কী ব্যাপার ? তোমাকে নমস্কার জানালো ট্যাক্সকালেক্টর ভদ্রলোক।

আর তুমি—তীব্র ক্রোধে আর কথা বলতে পারলেন না অ্যালবার্ট। নিজেকে সংযত করে অত্যন্ত কঠোর গলায় আদেশ দিলেন—যাও তাঁকে নমস্কার জানিয়ে এস—একটু থেমে আবার গাঢ় গলায় বললেন—মানুষকে সম্মান করতে শেখো—

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আসতে হয়েছিল প্রিন্স অফ ওয়েলসকে।

যেমন কঠোর নীতিবাদী তেমনি ছিল অ্যালবার্টের কর্তব্যনিষ্ঠা। সেই যে বিয়ের পরেই ভিক্টোরিয়াকে বলেছিলেন আমি তোমার উপগ্রহ—তোমার—তোমারই আলোছায়ায় থেকে তোমাকে সাহায্য করে যাবো···

কথা রেখেছিলেন প্রিন্স। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর একমাত্র ব্রত ছিল। প্রিয়তমা স্ত্রীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে কেমন করে আরও দৃঢ় করা যায়, কেমন করে ভিক্টোরিয়ার খ্যাতি প্রতিপত্তি আরও সুদূরপ্রসারী করা যায়—এসবই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

অত্যধিক পরিশ্রম করতেন। যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল তাঁর স্বভাব। আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বিদ্রোহী আইরিশরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে করতে নির্বিচারে খুন জখম করতে শুরু করল। ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে ছুটলেন সেখানে ইংল্যাণ্ডে মহামেলা হবে—হাইড পার্কে বড় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। তার তদ্বিরতাদারক করবে কে ?

কেন—প্রিন্স অ্যালবার্ট ! বিচিত্র কর্মোদ্যোগী পুরুষ। ইংল্যাণ্ডের সামরিক বিভাগকে সুসংগঠিত করে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর সামরিক শক্তিকে। সারা দেশ জুড়ে অনেক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার অত শ্বাসরোধী ব্যস্ততার ভেতরেও ডেভিড লিভিংস্টোনকে আফ্রিকায় অভিযানে পাঠাতে তাঁর ভুল হয়নি। অবশ্যই এসব কাজেই ভিক্টোরিয়ার সায় ছিল। এঁরাই প্রথম ইংরেজ রাজদম্পতি যাঁরা বিনা দ্বিধায় রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন

কলকাতার এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী বাঙালীকে। একান্ত নিকট আত্মীয়ের মতই তাঁর সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে উইণ্ডসর আর বাকিংহামের বিশাল রাজকীয় উদ্যান ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং প্রিন্স কনসর্ট। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী বাঙালীর নাম—

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। সময়টা ছিল—১৮৪৩ সালের জুলাই মাস।

মোটের ওপর বলা যায় অ্যালবার্ট তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে এমন অনেক আশ্চর্য কাজ করে গিয়েছিলেন। যার সুখস্মৃতির সম্পদ দু হাতে নাড়াচাড়া করেই ভিক্টোরিয়া তাঁর সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়াইট দ্বীপের অসবোর্নে প্রিয়তমা পত্নীর অবসর যাপনের জন্য ১০০ বিঘা জমির ওপরে বিশাল উদ্যানঘেরা এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন বহু বছর ধরে তাঁর সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে। আশ্চর্য তার গঠনসৌকর্য। অ্যালবার্টের স্বপ্ন তাঁর কল্পনা, তাঁর শ্রম তাঁর অধ্যবসায়ই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল চারদিকের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতরে সেই শ্বেতশুভ্র অট্টালিকায়। কিন্তু—

নদীর এক কূল গড়ে আর এক কূল ভাঙে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী ভিক্টোরিয়া প্রথম দিদিমা হলেন আর ঠিক তার ন মাস পরেই প্রিন্স অ্যালবার্ট অসুখে পড়লেন। এবং সেই প্রথম ভিক্টোরিয়ার সুখের জীবনে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে এল।

ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন ভিক্টোরিয়াকে ম্যাডাম প্রিন্সকে চেঞ্জে নিয়ে যান। একটু থেমে কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন আস্তে আস্তে—হাওয়াবদলের খুব দরকার—হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

কি হয়েছে—হয়েছে কী ডাক্তারবাবু! উদ্বেগে উত্তেজনায় ভেঙে পড়লেন রাণী।

কোন কথা বললেন না চিকিৎসক। দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখখানা থমথম করতে লাগল। বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী বুঝতে পারলেন—ঝড় আসছে। দারুণ ঝড়—সর্বনাশের ঝড়।

চেঞ্জের জন্য প্রিন্সকে ভিক্টোরিয়া নিয়ে গেলেন অসবোর্নে। সেই তিল তিল করে তাঁর নিজের হাতে তিলোত্তমার মত করে তোলা সেই অমরাবতী সেই বিশাল মনোরম প্রাসাদ, নানা রঙের ফুলের সমারোহে ভরা বিস্তীর্ণ উদ্যান—দূরে নীল সমুদ্রের আদিগন্ত বিস্তার, অপর্যাপ্ত অক্সিজেনবাহী উথালপাথাল বাতাসের দাক্ষিণ্য—এসব কোন কিছুতেই প্রিন্সের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। অসুখ বাড়ল। ভিক্টোরিয়া তাড়াতাড়ি করে প্রিন্সকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন লণ্ডনে।

সেই শেষবারের মত অ্যালবার্টের অসবোর্নে যাওয়া।

দিনে দিনে প্রিন্সের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। রাতে চোখের দুটো পাতা এক করতে পারেন না। প্রায়ই বলেন—পিঠে দারুণ ব্যথা। আর মনে হয় যেন তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে হিমশীতল জলের স্রোত হু হু করে বয়ে চলেছে।

ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ডাক্তার—ডাক্তর জেনার এলেন। অনেকক্ষণ নিবিষ্ট মনে রোগী পরীক্ষা করে বললেন, অত্যন্ত ক্ষয়কারক জ্বরে আক্রান্ত মনে হচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর বুক ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল কান্নার ঢেউ। হায় ঈশ্বর—এ তুমি কি—কী করলে? অ্যালবার্ট যে আমার সর্বস্ব আমার সর্বস্ব—আমার হৃদপিণ্ড—আমি—আমি কেমন করে বাঁচবো।

মাত্র—মাত্র তিনদিনের জন্য অ্যালবার্ট লিভারপুলে গিয়েছিলেন একা। নৌসেনাবাহিনীদের ব্যারাকবাড়ির উদ্বোধন করতে, পুরানো দিনের কথা ভিক্টোরিয়ার মনে ভিড় করে আসে—সেই তিনটি দিন তাঁর প্রিন্সকে দেখতে না পেয়ে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলেপুড়ে একেবারে খাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রার্থনা করেছিলেন মঙ্গলময় বিধাতার কাছে—প্রিন্সের আগে যেন তাঁর মৃত্যু হয়। প্রিন্সের কোলে মাথা রেখে মরণের সেই অপার সুখ থেকে বঞ্চিত না হয়—

কয়েক বছর আগে তাঁর অ্যালবার্টের জন্মদিনে মামা লিওপোল্ডকে চিঠি দিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া—"মামা তোমার অনুগ্রহে আমি পৃথিবীর মনুষ্যকুলের ভেতরে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাহসে এবং দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে আমি আমার স্বামী হিসেবে পেয়েছি—মামা আমি এবং ইংরেজজাতি তোমার কাছে দারুণ ঋণী।

তাহলে কি সংসারের ভালো লোকগুলোর দিকেই ঈশ্বরের আগে নজর পড়ে। কী আশ্চর্য—কী অদ্ভুত মানুষ তাঁর প্রিয়তম।

চার ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে চলেছেন অ্যালবার্ট শিকারে। সামনে পড়ল রেললাইন। আর ঠিক সেই সময় চারদিক কাঁপিয়ে গমগম আওয়াজ তুলে এসে পড়ল একটা মালগাড়ি। ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে তীরবেগে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল। প্রিন্স দেখলেন—এখুনি রেলগুমটির ঘরে ধাক্কা খেয়ে গাড়ি চুরমার হয়ে যাবে। দিলেন লাফ। নাকে উরুতে অল্প চোট খেলেন। ওদিকে প্রিন্স স্পষ্ট দেখলেন, একটা ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল মাঠ ভেঙে। গাড়ি গেল উল্টে। কোচোয়ান দারুণভাবে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রিন্স নিজে জখম হয়েও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশের পুকুর থেকে জল এনে গাড়োয়ানের চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন। ডাক্তার এল। প্রিন্স তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর

হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে বললেন। ডাক্তারবাবু—আগে ওকে—ওকে দেখুন।

এই মানুষ তাঁর অ্যালবার্ট—তাঁর প্রিন্স! তার—আর ভাবতে পারেন না ভিক্টোরিয়া। গলার ভেতরে তীব্র একটা ব্যথা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠেলে উঠে আসে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে।

"আমি প্রিন্সের ঘরে গেলাম—৫ ডিসেম্বর, ১৮৬১ সালে ডায়েরিতে লিখেছেন ভিক্টোরিয়া—আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে বললেন আর পারছি না—কতদিন আর কষ্ট ভোগ করতে হবে—বিকেলে একটু ভাল। ছোট মেয়ে বিয়েট্রিসের কাছে ফরাসী কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। কবিতা শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁকে বিশ্রাম করতে গিয়ে চলে এলাম...

পরদিন ৬ ডিসেম্বর। ভিক্টোরিয়া লিখেছেন—"প্রিন্স ভালো নেই—কোন ওষুধই কাজ করছে না। তাঁর ঘরে গেলাম। বললেন জানো আলেকজেন্ড্রিনা কাল সারারাত আমি কোবার্গের পাখিদের ডাক শুনতে পেয়েছি—সেই রাস-নাউতে (হলুদ পাথরের দুর্গ) থাকতে যেমন শুনতাম...

ধক্ করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। প্রিন্স কি তাঁর জন্মভূমি থেকেই তাঁর শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আমি কোনমতে কান্না চেপে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম—

রোগের প্রকোপ আরও বাড়ল। মাথার গোলমাল দেখা দিল। চিকিৎসকরা ভয় পেয়ে গেলেন। ডাক্তার জেনার পরিস্কার করে জানিয়ে দিলেন প্রিন্সের জীবনের কোন আশা নেই—

কিন্তু ভুল—সব ভুল! ওঁরা চিকিৎসা করতেই জানেন না। সকালে ঘরে গিয়েই দেখলেন ভিক্টোরিয়া—দিব্যি বিছানায় উঠে বসে আছেন প্রিন্স। কেমন করে যেন চুলও পাট করছেন। দিব্যি সেজেগুজে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কে জানে এই তাঁর শেষ যাত্রা। তাঁকে দেখেই বললেন, কই চলো—বেড়াতে যাবে না—

সে কী!—তুমি বলছো কি গো—ভিক্টোরিয়া মর্মভেদী চিৎকার করে উঠতেই প্রিন্স দু হাতে বুক চেপে ধরে আবার বিছানায় টলে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। কেমন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হয়ে থাকতে থাকতেই দু-তিনবার বড় বড় নিশ্বাস ফেললেন। ভিক্টোরিয়ার দিকে কেমন করুণ স্নিগ্ধ আর সস্নেহ চোখে তাকালেন। তারপরেই মাথাটা কাত হয়ে গেল। তারপরে—সব শেষ।

সেদিন ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ।

॥ চোদ্দ ॥

ইউক্যালিপটাস গাছটা কি বেড়ে উঠেছে—রীতিমত ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয়। আসছে গ্রীষ্মে বরফ গলা জল পেলেই পাশের ওক গাছটাকেও ছাড়িয়ে যাবে! দূরে ঝিলের জল আলো করে রাশি রাশি লালটুকটুকে স্পাইডার লিলি ফুটে রয়েছে। প্রিন্স বলেছিল, দেখা মানুষ চলে যাবে কিন্তু এই ফুল ঠিক ফুটতে থাকবে—এমন একটা নিদারুণ ভবিষ্যৎবাণী কি না করলেই হতো না? হু হু করে উঠল ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতরটা।

হাওয়া এল। সাঁ সাঁ করা বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ল ইউক্যালিপটাসের ডালে ডালে। উদ্যানের প্রান্তে পাইন বনে উদ্দাম বাতাস হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল। হঠাৎ সেই বাতাসের দাপাদাপিকেও ছাপিয়ে গেটের দিক থেকে কার বুট জুতোর শব্দ বেজে উঠল খট্‌-খট্‌-খট্‌। কেউ কি আসছে?

না। কেউ না। বাতাস। শ্মশানের মত নিস্তব্ধ এই অসবোর্নের জনমানবহীন প্রাসাদপুরীতে এখন আর কে আসবে? তবুও তাঁর প্রিয়তম তাঁর অ্যালবার্টকে ডাকতে ইচ্ছে হলো। ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে গলা চড়িয়ে ডাকলেন। সাড়া দেবে কে? সাড়া দেওয়ার মানুষটাই তো নেই। নেই জেনেও কতবারই তো তাকে ডাকে। ডাকতে ইচ্ছে করে। পার্লামেণ্ট কি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে খুব জরুরী চিঠি এলে, বিছানায় জ্যোৎস্না এসে পড়লে, নিশিরাতের অন্ধকার লুফে নিয়ে বাগানে তুষার ঝড় ভেঙ্গে পড়লে। আরও—আরও বেশি করে তাকে ডাকতে ইচ্ছে করে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসলে। সকালে খেতে বসে এই টেবিলের একেবারে মাথায় বসে ছেলেমেয়েদের কত গল্প করতেন অ্যালবার্ট। আবার কখনো বা কোবার্গের কোন কোন পাখির গলার স্বর অবিকল নকল করে ডাকতেন। অবাক হয়ে যেত ছেলেমেয়েরা, কখনো বা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তো।

ভিক্টোরিয়া যেন চারদিকের বাতাসে, পাতার মর্মরে অ্যালবার্টেরই টুকরো টুকরো কথা আর তাঁর হাসির ঝঙ্কার শুনতে পেলেন। পামগাছের নীলাভ ছায়ার নিচে একটা প্রেত্নীর মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

রোদচাপা মেঘে সকাল কেমন ঘোর ঘোর। এখন ফেরা দরকার। কিন্তু প্রাসাদের দিকে যেতে তাঁর পা ওঠে না। তাঁর প্রিন্স তাঁর সত্তা অ্যালবার্টকে ঘিরে রাশি রাশি স্মৃতি বিষধর সাপের মত তাঁর পা দুটোকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। তবুও যেতে হয়। যেতে চেষ্টা করেন। প্রিন্স যে এখুনি বেড়িয়ে ফিরে আসবেন।

আর এসেই তাঁকে না দেখতে পেলে একেবারে অস্থির হয়ে উঠবেন! কিন্তু তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে পড়তেই হলো।

এই সেই দেবদারুর মত দীর্ঘ সুগন্ধী ফারগাছ। বড়দিনের রাত্রে এই গাছ দিয়ে ফ্যামিলিট্রি সাজাতেন তাঁর অ্যালবার্ট। আর তাঁর দেশ জার্মানীর প্রথায় তার ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিতেন জিনজার কেক। ফারের সুগন্ধের সঙ্গে আদার তীব্র উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ মিশে এক অদ্ভুত মিষ্টি সুবাসে উৎসবের আসরে যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হতো। কোন যাদুমন্ত্রে কে জানে আলোয় ঝলমল করে উঠল এই ফ্যামিলিট্রি। আর তাকে ঘিরে শতকণ্ঠের উল্লসিত কলগুঞ্জন মেয়ে পুরুষের মিলিত হাসি অর্কেস্ট্রায় যুরাগত মধুর সুরের মূর্ছনা ইত্যাদি শব্দগুলো ভিক্টোরিয়ার মাথার ভেতরে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। আরও অনেক—অনেক শব্দ অনেক ছবি ভাঙল। আবার জুড়ল। তাঁর স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসতে লাগল।

না। দেবদারুর মত দীর্ঘ আর সুগন্ধী ও সুদৃশ্য সেই ফারগাছ নয়—ভিক্টোরিয়ার মনে হলো লম্বা হিলহিলে একটা ধূর্ত অভিসন্ধির প্রেতমূর্তির মত গাছটাকে। তাঁর মাথার ভেতরটা টলতে লাগল।

হার একসেলেন্সী—ঘরে চলুন, চারদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে একটা মিষ্টি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ফুটে উঠল। মহারাণীর ঘনিষ্ঠ সহচরী লেডী জেন চার্চিল আবারও ভয়ে ভয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, বাইরে ঠাণ্ডায় থাকলে আপনার বাতের ব্যথা বেড়ে—

আঃ বিরক্ত করিস না। তুই এখন যা, কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর থেকেই বললেন ভিক্টোরিয়া। জেন মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাণী তাকে হেঁকে বললেন, শোন, লেডী ইলাইকে বলিস—প্রিন্সের জন্য যেন গরমজলের ব্যবস্থা করে রাখে—

এতটুকু অবাক হলো না লেডী জেন। তাঁর বুক উজাড় করা একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু বাতাসে মিশে গেল। সত্যিই মহারাণীর জন্য বড় কষ্ট হয়। কি ভাবে স্বামীর স্মৃতির ভেতরে মগ্ন থেকে যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নের ঘোরের ভেতরে বাস করছেন।

আবার দিন শেষ হয়ে যখন পাণ্ডুর আর করুণ ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসবে, তখন প্রিন্সের সব সান্ধ্য পোশাকগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে একটা পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকবেন। আর ঠিক যেমন আলতো করে ফুলের গায়ের ধুলো ঝাড়ে তেমনি আলগোছে প্রিন্সের কোন কোট কি ট্রাউজারের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ত থাকে।

ওদিকে টেমস নদীতে অনেক—অনেক জল গড়িয়েছে। ঝরে গিয়েছে অনেক

সময়। প্রিন্সের মৃত্যুর পরে এইভাবেই পেরিয়ে গিয়েছে দশ-দশটা বছর। আরও—অনেক বছরই পেরিয়ে যেত যদি না ঘটতো একটা অদ্ভুত অদ্ভুত অঘটন। কিন্তু—তার আগে বলা দরকার সেই সুগন্ধী দেবদারুর মত ফার গাছের নিচে একটা পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়েই ছিলেন ভিক্টোরিয়া। ওদিকে কখন সকালের আলো নিভে গিয়ে আকাশের বুকে মেঘ জমেছে। আর বাগানের গাছপালায় হু হু বাতাসে মেঘ করা অন্ধকার তুলছে। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। কিন্তু—

যে-ই পেঁজা তুলোর মত গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করল অমনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এলেন রাণীর আর এক সহচরী ডাচেজ অফ রক্সবার।

করছেন কি হার ম্যাজেস্টি। বরফ পড়ছে—এখুনি তুষারঝড় শুরু হয়ে যাবে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন রক্সবার—শীগগির ঘরে চলুন।

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া। তার দিকে কেমন অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকালেন মাত্র। অস্ফুটস্বরে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করার মত করে বললেন, প্লীজ, তোমরা আমাকে একটু একা থাকতে দাও—প্রিন্সের এই ফ্যামিলি-ট্রির নিচে।

অনেক হয়েছে—অনেক হয়েছে। রডোড্রেনডন ফুলের গাছের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়ালো এক ভদ্রলোক। বেশ লম্বা সুন্দর চেহারা। বলল রাণীকে খুব যে হিম পড়ছে·বুঝতে পারছেন না। ঠাণ্ডা লেগে যাবে—চলুন।

সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়া। একটি কথা বললেন না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই তার গা ঘেঁসে হাঁটতে লাগলেন প্রাসাদের দিকে।

আবার হয়তো কোনদিন ভরদুপুরে ভিক্টোরিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রিন্সের বড় দাঁড়ার চিরুনি, চুল ব্যাকব্রাশ করার ব্রাশ মুছে মুছে রাখছেন—তখনো অ্যালবার্টের চুলের সুগন্ধ লেগে থাকা চিরুনিটা বুকে চেপে ধরে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছেন ঠিক সেই সময়—সেই একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে হঠাৎ তার পদশব্দ বেজে ওঠে অন্দর মহলে। দমকা বাতাসের মত ঘরে এসেই আবার দ্রুতকণ্ঠে বলে—আবার—আবার আপনি এসব নিয়ে বসেছেন—চলুন চলুন, বেড়াতে যাবেন। গাড়ি নিয়ে এসেছি—

ভিক্টোরিয়া যে অবস্থায় আছে সেইভাবেই তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কে এই ভদ্রলোক যিনি ভিক্টোরিয়ার করুণ অসহায় বৈধব্যজীবনে এত আধিপত্য বিস্তার করেছিল?

জন ব্রাউন।

ভিক্টোরিয়ার প্রিয় ফুটম্যান বা খাস পরিচারক। সে অ্যালবার্টের প্রিয় খানসামা ছিল। তাই ভিক্টোরিয়া তাঁকে পছন্দ করেন আরও বেশি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন। অবশ্যই ভৃত্যের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর এই মাখামাখি নিয়ে পথেঘাটে হাটেবাজারে অনেক গুজবই শোনা যায়—

আরে মশাই আমি নিজের চোখে দেখেছি পনি ক্যারেজে অর্থাৎ টাট্টু ঘোড়ার গাড়িতে করে হার একসেলেন্সিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে জন ব্রাউন। গাড়ির ঝাঁকিতে বুঝি গাউনটা খসে পড়ছিল। ব্রাউন তাড়াতাড়ি করে তাঁর ঘাড়ের ওপরে পিন লাগিয়ে দিল। তারপরেই পরম আদরে রাণীকে জড়িয়ে ধরল—গাড়ি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল—বলেছেন লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক মি. জন বারি।*

তখনকার 'পাঞ্চ' পত্রিকায় কার্টুনও বেরিয়েছিল ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন মহামান্যা সম্রাজ্ঞী আর তাঁর সামনে লাগাম হাতে জন ব্রাউন। আরও কলঙ্ক ছড়িয়েছিল রহস্যময় একটি পুস্তিকা 'মিসেস ব্রাউন'। স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল—Queen had married John Brown at a secret ceremony. † বিধবা রাণী গোপনে জন ব্রাউনকে বিয়ে করেছিলেন। আর সেই বিয়েতে না কি উপস্থিত ছিলেন একমাত্র মহিলা ডাচেজ অফ বরক্সবার্গ। বহু বহু বছর ধরে সারা গ্রেটবৃটেনের মানুষ মুখর হয়ে উঠতো এই জনশ্রুতিতে।

কিন্তু সত্যিই কি ভিক্টোরিয়া বিয়ে করেছিলেন, আদৌ কোন ভিত্তি আছে এই ঘটনার? কেউ কেউ ভাবছেন যাকে রাণী গভীরভাবে ভালবাসতেন, যার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল সেই জন ব্রাউনকে হলোই বা পরিচারক বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু সারা দেশে তাঁর বিপুল সম্মান, তাঁর গুরুভার রাজকীয় দায়দায়িত্ব সব জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাউনের অঙ্কশায়িনী হতে তাঁর বিবেক কখনো সাড়া দেবে—দিতে পারে? বিশেষ করে সেই রমণী যিনি বছরের পর বছর ধরে আগ্নেয়গিরির মত প্রখর ব্যক্তিত্ব আর ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে এত বড় দেশকে পরিচালনা করেছেন সেই ভিক্টোরিয়া—ইতিহাসের সেই স্বনামধন্যা সম্রাজ্ঞী কখনো নিউরটিক বা স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত এত বড় স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক কাজ করতে পারেন—এসব আলোচনা করে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল

* In 1875 John Barry an eyewitness of their love affairs with Browns From "Private Life of Queen' by E.E.P. Tisdall P. 89-90
† E. E. P. Tisdall. Private Life of Queen. P. 88

(বই পড়ে মনে হয়) সেই পুস্তিকার লেখকই জানিয়েছেন, তাঁর মনে হয় কুইনের কোন সমস্যা হলে কিম্বা মন অস্থির হলেই অ্যালবার্টের পাথুরে মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আকুল হয়ে বলতেন—কি করবো—কি করবো—তুমি বলে দাও—বলে দাও। থর থর করে কাঁপতো তার সারা শরীরটা। তাঁর জলভরা দুটো চোখের জলন্ত স্থির দৃষ্টি যেন বহু বহু দূরের অজানা পরলোককে বিদীর্ণ করে যেত।

এখন উঠে পড়ুন—এত ডাকবেন না তো—দেখবেন সব—সব ঠিক হয়ে যাবে মূর্তির আড়াল থেকে জনব্রাউন এই কথাগুলো বলতো। মনে হতো যেন প্রিন্সই কথা বলছেন। প্রজাদের আশপাশের লোকের মনে কেমন একটা ভয় আর অস্বস্তিকর অনুভূতি ঘনীভূত হয়ে উঠতো—প্রিন্সের প্রেতাত্মাই কথা বলছে না তো? কিন্তু যাই হোক জনব্রাউনের কণ্ঠস্বরে তাঁর প্রিয়তমের অবোঝ সান্নিধ্য পেয়েই শান্ত হয়ে যেতেন ভিক্টোরিয়া। অনেকেই সন্দেহ করতো জনব্রাউন ছিল তাঁর মিডিয়াম। তার মাধ্যমে রহস্যময় সেই প্রেতলোকে প্রিন্সের বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভিক্টোরিয়া।

এসব খবর কখনো চাপা থাকে না। লণ্ডন থেকে ছুটে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন ডিজরেলী, এসেছিলেন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য লর্ড ডরভি।

কি ব্যাপার—যা শুনছি সব সত্যি? তাঁরা কুইনকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে—হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠেই অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

"No. There is nothing in it" ইংল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীন অধ্যাপকও অনেকদিন ধরে অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন ব্যাপারটা নেহাতই গল্প। রটনা। জন ব্রাউনের অস্তিত্ব ছিল ঠিক। তবে সে নিতান্তই বুদ্ধিমান স্মার্ট এক সামান্য ভৃত্য। কুইন তাঁকে পছন্দ করতেন। এর বেশি কিছু নয়—হতে পারে না। কারণ Queen Victoria was Queen Victoria.

১৮৭১ সালে সেই তখুনি স্বামীর বিরহ আর শোকের সেই শ্বাসরোধী কারাগার থেকে বিষণ্ণ স্মৃতিজড়ানো অসবোর্নের প্রাসাদ থেকে মহারাণীকে উদ্ধার করে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন বিখ্যাত লেখক ও বাগ্মী মনস্বী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী।

লণ্ডনে এলেন ভিক্টোরিয়া।

তাঁর আবির্ভাবে যেন আবার বাকিংহাম আর উইণ্ডসর প্রাসাদ প্রাণের স্পন্দনে মুখর হয়ে উঠল। মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রী এবং পার্লামেণ্টের সদস্যরা যেন নতুন একটা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের চেয়ে ভালো করে আর কে

জানেন গত ত্রিশ বছর ধরে জনজীবনের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর নিবিড় সহানুভূতি ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র বা মনার্কিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। গ্রেটবৃটেনের বৈদেশিক নীতিকেও তিনি গভীর-ভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কারণ ইউরোপের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র-নায়করা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁকে পেয়ে আবার বিপুল উদ্যমে কাজ করে যেতে লাগলেন ডিজরেলী। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমতি নিয়েই সাধারণ কর্মজীবীদের স্বার্থে পাস করলেন এমপ্লয়ীজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কমেন অ্যাক্ট (১৮৭৫ খ্রী)। কিনে ফেললেন সুয়েজ খালের শেয়ার।

ইতিহাসের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী 'এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' ঘোষণা করা হলো। তাঁর নির্দেশেই উইলিয়ম বুথ প্রতিষ্ঠিত করলেন সলভেশান আর্মি। কিন্তু—

অত কাজের ভেতরেও রাণীর মনে পড়ে থাকে অসবোর্নে। ফাঁক পেলেই চলে যান তাঁর প্রিয়তমের রচিত সেই স্বর্গে। আর সেখানে পা দিয়েই তাঁর মন ভারি হয়ে ওঠে—আছে সেই অনিন্দ্যসুন্দর অসবোর্ণের প্রাসাদ, যা যে কোন সুদক্ষ স্থপতির কাছেও একটা অসম্ভব স্বপ্নের মত মনে হবে, আছে সৌধের সামনেই হলুদ রঙের পাথর দিয়ে ঘেরা ঘন সবুজের ছবির মত একটুকরো মাঠ। তার চারদিকে শোভা পাচ্ছে শ্বেতপাথরের এক একটি সুঠাম পুরুষ ও রমণী মূর্তি। স্বর্গলোকের কিন্নর কিন্নরী যেন মুগ্ধ আর অপলক চোখে দেখছে প্রাসাদের আশ্চর্য সৌন্দর্য। এখনও তেমনি আছে মাঠের পরেই নানারঙের ফুলের সমারোহে ভরা বিস্তীর্ণ সেই উদ্যান আর তারপরেই সফেন সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশির হাতছানি—আছে আছে—সব আছে—শুধু মানুষটাই নেই!

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে রডোড্রেণ্ডন গাছের ঝোপে রাশি রাশি হলদে ফুল আগুনের মত জ্বলছে। প্রিন্স থাকতে কি কখনো এত ফুল হয়েছিল? কে জানে! কে বলবে—কাকে জিজ্ঞাসা করবে, মনটা তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যায়।

আপনার ওয়াকিং স্টিকটা দেব? হয়তো কোন সহচরী এগিয়ে আসে কিম্বা কেউ বা বলে—হার এক্সেলেন্সী ভেতরে চলুন। এইমাত্র এলেন লণ্ডন থেকে একটু রেস্ট নেবেন।

কোন কথাই বলেন না ভিক্টোরিয়া। দুরন্ত কোন আবেগে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। অসহ্য একটা যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে যেতেও নিজেকে সংযত করেন। করতেই হয়। কিসের যেন অদৃশ্য প্রেরণায় তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হাসিমুখে বলেন সহচরীদের, চল তোদের একটা জিনিস দেখাবো—

ধীর পায়ে বড় হলঘরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন। চারদিকে থরে থরে সাজানো জার্মানীর দেবদেবীর সুদৃশ্য এক একটি মূর্তি, বিচিত্র কারুকাজ শোভিত মার্বেল পাথরের এক একটি স্তম্ভ, দেওয়ালের নানাবর্ণের ছবিতে কোথাও কুঞ্জবনের স্নিগ্ধ ছায়াভাস, কোথাও বা আবির রাঙানো সূর্যাস্ত—

জানিস, আমার পছন্দমত—ঠিক আমি যেমন বলেছিলাম তেমনি করে এই ঘরটা সাজিয়েছিলেন আমার প্রিন্স নিজের হাতে—কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট শোনালো ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল—দেওয়ালে ফোটো-গুলো কাদের হার এক্সেলেন্সী তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্যই বলল লেডী ইলাই।

ও জানিস না—জলভরা চোখে হাসি ঝিকমিক করে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—ওগুলো জার্মানীর জ্ঞানীগুণী মনীষীদের একটু থেমে আবার যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলেন বেচারী যেতে পারতো না দেশে—কিন্তু নিজের দেশকে বড্ড ভালবাসতো—

রাত্রে সখীদের এবং দুএকজন অতিথিকে নিয়ে খেতে বসেন ভিক্টোরিয়া। ডাইনিং টেবিলে বসে গল্পে হাসিতে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রাতরাশ খেতে হয় একা—একেবারে একা। এটাই রাজবাড়ির নিয়ম। আর তখুনি হয় মুশকিল। খেতে খেতে আনমনা হয়ে যান। লম্বা টেবিলে প্রিন্সের শূন্য জায়গাটার দিকে তার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। একটা—মাত্র একটা মানুষের অভাবে কী ভয়ানক ফাঁকা আর নির্জন বাড়িটাকে তাঁরই মত অসহায় মনে হয়।

খাওয়া আর হয় না। উঠে গিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন। এই তো গালের হাড় দুটো বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখের নীচে কালি পড়েছে। পড়ুক—যত শীগগির—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর অ্যালবার্ট তাঁর প্রিন্সের কাছে যেতে পারলে তিনি খুশি হবেন।

হ্যাঁ। এই ভাবেই তাঁর করুণ বৈধব্যজীবনের দুর্বহ বোঝা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাঁর জীবন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনায় তিনি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

এল ১৮৮৭ সাল।

ভিক্টোরিয়ার শাসনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। দেশ জুড়ে তার জুবিলি উৎসবের তোড়জোড় শুরু হলো। এমন সময় লণ্ডন থেকে ডিজরেলি লিখলেন ভিক্টোরিয়াকে আপনার সংসারের কাজকর্মের জন্য খানসামা খিদমতগারদের ভেতরে যদি কিছু কিছু ভারতীয়কে নেন তাহলে ভারতবাসীরা খুশি হবেন।

সারটেনলি! অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণী খুশি হলেন। হুকুম দিলেন ব্যালমর‍্যালে পাঠিয়ে দাও তাদের—আমি এখানে কিছুদিন থাকবো।

পাঁচ-ছজন লোক এল। কিন্তু তাদের ভেতরে সম্রাজ্ঞীর পছন্দ হল একজনকে। বেশ লম্বা। দোহারা চেহারা। ধারালো মুখে ঘন কালো কুচকুচে চাপদাড়ি। দুটো বড় বড় চোখে বুদ্ধির ছাপ, গায়ে সূচীশিল্পের কারুকাজ করা লম্বা সাদা কোট। মাথায় সাদা পাগড়ি।

ভিক্টোরিয়া তখুনি তাকে তাঁর খিদমতগার হিসেবে নিযুক্ত করলেন। আব্দুল করিম ওরফে হাফিজ আব্দুল করিম অর্থাৎ সেই ভৃত্য বেশ ভাল ইংরেজিও বলতে পারে। তার কথাবার্তা চালচলনে সহবতে রাণী রীতিমত অভিভূত হয়ে গেলেন। এবং বিপুল উৎসাহে হিন্দী অভিধান কিনে নিয়ে তার কাছে হিন্দীভাষা শিখতে শুরু করলেন। আর সেই সূত্রেই সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল করিমের।

ভিক্টোরিয়া যেখানে যান সেইখানেই ছায়ার মত থাকে তাঁর ভারতীয় খিদমতগার। রাণী ডেস্কে বসে কাজ করেন। তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে আব্দুল। তার হাতে থাকে রাণীর ওয়াকিং স্টিক। কখনো বা প্রায় আধ শোয়ার ভঙ্গীতে তার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে রাণী কি লিখছেন। অতএব—

যা হওয়ার নয় তাই হলো। খিদমতগার হয়েও রাণীর হাতে হাত রাখতে খুব বেশি দেরি লাগল না। দেখা গেল সম্রাজ্ঞী আব্দুলের কাঁধে হাত রেখে, কখনো বা তার হাতে হাত রেখে আস্তে আস্তে বাগানে হাঁটছেন। রাজবাড়ির অন্দরমহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল আব্দুলের দাড়ি গোঁফ নির্মূল করে কামানো। তাতে চেহারাটা আরো খোলতাই হয়েছে। খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝকঝক করছে। কেউই অবাক হল না। নিশ্চয়ই মালকিনের সায় আছে।

ব্যাপার আরো অনেকদূর গড়ালো। ভিক্টোরিয়া কেমন করে জানতে পারলেন করিম যদিও ছোট কাজ করছে। কিন্তু সে ভৃত্যশ্রেণীর লোক নয়। তার বাবা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সার্জেন জেনারেল। সঙ্গে সঙ্গে রাণী তাঁর সেক্রেটারী পনসনবিকে নির্দেশ দিলেন—করিমকে ক্লার্কের পোস্টে প্রমোশন দেওয়া হবে। বাড়ির কোন কাজ তাকে করতে হবে না। সে শুধু তাঁকে হিন্দী পড়াবে। তার ডেজিগনেশন হবে ক্লার্ক কাম মুনসি!

মুনসি আব্দুল করিম হাফিজ খিদমতগারের সেই সাদা উর্দি বাক্সে তুলে রেখে আর পাঁচজন পদস্থ কর্মচারীদের মত ফ্রক কোট পরতে লাগল। কিন্তু রাণী

লক্ষ্য করলেন আব্দুল তার মাথার পাগড়িটা ছাড়েনি। থাক—ভারতীয় মুসলমানদের অনেক রকমের সংস্কার থাকে।

আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী। ঘোষণা করলেন মুনসি অত্যন্ত সৎ এবং বুদ্ধিমান। ভারত সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল। অতএব ভারতের যেসব সমস্যা তাঁর বিবেচনার জন্য আসে, সেসব দেখাশোনা করবে আব্দুল।

রাজবাড়ির বাতাসে চাপা ফিসফিসানি শোনা গেল। আর একজন ব্রাউনের উদয় হয়েছে রে!

প্যালেসের কর্মচারী এবং বাসিন্দাদের চোখ আরও টাটাতে লাগল। রাণী ঢালাও হুকুম দিলেন—মুনসি ইচ্ছে করলে বিলিয়ার্ড খেলতে এবং রাত্রের ডিনারও অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে বসে খেতে পারে। তারপরে বারুদে অগ্নিসংযোগ হলো তখন যখন শোনা গেল সম্রাজ্ঞী শুধু সেই সব ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করছেন যার ভেতরে তাঁর মুনসির ছবি আছে।

১৮৯০ সাল। স্কটল্যাণ্ডে গেলেন ভিক্টোরিয়া। সেখানকার লোক অবাক হয়ে দেখল বেশ লম্বা চওড়া চেহারার এক ভারতীয় রাণীর সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। মাঝে মাঝে তাঁর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় কথা বলছে—

কে এই লোকটা? ডিউক অফ কনট রীতিমত চটে উঠলেন।

কোন লাভ নেই—সেক্রেটারী পনসনবি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন হার হাইনেসের হিন্দীর টিচার। ওর সম্বন্ধে তিনি একেবারে ব্লাইণ্ড।

মুনসিকে নিয়ে আরও বাড়াবাড়ি করলেন ভিক্টোরিয়া। তাকে ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ারস বা ভারত সংক্রান্ত সেক্রেটারী করে দিলেন। করিমের একটা আলাদা অফিস হলো। চেম্বার তৈরি হলো তার। দু-দুজন ইংরেজ কেরানীও তাকে দেওয়া হলো।

ভারত প্রসঙ্গে যেসব কাগজপত্র আসে সেগুলো সোজা চলে যায় মুনসির কাছে করিম সেগুলো অ্যাপ্রুভ করলে ভিক্টোরিয়া তাতে স্বাক্ষর করেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস থেকে প্রায়ই হোমড়াচোমড়া অফিসাররা রাণীর সঙ্গে নানা পরামর্শ করতে এসে দেখল, এক ইণ্ডিয়ান রাণীকে একেবারে নিজের লোকের মত রীতিমত বকাবকি করে কথা বলছে—Munshi spoke to Queen with blunt familiarity…গ্রেটবৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এত অভদ্র এবং অশালীনভাবে কথা বলছে এক ভারতীয়! তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লণ্ডনে এসে রিপোর্ট করল। এসব কথা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মুনসি আব্দুল করিম হাফিজের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ঘনীভূত হলো।

রাণীর কানে পড়ে সব কথা। কিন্তু আমল দেন না। যথারীতি 'ডিয়ার মুনসি' বলে ডেকে কথা বলেন। কখনো বা বলেন 'মাই ডিয়ার সেক্রেটারী'।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনায় আলোড়িত হয়ে উঠল সারা ইংল্যাণ্ড। অসবোর্নে মুনসির একটি বাংলো ছিল। কুইন দামী আসবাবপত্র দিয়ে মেঝেতে ইস্পাহানী কার্পেট বিছিয়ে প্রতিটি ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বলা নেই কওয়া নেই সেই বাড়িতে ভারত থেকে হুট করে এসে হাজির হল আব্দুলের এক বন্ধু। সহপাঠী। মুনসি বিরক্ত হলো। এবং তাকে একেবারে পাত্তা তো দিলই না বরং তাকে না চেনার ভান করল। এই লোকটা যাওয়ার সময় প্যালেস ইনচার্জ মেজর জেনারেল ডেনিনিকে বলে গেল—আমি আব্দুলকে বহুদিন ধরে চিনি। ওর ওপর নজর রাখবেন—লোক সুবিধের নয়—He was a sinister…

ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মহলে চাপা গুঞ্জন শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতে ব্রিটিশবিরোধী গোপন কার্যকলাপ বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। মুনসির তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তো? লোকটা ওদের গুপ্তচর হতে পারে।

কথাটা ভিক্টোরিয়ার বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস পরবর্তীকালের ভারতের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কানে উঠল। তিনি আব্দুলকে নিয়ে তাঁর মার বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারতেন না। লোকটাকে হিংসা এবং ঘেন্নাও করতেন। তিনি আবার ছিলেন খুব আড্ডাবাজ এবং গপ্পে লোক। করিমকে ঘিরে গুপ্তচর বলে সন্দেহের কথাগুলোকে বেশ ফলিয়ে লণ্ডনের বিভিন্ন ক্লাবে, বাজারে বলে বলে চাউর করে দিলেন।

কয়েকদিন পরেই লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইমসের চীফ স্টাফ রিপোর্টার লিখলেন, "যতদূর মনে হচ্ছে হার হাইনেসের প্রিয়পাত্র মুনসি আব্দুল করিম একজন 'ইম্পস্টার' বা ভণ্ড ও প্রতারক এবং ভারতে ব্রিটিশবিরোধী জনমত যারা গঠন করছে তাদের অনুচর হওয়াও বিচিত্র নয়। বৃদ্ধ সম্রাজ্ঞীকে বোকা বানিয়ে এবং তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজের কাজ হাসিল করছে। গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় সরকারী রেকর্ড নিয়ে তাকে কাজ করতে দেওয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।"

রাণী অটল।

পারসন্যাল সেক্রেটারীকে জানালেন, খবরের কাগজের মন্তব্যকে মোটেই আমল দেবেন না—

কিন্তু সম্রাজ্ঞী বললে কি হবে, তাঁর অতি উৎসাহী কর্মচারীরা হাত গুটিয়ে

বলে রইল না। ভারতের কয়েকজন প্রবীণ ইংরেজ অফিসারের কাছে নির্দেশ গেল —মুনসির বাবা মা বাড়িঘর ইত্যাদি তত্ত্বতল্লাস করে ইংল্যাণ্ডে জানিয়ে দিতে।

এই ঘটনার পরেই মুনসি কেন যেন বিশাল রাজপ্রাসাদের কোন দূর কোণের —অন্ধকারে হারিয়ে গেল। হয়তো যদি ইণ্ডিয়া থেকে খবর আসে—সে ইম্পস্টার সেই ভয়েই নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিল।

হতভাগ্য মুনসির জন্য বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মন কিন্তু ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠেছিল। কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হয়েছিল। হঠাৎ তাঁর নিজের জীবনটাকে দীর্ঘ—বড় বেশি দীর্ঘ বলে মনে হয়েছিল। বড় অনাবশ্যকভাবে বেশিদিন বেঁচে আছেন। আরও কতদিন কতকাল যে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে আরও কত লোকের দুঃখদুর্দশা দেখতে হবে—অসবোর্নের উদ্যানের শাঁ শাঁ বাতাসে মিশে গেল তাঁর দীর্ঘশ্বাস।

ভিক্টোরিয়া কিন্তু তখনো আব্দুল করিমকে 'মাই ডিয়ার মুনসি' কিম্বা ডিয়ার সেক্রেটারি বলে ডাকতেন। তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। সকালে সন্ধ্যায় বার্ধক্যের ভারে নুয়েপড়া সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা যেত সেই পরিচিত রহস্যময় মানুষটির মূর্তি—সেই সাদা লম্বা কোট আর মাথায় সাদা পাগড়ি—মুনসি আব্দুল করিম হাফিজ।

ভারত থেকে কি খবর এসেছিল জানা যায় না। তবে ইতিহাসে বলেছে মুনসি—still faboured by the Queen…

বলতেই হয় ভিক্টোরিয়ার জীবন যেমন খ্যাতিতে সুখে সমৃদ্ধিতে এবং বিপুল জনপ্রিয়তায় উজ্জ্বল ও গৌরবময় তেমনি তাঁর শেষের দিনগুলো বড় করুণ ও মর্মান্তিক।

প্রিন্সের মৃত্যুর পরই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দিনে দিনে মানসিক অবসাদ এবং বাতব্যাধি তাঁকে জীর্ণ করেছিল। তুচ্ছ কোন কথায় হঠাৎ রেগে উঠতেন। কোন কথা মনে রাখতে পারতেন না। মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে কেমন একটা অসুস্থতা বা মরবিডিটি তাকে গ্রাস করেছিল। সামান্য উত্তেজনায় হিস্টিরিয়া রোগীর মত তীব্র ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে দিতেন। শুধু অবাস্তব কতগুলো কল্পনা এবং অযৌক্তিক সব চিন্তার ভেতরে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন।

শোকতাপও নেহাত কম ছিল না। তাঁর একাধিক জীবনীকারই জানিয়েছেন—

হঠাৎ অ্যালবার্টের মত স্বামী মারা গেলেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছরে বিধবা হলেন। ছোট ছেলে লিওপোল্ড—ডিউক অফ অ্যালবানি রক্তদূষণজনিত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে চিররুগ্ন হয়ে বেঁচে ছিলেন। বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলসও থেকে থেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতেন। তাঁর মনে হতো তাঁর দেহের রক্ত যেন কেমন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! ইংল্যাণ্ডের প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন—এটা রক্তদূষণের ভয়াবহ ব্যাধি—'হ্যামোফিলিয়া'। হ্যানোভার বংশ এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য রাজবংশীয় রীতি অনুযায়ী যুগযুগান্তর ধরে একই গোষ্ঠীর ভেতরে বিবাহের ফলে এই রোগ দেখা দেয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ভিক্টোরিয়ার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। হাতে পায়ে বিষের মত বাতের ব্যথা। হাঁটতে পারেন না। ঘুমোতে পারেন না একফোঁটা। দু চোখে ছানি। লেখাপড়া অসম্ভব। তাঁর ডায়েরিটা তিনি বলে যেতেন। তাঁর সেই দিনলিপিতে আছে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর করুণ ইতিবৃত্ত, যা এসেছিল—২২শে জানুয়ারী।

ছেলেমেয়েরা যে যেখানে আছে খবর দেওয়া হলো। যাঁরা আসতে পারলেন তাঁরা তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মনে হল ভিক্টোরিয়া যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ চোখ মেলে একবার অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—বা—টি। (বড় ছেলে। প্রিন্স অফ ওয়েলস)

সেই তাঁর শেষ কথা। তারপরেই শেষবারের মত চোখ বুজলেন। ছেলে-মেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁরা ভিক্টোরিয়াকে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বিয়ের পোষাকে সাজিয়ে দিলেন।

কুইন ভিক্টোরিয়া আবার বিয়ের কনে সাজলেন। পাশে তাঁর প্রিয়তম অ্যালবার্টের ছবি। অবশেষে তাঁদের সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ আর বিরহের যন্ত্রণার অবসান হলো।

॥ পনের ॥

দিনটা ছিল রবিবার।

যদিও ঝির ঝির করে একটু বরফ ঝরছিল, আকাশটা ছিল বেশ পরিষ্কার। রোদ উঠেছিল। সকালের নরম হলদে রোদ। বরফের কুচি সোনালী রঙের হীরে হয়ে জ্বলতে লাগল গাছের ডালে ডালে।

সেদিন সারা লণ্ডন শহর নতুন সাজে সেজে রূপসী হয়ে উঠেছিল। রাস্তার

দুধারে বর্ণাঢ্য পোশাক পরে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। তাদের মুখে উল্লাসের হাসি। চোখে উৎসুক দৃষ্টি। কখন-কখন এই পথে আসবে সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা। আর কত—কত দেরি? অসহ্য অস্থিরতায়, তাদের হাত দুটো নিসপিস করে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ বাতাসে ভেসে এল সমবেত হাজারো মানুষের দূরাগত কলরোল। উদ্বেল হয়ে উঠল জনতা। আসছে—মিছিল—আসছে।

শোভাযাত্রা এল।

প্রথমেই রক্তগোলাপের গাঢ় রঙের পোশাকে সুসজ্জিত এক হাজার অশ্বারোহী। তারা পেরিয়ে যেতে সামনে এসে দাঁড়ালো দুটো খচ্চরে টানা একটা খোলা গাড়ি। আর এই গাড়িতেই দেবীর মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের রাণী—নতুন রাণী এলিজাবেথ।

সোনালী ব্রোকেডের মহার্ঘ পোশাকের ফ্রেমে আঁটা তাঁর যৌবনপুষ্ট দীর্ঘ ঋজু দেহটা তরল আগ্নিধারার মত জলছিল। মাথায় শোভা পাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী রত্নখচিত মুকুট।

তাঁর গাড়ির দুপাশে সারি বেঁধে চলছিলেন সোনালী যুদ্ধ-কুঠার হাতে রাজ্যের গণ্যমান্য লোক। তাঁদের সঙ্গে আরও কিছু লোকও যাচ্ছিল। তাদের গায়ে ছিল সোনালি রুপোলি কারুকাজ করা লাল ভেলভেটের জামা, তার পিঠে বুকে আঁকা সাদা আর লাল গোলাপ আঁকা। তাতে ফুটে রয়েছে এলিজাবেথের নামের আদ্যক্ষর।

রাজপথের দুপাশে কাঠের রেলিং কিংথাব আর ভেলভেটে মোড়া। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত লোক। দুপাশে বড় বড় বাড়ির অলিন্দে জানলায় অসংখ্য উৎসুক মুখ। তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে হাত নেড়ে তাদের নতুন রাণীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

যেতে যেতে হঠাৎ এলিজাবেথের গাড়ি থেমে গেল। দেখা গেল এক বৃদ্ধ তাঁকে কি যেন বলার চেষ্টা করছে।

কী ব্যাপার—কি বলছে বুড়ো?

রাণীর আনন্দ্যসুন্দর মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বহুদর্শী মানুষটি বলেছে তাঁকে—আপনার পিতা অষ্টম হেনরীকে স্মরণ করুন—

নিশ্চয়ই, স্মরণ তো করছেনই। পিতার আশীর্বাদ নিয়েই তো রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন।

যেতে যেতে উচ্ছ্বসিত জনতায় অভিনন্দন এত উত্তাল হয়ে উঠল এলিজাবেথকে

থেমে যেতে হলো। রাস্তার পাশে নিতান্তই দরিদ্র কয়েকজন রমণী দাঁড়িয়েছিল। তাদের পরনে জীর্ণ, মলিন পোশাক। কিন্তু হাতে কয়েকগুচ্ছ টাটকা ফুল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে তাদের হাত থেকে ফুল নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন এলিজাবেথ।

সাধারণ নগণ্য মানুষের প্রতি এত দয়া রাণীর! কী অপূর্ব আন্তরিক ব্যবহার। মুগ্ধ জনতা আনন্দ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—

রাণী এলিজাবেথের জয় হোক।

ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন—তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

বলা দরকার দেশের সাধারণ প্রজাদের প্রতি এলিজাবেথের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মানবিক। সহানুভূতিপূর্ণ। তাঁর ব্যবহারে যেমন ছিল কোমল মাধুর্য, তেমনি ছিল প্রভুত্বব্যঞ্জক ঔদ্ধত্য। রাজোচিত আভিজাত্যের সঙ্গে ছিল অসাধারণ বাকচাতুর্য। ইংরেজীর মতই ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। আরও অনেকগুলো ভাষা রপ্ত করেছিলেন। বিদেশী দূতরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বলতেন—এখন কাজের কত সুবিধে। ইংরেজ রাণীর সঙ্গে কথা বলতে কোন বেগ পেতে হয় না। বোঝাপড়ায় কোন কষ্ট নেই। এই না হলে রাণী!

শুধু তাই নয়। গ্রীক সাহিত্যে ছিলেন পারদর্শী। ইংরেজী ফরাসী বা লাটিন যাই লিখুন না কেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। সুকণ্ঠী গায়িকা। নৃত্য-পটিয়সী ও চিত্রশিল্পরসিক। যখন কথা বলতেন, মনে হতো কথা বলাও বুঝি শিল্প। কিন্তু—

সবচেয়ে বড় গুণ ছিল পরিস্থিতি বুঝে মুখে এবং ব্যবহারে এক একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা অর্থাৎ সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত নিঁখুত অভিনয়নৈপুণ্য। প্রয়োজনে দুটো মিষ্টি কথা, একটু-আধটু চটুল ব্যবহারে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় এবং আমন্ত্রণের হাত-ছানি। তাই ইংল্যাণ্ড অফ এলিজাবেথের রচয়িতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. এল. রোজি (A. L Rowse) বলেছেন—she was an actress from begining to end…তিনি আরও জানিয়েছেন তাঁর এই, বিস্ময়কর অভিনয়ক্ষমতা, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার, সমস্যাসঙ্কটে তীক্ষ্ণ চাতুর্য অনেক বিপদের দুস্তর সমুদ্র নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এখন থাক সে সব কথা—

অভিষেকের সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা চলেছে।

আবার থামতে হল। সেখানে শহরের মেয়র তাঁর অনুচরদের নিয়ে রাণীকে নাগরিক অভ্যর্থনা দেবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে। অর্কেস্ট্রার মধুর ঐকতান আরও উত্তাল হয়ে উঠল। অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনায় চারদিক কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে এল। মেয়র গম্ভীর কণ্ঠে ল্যাটিন ভাষায় রাণী এলিজাবেথের প্রশস্তি পড়লেন। তাতে বলা হলো—এলিজাবেথের প্রতি নগরবাসীদের আছে অকুণ্ঠ সমর্থন, আছে পরিপূর্ণ আস্থা। স্বাগত এলিজাবেথ…

আবার মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল। থামতেই হল নতুন রাণী এলিজাবেথকে। রাস্তার ওপরেই স্টেজ বেঁধে নাটক দেখানো হচ্ছে। একটার ওপরে একটা করে পর পর তিন থাক মঞ্চ করা হয়েছে। রাণী সবিস্ময়ে দেখলেন। একেবারে নিচের মঞ্চটিতে আছেন সপ্তম হেনরী এবং তাঁর স্ত্রী। আর মাঝখানেরটাতে আছেন অষ্টম হেনরী ও দ্বিতীয় মহিষী অ্যানবলিন। আর একেবারের ওপরেরটিতে অবিকল তাঁর মত মহার্ঘ্য পোশাকের আভরণে রূপসী এক রমণী। তার নিচে ক্যাপশান—কুমারী রাণী এলিজাবেথ।

তাঁকে নিয়ে নাটক করছে। রাণীর মনের ভেতরটা দুলে উঠল। তাঁর বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। আর ঐতিহ্যবাহী টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর পিতামহ হেনরী টিউডর পরে সপ্তম হেনরী এবং তাঁর পিতা অষ্টম হেনরীর ভূমিকায় তাদের নিখুঁত রূপসজ্জা এবং অনবদ্য অভিনয় দেখতে দেখতে তাঁর মনের ভেতরে যেন বাতাসে উড়ে গেল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের অনেক—অনেকগুলো পৃষ্ঠা—উড়ে গেল—উড়ে গেল একেবারে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে—টিউডর যুগের শুরুতে।

অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার পর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে শান্তি আর শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বলা যায় তখুনি টিউডর যুগের শুরু—১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এই যুগের রাজনীতিক, অর্থনীতিক সামাজিক অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধিকে ছাপিয়ে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজদণ্ড, বধ্যভূমি, শানিত কুঠার, ঝলসিত তরবারি, বিলাসব্যসন, আনন্দ, উৎসব, ব্যভিচার, ক্রন্দন, আর্তনাদ, ছিন্নমুণ্ড, রক্তস্রোত। সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর টিউডর নাটকের একেবারে শেষ অঙ্কের নায়িকা—তিনি।

টিউডর বংশের আদিপুরুষ সপ্তম হেনরীর মতই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাঁর পুত্র অষ্টম হেনরী। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত এই নৃপতিই তাঁর জনক। যদিও রাজকুমারী—রাজনন্দিনী। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল নিষ্ঠুর অবহেলা আর অনাদর।

নিতান্ত দীনদরিদ্র ঘরের মেয়ের মতই তাঁর শৈশব কেটেছিল একটা ভয়াল দুঃস্বপ্নের মত।

তাঁর বাবা-মায় কাছে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত প্রজাদের কাছেই তাঁর জন্ম ছিল একেবারেই অবাঞ্ছিত। বাবা প্রায় সারাটা জীবন অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে কাটিয়েছিলেন একটি—একটি মাত্র কামনায়—

পুত্র। একটা ছেলে।

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। শুধু পিতার নয়, ইংল্যাণ্ডের সমস্ত মানুষেরই তখন ছিল একটিমাত্র ঐকান্তিক বাসনা—I pray Jesus and it will be His will, send us a prince—হে প্রভু যীশু রাজার ঘরে একটি ছেলে —একটি রাজকুমার দাও—

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ। তাঁর দুর্ভাগিনী মা অ্যানবলিন সৃষ্টির ব্যথায় কাতর হয়েছিলেন। প্রসূতিঘরের বাইরে অস্থির পায়ে পায়চারি করছিলেন তাঁর বাবা। ভেতরে পুত্র নয়, কন্যাজন্ম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন তিনি। যেই রাজার কাছে খবর গেল, ছেলে নয়—রাজকুমার নয়—কন্যা, তখনি নাকি অষ্টম হেনরী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে বলেছিলেন—হা ঈশ্বর, কন্যা তো আমি চাইনি—

পুত্রের জন্ম দিতে পারেননি। পারেননি তাঁকে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকারী দিতে, সেই অপরাধে তাঁর মাকে পরিত্যাগ করলেন অষ্টম হেনরী। বিবাহবিচ্ছেদ করলেন। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে বন্দী করলেন লণ্ডন টাওয়ারে। একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এবং নামমাত্র বিচারের প্রহসন করে দিয়ে দিলেন মৃত্যুদণ্ড! তিনি শুনেছিলেন তাঁর দুর্ভাগিনী মা না কি স্বামীর কাছে প্রাণ ভিক্ষার করুণ আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন—পুত্রের জন্ম দিতে না পারায় তাঁর তো অপরাধ নেই। জন্মের ওপরে তো কারো হাত নেই—

কোন লাভ হল না। নিষ্ঠুর আর হিংস্র প্রকৃতির পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। ঘাতকের খড়্গের আঘাতে মায়ের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি জানতে পারলেন না তাঁর কি অপরাধ।

পুত্রের জন্ম দিতে না পারার জন্য পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে যুগে যুগে সেই জননীর মর্যাদা কমে গিয়েছে, হয়তো বা কিছুটা অবাঞ্ছিতও হয়েছে কিন্তু তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নজির আছে বলে জানা যায় না—

তাঁর তখন মাত্র তিন বছর বয়স। তার অনেক অনেক আগে তাঁর তিন

ম্যাসের কোঠায় বয়সটা পৌঁছতে না পৌঁছতে পাপিষ্ঠা মা অ্যানবলিনের সংস্পর্শ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হ্যাটফিল্ডে। সে বাড়ির গভর্নেস পরিচারিকাদের মুখে মাঝে মাঝে চাপা গুঞ্জন শুনতো—অ্যানবলিন হত্যা—অ্যানবলিনের মৃত্যু···কথাগুলো তাঁর বোধরাজ্যের ঘন কুয়াশার ভেতরে একটা চাপা ভয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে আবার মিলিয়ে যেত।

ছেলে—ছেলে! একটি পুত্র—ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য বাবা যেন উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মাকে বিয়ে করার আগে স্পেনের রাজকুমারী তাঁর দাদার বিধবা স্ত্রী ক্যাথারিনকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ক্যাথারিনের গর্ভেও জন্ম হয়েছিল একটি কন্যার—মেরী অবাঞ্ছিত কন্যার জন্ম দেওয়ার অপরাধে তাঁকেও পরিত্যাগ করেছিলেন বাবা। তারপরেও সেই পুত্রলাভের দুর্মর বাসনায় আরও চারবার বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁর চার মা সেই চার স্ত্রী—

জেন সেমুর।

অ্যান অফ ক্লীভস।

ক্যাথারিন হাওয়ার্ড।

ক্যাথরিন পার।

এঁদের ভেতরে ভাগ্যবতী হলো জেন সেমুর। তিনিই অষ্টম হেনরীকে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হলো—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে। নাম হলো এডোয়ার্ড। বাবা খুশিতে গদগদ হয়ে তাঁর দুই অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যা সন্তান—তিনি এবং তাঁর দিদি মেরীকেও সাদরে বুকে টেনে নিলেন। দুই বোন। এক ভাই। খুন জখম মৃত্যু আর হত্যার বিভীষিকায় আড়ষ্ট আর রুদ্ধশ্বাস তাদের সেই সংসারে সেই প্রথম আনন্দের জোয়ার এল। কিন্তু—

তিনি বাবার তালে তাল দিয়ে উল্লাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেন না। এমন কি তিনি যে দারুণ স্ফূর্তির দমকে উইল পর্যন্ত করে ফেললেন যাতে প্রথমে এডোয়ার্ড তারপর মেরী এবং মেরীর পরে তাঁকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে গেলেন—তাতেও খুশি হতে পারলেন না তিনি।

আমোদ আহ্লাদ, আনন্দ উল্লাসের জন্য যে অনুভূতি এবং মানসিকতার প্রয়োজন—সেসব একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল সেই সুদূর শৈশবে-ই। আর হবে নাই বা কেন?

বাবা দিনে দিনে কেমন উচ্ছৃঙ্খল আর নৃশংস হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী—অ্যান ক্লীভসকে শুধু দেখতে কুৎসিত বলেই পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রাণ·

দণ্ড দিয়েছিলেন ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকে।

তারপরে অনেক—অনেকগুলো রাত্রি ঘুমোতে পারেননি তিনি। ঘাতকের খড়্গের আঘাতে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে অ্যান ক্লীভসের সেই করুণ মর্মান্তিক আর্তনাদ যেন তাঁর কানে বাজতো। আর কেমন অসাড় হয়ে যেত তাঁর স্নায়ুগুলো। কেমন একটা চাপা ভয় আর বিভীষিকার রাজত্বে কেটেছে তাঁর বাল্যকাল।

শুধু কি তাই? রাজকুমারী হয়েও তাঁর দিন কেটেছে গরীব দুঃখীর মত। একটার বেশি দুটো জামা ছিল না। বেশ স্পষ্ট মনে আছে হ্যাটফিল্ডে তাঁর গভর্নেস লেডী ব্রায়াণ রাজার কাছে করুণ আবেদন জানিয়ে চিঠিতে লিখতেন—

মহারাজ, আপনার কন্যার পোশাকপরিচ্ছদ বড় কম। তার একটা গাউন নেই, কোর্তা নেই, রুমাল নেই। রাজকন্যার পরার মত পোশাক নেই বললেই হয়।

মহারাজ! মাতৃহীন এই মেয়েটির প্রতি আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি দেবেন। আপনাকে আরও জানাচ্ছি হ্যাটফিল্ডের প্যালেসের প্রবীণ এক কর্মচারী সেলটন আপনার চার বছরের কন্যাকে জোরজবরদস্তি করে বেয়ারা বাটলার বাবুর্চির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতে বাধ্য করায়। সেসব গুরুপাক খাদ্য খেয়ে মেয়েটি প্রায়ই অসুখে ভোগে।

মান্যবর আপনার কাছে সবিনয়ে ভিক্ষা করছি—রাজকুমারী একটু মাংস আর দু একটা তরকারি যেন তাঁর ঘরে বসে খেতে পারেন।

আরো কত দুঃখ সংঘাত, কত সর্বনাশা এবং ভয়াবহ চক্রান্ত কত বাধা পাড়ি দিয়ে তিনি—

জয় এলিজাবেথের জয়—

জয়ধ্বনি শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন এলিজাবেথ। আর একটানা সেই দুঃখের অন্ধকার থেকে অবারিত এই আলোর রাজ্যে নিয়ে এসে তাঁকে ইংল্যাণ্ডের অধীশ্বরী করার জন্য বারে বারে পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

হাসি হাসি মুখে সিটি রেকর্ডার এগিয়ে এলেন। লাল ভেলভেটে মোড়া একটা তোড়ায় হাজারটি মোহর দিলেন রাণীকে। তিনি হেসে বললেন যতদিন রাণীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবো ততদিন আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে আপনাদের রক্ষা করবো—সকলকে নিরাপদে রাখবো—ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন···

প্রজাদের মনে হলো, কথা নয় যেন গান শুনছে। আশ্চর্য মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ

তাদের নতুন রাণীর।

শোভাযাত্রা আবার চলতে শুরু করল। বেলা বাড়ে। ভীড় আরও বাড়ে। ভীড় আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। কিছুদূরে যেতেই দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে একটা সুদৃশ্য মঞ্চ। মঞ্চের ওপরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার একটা গুহা। সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছেন স্বয়ং 'মহাকাল'। তাঁর সামনে কন্যা 'সত্য'। তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী বাইবেল।

'সত্য' বাইবেলটি এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে দিলেন। তীব্র আবেগে উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা দুটো হাত বাড়িয়ে বাইবেলখানা নিয়ে সজোরে বুকের ভেতরে চেপে ধরলেন। তাকে বারে বারে চুম্বন করে গভীর ভরাট কণ্ঠে বললেন—এই বাইবেল স্পর্শ করে প্রভু যীশুর পবিত্র নাম নিয়ে আপনাদের কাছে শপথ করছি আমি সবচেয়ে আগে দেখবো দেশের স্বার্থ, দেশের সমৃদ্ধি—আপনাদের এই অভিনন্দনের জন্য আমি আমার অন্তর থেকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি—

জয়—এলিজাবেথের জয়! হাজারো কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত জনতার উল্লসিত অভিনন্দন আর বিপুল সম্মানের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কুমারী রাণী এলিজাবেথ এগিয়ে চললেন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির দিকে। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। এ তিনি কি করলেন। উত্তেজনা আর আবেগের বশে করে বসলেন কত বড় কঠিন শপথ—সবচেয়ে আগে দেখবেন দেশের স্বার্থ? কিন্তু—

তাঁর পঁচিশ বছরের এই উদ্দাম যৌবন—এই অটুট স্বাস্থ্য, এই রূপ—এসব কি কখনোই বিয়ে স্বামীর ভালবাসা এবং মাতৃত্বের, আশীর্বাদে মুকুলিত হবে না?

বিয়ে!

বিয়ে মানেই তো অধীনতা। স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর ইচ্ছেমত চলা। কি হয়েছিল তাঁর দিদি, অষ্টম হেনরীর বড় মেয়ে মেরীর?

পিতার মৃত্যুর (১৫৪৭ খ্রী) পরে সিংহাসনে বসেছিল স্বল্পায়ু এডওয়ার্ড। এডওয়ার্ডের পরে ইংল্যাণ্ডের রাণী হয়েছিল মেরী। সিংহাসনে বসেই স্পেনের রাজা ফিলিপকে বিয়ে করেছিল। এই বিয়ের পিছনে যে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে—অভিভাবকহীন ইংল্যাণ্ডকে গ্রাস করা এবং ইংল্যাণ্ডে সে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা—এসব একবারও তলিয়ে ভাবল না মেরী। ফলে যা অনিবার্য তাই হলো—স্বামীর প্ররোচনায় এবং তাঁর একটু ভালবাসা পাওয়ার আশায় ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে স্পেনের সহায়তায় নিযুক্ত করল প্রজাদের

অসতে। এল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। হাতছাড়া হয়ে গেল ক্যালে বন্দর। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ।

শুধু কি তাই? ফিলিপ এবং মেরী, দুজনেই ছিল কট্টর ক্যাথলিক। ক্ষমতা হাতে পেয়েই যারা দেশে থেকে পোপের আধিপত্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে যারা তাঁর মা ক্যাথরিনের সঙ্গে হেনরীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাঁকে সর্বনাশের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল—সেই প্রোটেস্টাণ্টদের ওপর নিদারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিল মেরী। পোপকে তাঁর পুরনো মহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে এল। রোজার হুপার, ফ্রেজার ল্যাটিমার এবং রিডলীর মত বিদগ্ধ মনীষী প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিশপদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করল। মেরীর বিরুদ্ধে মানুষের মন ঘৃণায় বিদ্বেষে ভরে উঠল। তারা তার নামকরণ করল—'রক্তপিপাসু মেরী'। দেশের দিকে দিকে মেরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। সেই বিদ্রোহে তাঁর হাত আছে বলে মেরীর সন্দেহ হলো। তাঁকে ছোটবেলা থেকেই সহ্য করতে পারতো না মেরী। হিংসেয় জ্বলতো। অতএব লণ্ডন টাওয়ারে তাঁকে কড়া পাহারায় বন্দী করে রাখল। এক মনে ভাবতে লাগল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় কি না। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। প্রাণদণ্ড দিলে দেশ খেপে উঠবে। তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে শুরু করল পার্লামেণ্ট থেকে প্রস্তাব পাস করাতে যাতে তার পরে তিনি কিছুতেই সিংহাসনে বসতে না পারেন। কিন্তু—কে বসবে?

তার তো পুত্র কি কন্যা—কোন সন্তানই হয় নি। শুধু বার কয়েক নিজেকে সন্তানসম্ভবা বলে ঘোষণা করে শুধু হাস্যাস্পদ হয়েছে লোকের কাছে। ক্ষোভে দুঃখে ফিলিপ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে স্পেনে। ফিলিপ তো তাকে মা হওয়ার কোন সুযোগই দিল না। দুঃখে হতাশায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। রাজ্যকে ভুল পথে চালনা করে দেশের সর্বনাশ করে বুকভরা অতৃপ্তি আর ক্ষোভ নিয়ে মেরী পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। রেখে গেল তার রাজত্বের সাতটি বছরের শুধু তিক্ততা আর হতাশার ইতিহাস।

মেরীর ভুল—তাঁর শিক্ষা।

মেরীর জীবনের ইতিহাস—তাঁর কাছে এক অমূল্য গ্রন্থ। মেরী যে ভুল করেছে তা তিনি করবেন না। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় 'সত্য' হচ্ছে—দেশ—দেশের স্বার্থ দেশের সমৃদ্ধি—প্রয়োজন হলে নারীজীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বাসনা আহুতি দিয়ে জন্মভূমির মঙ্গল করবেন।

"আমাদের রাণী বিদুষী। জ্ঞানী।" একটি যুবক সেই শোভাযাত্রার ভেতর

থেকেই একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করল—"জ্ঞান, নীতি ও মহৎ আদর্শে, মানবিকতায় তিনি দার্শনিক প্লেটোর সঙ্গেই তুলনীয়…"

এসব বলবেন না—আমি সামান্য রমণী। তাঁর বুকের ভেতরে তীব্র আবেগের ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল। অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে ডুবে যেতে যেতে কোন রকমে অস্ফুটস্বরে বললেন—আমি—আমি আপনাদের ভালবাসবো—আপনাদের ভালো করবো —নিশ্চিন্ত থাকুন—

অভিষেক হয়ে গেল।

জনসাধারণের উল্লসিত অভিনন্দন আর অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে রাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসলেন। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো রাজদণ্ড আর রাজচক্র।

কুমারী রাণী এলিজাবেথ।

বয়স মাত্র পঁচিশ বছর চার মাস। তাঁর সামনে সমস্যা-সঙ্কটের উত্তাল সমুদ্র। একদিকে ধর্ম আন্দোলন আর একদিকে যুক্তিবোধ, মানবতাবাদ, এগিয়ে চলার দুরন্ত আবেগ। তার ওপরে ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে স্পেনকে সাহায্য করতে গিয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সব মিলিয়ে তখন মানুষের সামনে দুঃসহ অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কা ছাড়া কিছুই ছিল না।

কিন্তু নূতন রাণী বয়সে নবীনা উচ্চাভিলাষী। প্রখর বুদ্ধিমতী। তাই প্রজারা অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাও করতে লাগল। এমনি এক দুঃখ-বেদনা আশা-আনন্দের প্রত্যুষ আলোকে শুরু হয়েছিল এলিজাবেথের রাজত্বকাল।

যাঁরা প্রগতিশীল অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যান্টরা স্বস্তি পেল, সাহস পেল। ক্যাথলিকরা আশঙ্কিত হলো। কিন্তু রাণী কারো সম্বন্ধে যেমন বিরূপভাব প্রকাশ করলেন না, তেমনি কাছেও টানলেন না। তাঁর প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হলেন উইলিয়ম সেসিল (লর্ড ব্যালে)। ইনি ইংল্যাণ্ডে বস্তুবাদের জন্মদাতা ফান্সিস বেকনের পিতা। সেসিল ছিলেন অসাধারণ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। এলিজাবেথ বহু বিপদ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁর সাহায্যে। আর এই সেসিলেরই ভায়রাভাই নিকোলাস বেকনও আর এক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশের প্রতিটি মানুষ এলিজাবেথের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু—

না। চট করে কিছু বলা বা হুট করে কোন কাজ তিনি কখনো করতেন না। সামান্য অতি তুচ্ছ সমস্যা সমাধানেও তিনি অনেক সময় নিতেন, অনেক চিন্তা করে, অনেক আলাপ আলোচনা করে প্রতিটি কথা ওজন করে বলতেন।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি বৃদ্ধের বিচক্ষণতা অর্জন করেছিলেন। আশৈশব

তিনি যে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার ভেতরে বাস করেছিলেন তা তাঁকে প্রতিটি কাজে সতর্ক করে তুলেছিল।

১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। জানুয়ারী।

এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন বসল। আর সেই প্রথম অধিবেশনেই প্রশ্ন উঠল—রাণীর বিয়ের প্রশ্ন।

বলা দরকার তখনকার ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল কুমারী রাণী বিয়ে করবেন। তাঁর পুত্র হবে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু কে—কোন ভাগ্যবান ভাবী রাজার জন্মদান করবেন, কাকে এলিজাবেথ বিয়ে করবেন—সেটাই ছিল তখন ইংল্যাণ্ডের জ্বলন্ত সমস্যা।

এলিজাবেথ দীর্ঘাঙ্গী, দোহারা, সুঠাম ঋজু চেহারায় সুদৃঢ় আত্মমর্যাদা সুস্পষ্ট। লালচে সোনালী চুলে, পাকা অলিভের মত গায়ের রঙে তাঁর অপর্যাপ্ত যৌবন-সম্ভার যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সবচাইতে বেশি করে নজরে পড়তো তাঁর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো বড় বড় চোখ। আর অতি কোমল অপূর্ব লাবণ্য মাখানো দুটো চম্পাকলির মত কমনীয় হাত। ভবিষ্যতে দেখা গিয়েছে এলিজাবেথ যখন কোন মন্ত্রী কি কোন বিদেশী দূতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন তখন তিনি তাঁর সুন্দর হাত দুখানা নাড়াতেন। হাতের সৌন্দর্য মেলে ধরতেন।

এই এলিজাবেথ! রূপসী। থর যৌবনবতী। তাঁর মত তরুণীর পাত্র জুটবে না—তা হতে পারে না। তাঁকে বিয়ে করার জন্য ইউরোপের দেশদেশান্তরের রাজা রাজকুমাররা ভিড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল। কিন্তু—

বিয়ে হয়নি। চিরকুমারী রাণী এলিজাবেথ ছিলেন চিররহস্যময়ী। বিয়ের প্রশ্নে পার্লামেন্টের সভায় রাণী উত্তর দিতে উঠলেন। দীর্ঘ সুঠাম দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর ছাব্বিশ বছরের যৌবন জেগে রয়েছে প্রখর হয়ে। সেই সঙ্গে তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে মধুর আমায়িক হাসির প্রলেপ।

স্তব্ধ পার্লামেণ্ট ভবন।

হাউস অফ লর্ডস, হাউস অফ কমন্সের সভ্যরা প্রত্যেকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছেন রাণীর দিকে। কি বলবেন—কি বলতে পারেন তাঁদের রাণী—রহস্যময়ী এই সুন্দরী যুবতী!

"মহোদয়গণ! আমি জীবনের একটা পুরো শতাব্দীর সিকি ভাগই কুমারী থেকে সুখেই কাটিয়েছি" শান্ত বিনম্র কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে এলিজাবেথ বললেন, "আর এটাই বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আজীবন কুমারী হয়ে থাকাটাই হয়তো

আমার ভবিতব্য।"

আশ্চর্য! বিস্ময়ের কুয়াশায় ছটফট করে পার্লামেণ্ট সদস্যদের চোখ দুটো— কত সহজে কী অসম্ভব কথা বললেন রাণী! তাঁর কখনো বিয়ে হবে না? যাবজ্জীবন অনূঢ়া হয়ে থাকবেন—এরকম কখনো হয়, না হয়েছে? কিন্তু—

তাই হলো। বিয়ের ব্যাপারে এলিজাবেথের আশৈশব অভ্যস্ত সতর্কতা অক্ষুণ্ণ রইল। দেশ দেশান্তরের কত রাজা রাজপুত্র এবং কোন কোন দেশের রাজদূত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। এলিজাবেথ মধুর আমায়িক হাসি হেসে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন যে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটিতে কাউকেই হতাশ যেমন করলেন না, তেমনি ভরসাও দিলেন না।

কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় নির্জন প্রাসাদে কোন অবসরে এলিজাবেথ গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকেন। বিদেশী রাজকুমার কি রাজারা যতই ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে আসুক না—তিনি কিন্তু এতটুকু টলবেন না—কখনো নিজের মনটাকে মেলে ধরবেন না তাঁদের কারো কাছে। কারণ, তিনি জানেন— তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানেন না তাঁদের প্রসারিত দুটো বাহুতে কিন্তু সৌহার্দ্য নেই, নেই প্রেম ভালবাসার ছিটেফোঁটাও। আছে তাঁদের হীন স্বার্থ, আছে শুধু রাজনীতির কারবারী মারপ্যাচ! মেরী টিউডর নিজের সুখের জন্য যে ফাঁদে পা দিয়ে দেশকে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেও মরেছিল সেই ফাঁদে পা তিনি দিতে রাজী নন—তিনি এলিজাবেথ—অষ্টম হেনরীর মেয়ে।

তাই বলে কি তাঁর পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবেন? পাগল না কি! সেই ভুল তিনি কি কখনো করেন—করতে পারেন! ইংল্যাণ্ডকে নিরাপদ এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁদের কাউকেই ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। চলবে না চটিয়ে দেওয়া। মিষ্টি ব্যবহার করে তাঁদের খুশি রাখবেন তিনি। খুশি রাখবেন অভিনয় —নিখুঁত অভিনয় করে। আর হ্যাঁ—সেই অভিনয়ের মূল নায়িকা হবে তাঁর এই কুমারী জীবন, তাঁর অপর্যাপ্ত যৌবন। আর সেই নাটকের সফল নায়িকা হয়েই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে যাবেন—অসহ্য আর তীব্র একটা অস্থিরতায় তাঁর সেই চাঁপা-কলি আঙুল দিয়ে আর একটা হাত এত জোরে চেপে ধরেন যে তালুতে নখের দাগ বসে যায়।

অবিবাহিত রাজকুমারী।

রূপবতী তরুণী। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্বের লোভে লোভে এলিজাবেথের বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছিল তাঁর সুদূর শৈশব থেকেই। তখন অষ্টম হেনরী জীবিত। এলিজাবেথের বয়স

মাত্র দুই বছর। ফ্রান্সের সঙ্গে এক সন্ধির সর্তে ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ের প্রস্তাব উদযাপন করেছিলেন হেনরী।

আবার ডেনমার্কের অধিপতি তাঁর তৃতীয় পুত্র। খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ের বাসনা জানালেন। কিন্তু বিদ্যুৎচমকের মত এলিজাবেথের মনে হলো—বিয়ে হলেই সিংহাসনের ওপরে তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে। খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানালেন।

আশ্চর্য! তখন এলিজাবেথ নিতান্তই বালিকা। সেই বয়সেই প্রখর দূরদর্শিতায় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি একেবারে একা একটি রমণীর একক প্রচেষ্টায় সহস্র সমস্যায় দীর্ণবিদীর্ণ ইংল্যাণ্ড কত বিপদের উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। আর তাঁর শাসনকালেই সৃষ্টি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ! কিন্তু এখন সেসব কথা থাক—

এলিজাবেথকে কোন দূর বিদেশে বিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিমঞ্চ থেকে তাকে নির্বাসিত করার অনেক চক্রান্তই করেছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

ইংল্যাণ্ডের নৃপতি মেরী টিউডরের কুটিল হিংসা আর ক্রোধের আগুন এলিজাবেথ ঘিরে সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছে। লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী হয়ে আছেন এলিজাবেথ। কখন মেরী তাঁর প্রাণদণ্ড দেবেন আর ঘাতকের খড়্গের আঘাতে তাঁর মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে—সেই আশঙ্কায় তাঁর দিন কাটছে। সেই দুঃসময়ে এল তাঁর মুক্তির ইঙ্গিত বহন করে এক লোভনীয় প্রস্তাব—ফ্রান্সের সাবয় রাজ্যের ডিউককে বিয়ে করতে রাজী হলেই তিনি মুক্তি পাবেন।

মুক্তি! শ্বাসরোধী এই কারাগারের অন্ধকার থেকে মুক্তি! পৃথিবীর অবারিত আলো বাতাস—আঃ। কিন্তু বিয়ে? বিয়ে হয়ে গেলেই তো কনে সেজে চলে যেতে হবে সেই সাবয়ে। আর একটু একটু করে তিনি এবং তাঁর অস্তিত্বই মুছে যাবে দেশবাসীর মন থেকে।

তাছাড়া তিনি জানেন—ভালো করেই জানেন সাবয়ে ডিউক তাঁর ভগ্নীপতি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুগত। ডিউককে অনায়াসেই প্রভাবিত করে ইংল্যাণ্ডের ওপরে প্রভুত্ব করার চক্রান্ত করে তাঁর মুক্তির টোপ গেঁথে তাঁর এই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে ওই ফিলিপ—আর কেউ নয়। অতএব—

এলিজাবেথের সেই বিনীত এবং দৃঢ় উত্তর—আমি বিয়েই করবো না—

এলিজাবেথের পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন আরো অনেক—অনেক উচ্চাভিলাষী রাজকুমার। এসেছিলেন সুইডেনের প্রিন্স এরিখ, এসেছিলেন অষ্ট্রিয়ার দুই

রাজপুত্র চার্লস এবং ফার্ডিনাণ্ড। এসেছিলেন আরও দুইজন উচ্চাভিলাষী পাত্র—একজন আর্ল অফ আরুণ্ডল, আর একজন—চার্লস পিকারিঙ।

এইসব পাণিপ্রার্থীরা রাণীকে এবং তাঁর সভাসদদের মহার্ঘ্য উপহারসামগ্রী দিলেন। রাণীকে খুশি করার জন্য যা যা করার সবই করলেন। এলিজাবেথও সন্তুষ্ট হলেন বৈকি—খুবই আপ্লুত হলেন। তৃপ্তির হাসিতে তাঁর সুডৌল ধারালো মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নানা প্রসঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথার জাল বুনে তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটার বেলায় 'দেখি তো ভেবে, পরে দেখবোক্ষণ' ইত্যাদি ভাসা ভাসা কথা বলে নিজেকে কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট করে রাখলেন। রাজপুত্ররা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে যে যার দেশে ফিরে গেলেন।

কিন্তু এলিজাবেথের নিস্তার নেই।

জনসাধারণ বারে বারে দাবি জানাচ্ছে রাণী বিয়ে করুন। সন্তান হোক—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আসুক। থেকে থেকেই পার্লামেন্টেও তাঁর বিয়ের প্রশ্ন উঠছে। কারো কারো মনে আবার ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল একটা সন্দেহ—কোথাও কোন অপঘটনের নায়িকা হয়ে যাননি তো রাণী! কে জানে বাবা—রাজরাজড়ার অন্দরমহলের লীলাখেলা কাকপক্ষীও জানতে পারে না।

ফারিয়া এল।

স্পেনের রাজদূত ফারিয়া। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের এলিজাবেথকে বিয়ে করার প্রস্তাব বহন করে এল।

ও মা! আপনি বলছেন কি? জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আওয়াজ তুলে খিলখিল করে হেসে এলিজাবেথ বললেন, আমার অমন দুঁদে ডাকসাইটে বাবা তাঁর দাদার বৌকে বিয়ে করে কী নাকালটাই না হয়েছিলেন। আমি আবার কি না বোনের স্বামীকে বিয়ে করে মরি আর কি। একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত কা ভেবে আবার আস্তে আস্তে বললেন, তাছাড়া আপনাদের রাজা তো নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক। তাঁর চোখে তো আমি বিধর্মী। ম্লেচ্ছ। তিনি কি আমাকে সত্যিই বিয়ে করবেন? তাঁর শেষের দিকের কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনালো।

ফারিয়া কেমন ভ্যাবলার মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাণীর মুখের দিকে। তার মনে হল রাণী বুঝি তাদের রাজাকে বিয়ে করার জন্য খুব ব্যগ্র। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, হার হাইনেস আপনি জানেন না—আমাদের রাজাও আপনাকে বিয়ে করার জন্য কী রকম আকুলিবিকুলি করছেন। ধর্মোটর্মোর কথা তিনি মোটেও ভাবছেনই না, একটু থেমে এলিজাবেথের কাছে ঝুঁকে পড়ে

আবার উল্লসিত হয়ে বলল সে, তাহলে জানিয়ে দিই আমাদের রাজাকে আপনি সম্মতি দিয়েছেন—

এবার এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না। গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলেন। ইংল্যাণ্ডের ওপরে প্রভুত্ব করার এবং সেই সঙ্গে তাঁর ওপরেও লোভ ফিলিপের বহুদিনের। মেরী বেঁচে থাকতেই তার কাছে ঘুর ঘুর করতো সে। কিন্তু সরাসরি মুখের ওপরে 'না' বলে দিয়ে লোকটাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে ফ্রান্সের ভয়ে নিশিদিন কুঁকড়ে থাকতে হবে না। পোপ খুশি থাকবেন—ক্যাথলিকরাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা নেদারল্যাণ্ডসের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের আর্থিক সমৃদ্ধি। স্পেন থেকেই যেতে হয় নেদারল্যাণ্ডসে। যেতে হয় আবার যে জলপথ পাড়ি দিয়ে সেটা হলো ইংলিশ চ্যানেল—ইংল্যাণ্ডের খিড়কির পুকুর। অতএব ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্পেনেরও বন্ধুত্ব কাম্য। অতএব--

অতএব তাঁর কুমারী জীবনের লোভের টোপ ঝুলিয়ে রেখে ফিলিপকে শান্ত রাখতে হবে এবং সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে—দেশের স্বার্থে রাজনীতির স্বার্থেই ফিলিপের সঙ্গে বন্ধুত্ব অপরিহার্য—

হার একসেলেন্সী এত ভাবছেন কেন? মৃদুকণ্ঠে ফারিয়া বলল, আমাদের রাজাও আপনাকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আর আপনিও—এলিজাবেথের চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ফারিয়া। অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, তাহলে এত চিন্তা করছেন কিসের?

না। চিন্তা আর কিসের? মিষ্টি হেসে বিনম্র কণ্ঠে শুধু বললেন, পার্লামেণ্টে একবার বিয়ের কথাটা তুলতে হবে—

ফারিয়া খুশি হয়ে চলে গেল। ফিলিপেরও বুকের ভেতরে উল্লাসের গুরগুরানি বেজে যেতে লাগল।

কিছুদিন পরেই প্রায় নাচতে নাচতে চলে এল ফারিয়া। কিন্তু তার হাস্য-প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিষণ্ণতার ছায়া থমথম করতে লাগল তাঁর মুখে। ফারিয়ার উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বললেন, পার্লামেণ্টে এখনো তো উত্থাপন করাই হয়নি—কেমন শুকনো আর কাঠ কাঠ শোনালো তাঁর গলার স্বর।

মাসখানেক পরে আবার আশায় বুক বেঁধে ফারিয়া এল। রাণী যথারীতি হেসে হেসে তাকে আপ্যায়ন করলেন। ফিলিপের কুশল নিলেন—নিলেন স্পেনের হালচালের খোঁজখবর। সাতসতের ধানাইপানাই অনেক কথাই বললেন। কিন্তু

বললেন না স্পষ্ট করে শুধু সেই আসল কথাটা।

ফারিয়া বিরক্ত হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল। রাজাকে বলল, মেয়েছেলেটা আস্ত শয়তান হুজুর—হয়তো অন্য কাউকে বিয়ে করবে বলে ঘাপটি মেরে আছে—

জ্বলে উঠলেন স্পেনের নৃপতি। ক্ষোভে দুঃখে ফ্রান্সের রাজকুমারীকে বিয়ে করে বসলেন। কিন্তু এই বিয়ের পরেও ফারিয়া এসেছিল আবার এলিজাবেথের রাজসভায়। বেশ মুরুব্বীর মত বলল, কী, ভুল করলেন তো—আমাদের রাজাকে বিয়ে করলে আপনার—

আমি কি কখনো বলেছিলাম তাঁকে বিয়েই করবো না, কপট একটা দুঃখের ভান করে করুণ কণ্ঠে এলিজাবেথ বললেন, ফিলিপ যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসতেন তাহলে তিনি অন্তত তিন চার মাস আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন।

রাণী না হয়ে থিয়েটারে নাম লেখালেই তো পারতেন। একটা মেয়েছেলের কী কুটিল বুদ্ধি রে বাবা এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল ফারিয়া। মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না।

দূরে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ফারিয়ার অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথের মনটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল। তাঁর বুক ঠেলে ঠেলে উঠল কান্নার ঢেউ। কেউ জানে না। কখনো জানবে না—জানতে পারবে না—বিয়ে বর ঘর সন্তান কথাগুলো মনে হলেই কতগুলো ভয়ঙ্কর আর বীভৎস দুঃস্মৃতি বিষধর সাপের মত তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় তাঁর চেতনা আড়ষ্ট হয়ে আসে, অবশ হয়ে যায় তার সারা শরীর। আর তাঁর দেহটা যেন শবদেহের মতই ভারী আর অনড় হয়ে একটু একটু করে একটা গভীর খাদের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। আর দূরে—বহুদূরে ঝাপসা আর অস্পষ্ট ছবির মত দেখা যায় এক সৌম্যকান্তি দীর্ঘদেহী পুরুষ …প্রেম ভালবাসা—হ্যাঁ সেই সুদূর কৈশোরেই প্রেমের আলো জ্বলে উঠেছিল তার ঘাটে ঘাটে ঘা-খাওয়া জীবনে। কিন্তু সেই ভালবাসা সেই প্রেমের কী অসহ্য দাহ। সেই—সেই দুঃস্মৃতির পীড়নে একটা বিষাক্ত যন্ত্রণায় আজও তিনি—আজও জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কিসের সেই দুঃস্মৃতি?

এমন কী ঘটেছিল যা তিনি বিপুল বৈভব এবং সম্মান প্রতিপত্তির ভেতরে থেকেও ভুলতে পারছেন না যার দুঃসহ গ্লানি তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে?

॥ ষোল ॥

রাণী এলিজাবেথ।

পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিস্ময়। বিদগ্ধ ফরাসী লেখিকা কিল্লিগ্র (Killigrew) বলেছেন রাণী এলিজাবেথ রূপকথার সেই ফোয়েনিক্স পাখি যে চিতার আগুনে দগ্ধ হয়েও তার সেই ভস্মাবশেষের ভেতর থেকে আবার জীবন ফিরে পেয়ে অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে জেগে ওঠে—Queen Elizabeth as the phoenix of the world...

অবিবাহিত একটি তরুণীর ভেতরে আশ্চর্য চরিত্র স্বতন্ত্র্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর দূরদর্শিতার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। আর সেই কারণে তিনি যে বিপুল প্রশংসা, শ্রদ্ধা আর অকুণ্ঠ প্রশস্তি পেয়েছিলেন তা তাঁর যুগের সীমানা ডিঙিয়ে তিন-তিনটি শতাব্দীর ওপারে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। আজও আধুনিক ইংল্যাণ্ডের জনজীবনে এলিজাবেথের বিপুল প্রভাব টেমস নদীর স্রোতের মতই বহমান কিন্তু—

কি ছিল এলিজাবেথের ভেতরে ?

অসাধারণ চাতুর্য, অতি সূক্ষ্ম রুচিবোধ, বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ইত্যাদি যত গুণই থাক, তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ কিন্তু ছিল—অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য। অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয়কলায় তাঁর দক্ষতা ছিল সহজাত। কোন সময় কোন অবস্থাতেই তাঁর মনের গভীরের ভাবনাচিন্তাটা কেউ জানতে পারতো না। পরিস্থিতি বুঝে এক একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো তাঁর মুখে। লোকে সেটাকেই সত্যি বলে ভাবতো। পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর এই আশ্চর্য গুণের জন্যই তিনি যেমন তাঁর মন্ত্রী সভাসদ এবং জনসাধারণের মন জয় করেছিলেন তেমনি বৈদেশিক দূত এবং বিদেশী নৃপতিদের মনেও দেবীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা যুগের সৃষ্টি করেছিলেন যে সেই এলিজাবেথীয় যুগের (স্বর্ণযুগ) দূরপ্রসারী প্রভাব আজও ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে অব্যাহত।

এলিজাবেথ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি বিরূপ। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা রোমের পোপ—চতুর্থ পল তাঁর মার সঙ্গে অ্যানবলিনের বিয়েটা বৈধ বলে স্বীকার করেনি। আর তাঁকেও বস্টার্ড বা জারজ সন্তান বলতে দ্বিধা করেনি।

গোঁড়া ক্যাথলিক তাঁর দিদি মেরি টিউডরও ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁর অধিকারকে কথনো স্বীকার করতেন না।

সেই মেরী টিউডরেরই রাজত্ব চলছে তখন ইংল্যাণ্ডে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এলিজাবেথের দিন কাটছে। সেই সময় একদিন তিনি মেরীকে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে নিভু নিভু গলায় বললেন, দিদি, কয়েকদিনের জন্য অ্যাসিরিজে বেড়াতে যাবো—

যে চুলোয় খুশি যাও না, রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন মেরী।

মাথা নিচু করে চলে গেলেন এলিজাবেথ। রওনা হয়ে গেলেন অ্যাসিরিজের উদ্দেশ্যে। মাইল দশেক গিয়ে দিদিকে দিলেন একটা চিঠি—দিদি আসার সময় তাড়াহুড়োতে ক্যাথলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সেই বিশেষ পোশাকটা ফেলে এসেছি। তুমি যদি কাউকে দিয়ে দয়া করে পাঠিয়ে দাও—

চিঠিটা দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেরী। চরম তাচ্ছিল্যে মুখখানা বাঁকালেন।

স্রেফ তাকে তোষামোদ। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন এসব—সব তার অতি ধূর্ত বোনটার সাজানো অভিনয়।

এলিজাবেথ কিন্তু জানতেন তাঁর বিরুদ্ধে পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিকদের চক্রান্ত ঘনীভূত হচ্ছে। পোপের একান্ত বাসনা ছিল মেরী টিউডরের পরে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবে স্কটল্যাণ্ডের মেরী স্টুয়ার্ট। মেরী স্টুয়ার্ট গোঁড়া ক্যাথলিক। আর সপ্তম হেনরীর দৌহিত্র পঞ্চম জেমস এবং ফ্রান্সের মেরী গাইজের কন্যা তিনি। অষ্টম হেনরীর উইল অনুযায়ী মেরী স্টুয়ার্টও সিংহাসনের এক দাবিদার। তাই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে মেরী স্টুয়ার্টকে বসানোর ষড়যন্ত্র চলছে—সব—সবই তিনি জানতেন।

হোক। কিন্তু—না ক্রোধ বা প্রতিহিংসা নয়, এলিজাবেথ একা নিরালায় বসে মনে মনে ছক কেটে ফেলেন—শত্রুকে ঠাণ্ডা করতে হবে মিষ্টি কথা বলে, মধুর ব্যবহার করে। প্রয়োজন হলে তাদের একটু প্রশ্রয় দিয়ে বা তাদের কোন কোন অধিকার বা দাবিকে মেনে নিয়েই তাদের তুষ্ট রাখতে হবে।

সাবধান—খুব সাবধান! ধর্মের ধ্বজাধারী নেকড়ে বাঘগুলোর সামনে যেন এতটুকু বিরক্তি, বিরূপতা এবং বিতৃষ্ণা প্রকাশ না পায়—খুব সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ দক্ষ অভিনেত্রীর মত নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে—

মেরীর সমর্থক পোপের একদল অনুচর নতুন রাণীকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁদের উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা করে এলিজাবেথ বিনম্র স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—

পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাকে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন আমি আমার সমস্ত সাঁমর্থ্য দিয়ে তা পালন করবো—আমি শুধু আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা চাই—

অবাক হয়ে গেল পোপের দল। কই নতুন রাণী সম্বন্ধে যা শোনা গিয়েছিল, তা তো নয়। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাসী। রীতিমত ভক্তিমতী তপোঋদ্ধ রমণী !

তখনও কিন্তু পোপের অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিল। পোপের দরবারে ইংল্যাণ্ডের একজন রাজদূত থাকার নিয়ম অনেক কালের। মেরীর আমলের দূত, গোঁড়া ক্যাথলিক মুখ কাচুমাচু করে পোপের কাছে এল। মাথা চুলকে বলল, আর কি আপনার এখানকার পাট তো আমার এবার চুকল—

কেন, কিসের পাট ?

নতুন রাণী তো প্রোটেস্ট্যাণ্ট। বিধর্মী। তিনি কি আর আপনার দরবারে আমাকে—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ড থেকে এসে গেল এলিজাবেথের নির্দেশ—মহামান্য পোপের দরবারে আমার প্রতিনিধি যিনি আছেন—তিনিই বহাল থাকবেন।

পোপ গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

একজন খাঁটি ক্যাথলিক দূতকে কি না নিজের প্রতিনিধি বলে মেনে নিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট অ্যানবলিনের মেয়ে এলিজাবেথ !

পোপের মনে হল, তিনি এক স্বপ্নের রাজ্যে বাস করছেন।

দাঁড়াও বন্ধু—দাঁড়াও—এখুনি কি হয়েছে ? মনে মনে বলেন এলিজাবেথ, তোমাদের বিষদাঁতটা উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি—

মনের ভেতর থেকে প্রটেস্ট্যাণ্ট নীতির দিকেই সায় ছিল এলিজাবেথের, আর থাকবে নাই বা কেন! তিনি যে আজ রাণী হয়েছেন তার মূলেও তো সেই ধর্মবিপ্লব বা প্রতিবাদী আন্দোলন অর্থাৎ প্রটেস্ট্যাণ্টদেরই অবদান।

তাঁর বাবা অষ্টম হেনরী তো ধর্মবিপ্লবের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পোপের আধিপত্য অস্বীকার করে রিফরমেশান পার্লামেণ্ট ডেকে সেই অধিবেশনেই তাঁর উইলে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার সিংহাসনে অধিকার বৈধ বলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। দেশ জুড়ে প্রতিবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠলে ধর্মবিপ্লব না হলে তিনি এতদিনে কোথায় কোন অজানা অন্ধকারে ভেসে যেতেন ! কিন্তু—

যাই করুক, যত অবদানই থাক, প্রটেস্ট্যাণ্টদের নিয়ে কিন্তু এতটুকু বাড়বাড়ি

বলেই তারা কখনো ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেনি। তাদের পরম আকাঙ্খিত সেই থরযৌবনা রূপসী রমণী—এলিজাবেথকে বিপন্ন করতে তাদের মন কখনো সায় দেয়নি। তাই এলিজাবেথের বিদেশনীতির আলোচনায় বিদগ্ধ ঐতিহাসিক রাউসে (Rowse) বলেছেন, As they (princes) expectant, unwilling to fight against her if they might conquer her by wooing যদি প্রেমে ভালবাসায় তার মন জয় করতে পারা যায়, অযথা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রয়োজন কি ?

এলিজাবেথও ঠিক এই প্রেম, মৈত্রী আর সখ্যতাবন্ধনের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। এইজন্যেই তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেননি। তার মনে আশার কুহক জাগিয়ে রেখেছিলেন একটানা প্রায় এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে। তার সুফলও পেয়েছিলেন প্রচুর। ক্যাথলিকদের নেতৃস্থানীয় ফিলিপের প্রভাবেই ক্যাথলিকরা কখনো এলিজাবেথের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেনি। মহামান্য পোপের মনের বিক্ষোভও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে স্পেনীয় রাজদূত ফারিয়াকে এলিজাবেথের নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল ফিলিপ।

একদিন না একদিন এলিজাবেথ তার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধবেন এই স্থির বিশ্বাসে স্পেনের রাজা দ্বিতায় ফিলিপ চ্যাটিউয়ি ক্যাম্বেসিসের সন্ধির সর্তে ক্যালে বন্দরের অধিকারও ইংল্যাণ্ডেশ্বরীকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও ফিলিপ নিজে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক তবুও পোপের প্রতিহিংসা এবং চক্রান্ত থেকে এলিজাবেথকে আগলে রেখেছিলেন ১৫৭০ সাল পর্যন্ত। আর তারপরে—

তারপরেই তাঁদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল। কিন্তু সে বৃত্তান্ত এখন থাক।

বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় এলিজাবেথের বিদেশনীতির অনেকখানি জুড়ে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত রহস্যময় কুমারী জীবনের উদ্দাম প্রেম ভালবাসা আর আনন্দ উল্লাস এবং দুঃখ বেদনার নিদারুণ যন্ত্রণা। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে রাত্রি নামে গভীর হয়ে। ঘুম নেই সম্রাজ্ঞীর চোখে। দীর্ঘ টেবিলে ছড়ানো ইউরোপের মানচিত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধ্যানস্থ একটা মূর্তির মত বসে রয়েছেন। মোমবাতির আলো তার মুখে আগুনের জ্বালার মত জ্বলছে।

ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে স্পেন। পোপের প্রতিনিধি বা 'প্যাপালবুল' হয়ে ফিলিপ ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তিনি গুপ্তচরের কাছে জানতে পেরেছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফিলিপ ইংল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিতাড়িত করার জন্য চক্রান্ত

করছে। এমন কি আর এক বিশ্বের বা আর এক গোলার্ধের কোন বন্দরে ইংরেজদের জাহাজ দেখলেই পাগলা কুকুরের মত তেড়ে আসে স্পেনীয়রা। শুধু ইংল্যাণ্ড কি ফ্রান্স নয়—সারা পৃথিবীরই অধীশ্বর হতে চায় দ্বিতীয় ফিলিপ। বিরাট উচ্চাশার ঘোড়ায় চেপে আর তাকে জ্বলন্ত উৎসাহের চাবুক মেরে বাতাসের বেগে ছুটে চলা মানুষটাকে রুখতে হবে। স্তব্ধ করে দিতে হবে তার দুরন্ত গতি। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে লোকটা—

আহা! এখনও হয়তো তাকে বিয়ে করার আশাটা বেচারী মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই যেখানে যত দৌরাত্ম্য করুক ইংল্যাণ্ডের কোথাও কিন্তু স্পেনীয়রা কোন হাঙ্গামা করেনি। কিন্তু তাই বলে তো আর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। দিনে দিনে যেভাবে ফিলিপ শক্তিশালী হয়ে উঠছে—তা ইংল্যাণ্ডের কাছে খুবই বিপজ্জনক। তাই--

ফিলিপকে রুখতে হলে এখুনি ফ্রান্সের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার দরকার। এলিজাবেথ তাঁর দূতকে বললেন, শোন তুমি কালই ফ্রান্সে রওনা হয়ে যাও। সেখানকার হালচাল দেখবে আর—হঠাৎ থেমে গেলেন। চারদিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে অস্পষ্ট গলায় বললেন, ফ্রান্সের রাজকুমার আর্কডিউক চার্লসের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেবে—

বিয়ে! বিস্ময়ে উত্তেজনায় রাজদূতের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এলিজাবেথের মনে ভিড় করে এল সাবেক দিনের স্মৃতি। এই সেই ফরাসী রাজকুমার যাঁর মনে তিনি একদিন রঙ ধরিয়ে ছিলেন। চার্লস তাঁকে ভালবেসেছিলেন পাগলের মত। কত নির্জন দুপুরে টেমসের বুকে তাঁরা একসঙ্গে নৌকোবিহার করেছেন। কত অপরাহ্নে, কত সন্ধ্যায় তাঁদের মিলিত কণ্ঠের হাসিতে আর কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছে এই রাজপ্রাসাদ—

এই যে বড়মুখ করে রাণী পার্লামেন্টে ঘোষণা করে এলেন তিনি চিরকুমারী থাকবেন। আরে বাবা মেয়েমানুষ যখন বিয়েসাদী না করলে হয়? লণ্ডনের জনসাধারণের ভেতরে গুঞ্জন শুরু হলো।

চার্লসের পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠেছে। যেন একটা মিষ্টি সুখস্বপ্নের ঘোরের ভেতরে আচ্ছন্নের মত দিন কাটছে তার। দিবানিশি তার চেতনার ভেতরে জ্বলজ্বল করে তাঁরই মুখচ্ছবি। একদিন—

আর পারল না চার্লস। ডিনার খেতে এসে গল্পে গল্পে রাত গভীর করে ফেলল। কিসের যেন উত্তেজনায় আর আবেগে তার ভেতরে ভেতরে যেন ঝড় বয়ে চলেছে—

তুমি কিছু বলবে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি—আমি আর পারছি না। আর—কত দেরি ?:

কী পারছো না—কিসের দেরি, যেন কোন দূর দূরান্তরের গ্রহ থেকে অস্ফুটস্বরে বললেন তিনি—

কেন, আমাদের বিয়ের। তুমি 'কি কিছুই বুঝতে পারছো না ?

বিয়ে ! চাপা হাসিতে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চার্লসের হাত দুটো পরম আদরে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার এই ভালবাসার কথা আমি চিরকাল মনে রাখব চার্লস—

চার্লসের হয়তো মনে হল সে একটা গভীর অন্ধকার খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডুবন্ত মানুষের মত ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল—কি বলছো তুমি ? কেন বিয়ে—

পাগল না কি ! আমাদের ধর্মই যে আলাদা। তাই বন্ধুত্ব হতে কোন বাধা নেই, হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আবার বললেন, কিন্তু বিয়ে কখনই হতে পারে না—কেমন শুকনো আর খটখটে শোনালো তাঁর গলার স্বর।

এসব ১৫৫৯ সালের কথা।

সেই আর্কডিউক চার্লস—সেই ফিরিয়ে দেওয়া ফরাসী রাজকুমারকে, যে একদিন তাঁকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যার উদ্দাম ভালবাসাকে তিনি নির্মম প্রত্যাখ্যানে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন—দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ তার কাছেই নিজের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন এলিজাবেথ স্বয়ং।

এই হলো রাজনীতি—রাজনীতির খেলা !

কয়েকদিন পর এলিজাবেথের দূত মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল। বেশ কিছুদিন আগেই আর্কডিউক চার্লসের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কুছ পরোয়া নেই ! ফ্রান্সের রাণী ক্যাথারিন ডি মেডিসির আরো ছেলে—আরো রাজপুত্র আছে, মনে মনে বললেন এলিজাবেথ তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাত্রের অভাব ইউরোপে কখনো হবে না। আর সত্যি সত্যি বিয়ে করার জন্যই তো তিনি বিয়ের কথা ভাবছেন না। বিয়ের লোভটাকে সামনে ধরে রেখে শত্রুকে একটু বশে রাখা। কিছুতেই তার অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের চিরশত্রু—স্পেন আর ফ্রান্স যেন নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে না পারে। যেমন করেই হোক স্পেনকে দাবিয়ে রাখতে হলে ফ্রান্সকে দলে টানতে হবে। অতএব—

এবার এলিজাবেথের 'প্রস্তাব এল ক্যাথারিন ডি মেডিসির দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ আঞ্জুর জন্য।

উল্লসিত হয়ে উঠল ফ্রান্স। এই বিয়ে হলে ইঙ্গ ফরাসী মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাবে স্পেন। আর ওদিকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে. স্পেনের বন্ধুত্বেও একটু চিড় ধরবে। কিন্তু—

ফ্রান্সের রাজনৈতিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত জেনেও শুধু ছেলের মা ক্যাথারিন ডি মেডিসির মনটা একটু খুট খুট করছিল। আঞ্জুটার বয়স মাত্র উনিশ। আর এলিজাবেথ যে সাইত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে—

তা হোক হার একসেলেন্সির মন্ত্রী সভাসদরা ক্যাথারিনকে বলল, পাত্রী যদি স্বয়ং রাণী হন, তাঁর আবার বয়স কী? বিয়ে হলে আমাদের কত লাভ বলুন তো?

কিন্তু অত আশা আর উল্লাস অত জল্পনা কল্পনা সব—সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আঞ্জুই বেঁকে বসলেন। তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক। বলে বসলেন হতে পারেন রাণী কিন্তু কোন বিধর্মী রমণীকে বিয়ে করতে পারবো না—

কিন্তু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী এলিজাবেথ নন। যেমন করে হোক ছলে বলে কৌশলে ফ্রান্সের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ যে তাকে গড়ে তুলতেই হবে।

দিনের পর দিন স্পেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটছে। এই সেদিন নেদারল্যাণ্ডসের স্পেনীয় শাসনকর্তা আলভার সোনাদানার এবং আরও অনেক মহার্ঘ পণ্য বোঝাই কয়েকটা জাহাজের ওপরে ইংরেজ নাবিকরা নেকড়ের মত লোলুপ উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠ করে নিয়েছে। ইংরেজদের রণনৈপুণ্যের সঙ্গে কখনো স্পেনীয়রা পাল্লা দিতে পারে না বলেই ফিলিপ বিক্ষুব্ধ হয়ে নিদারুণ ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে ইংরেজ নৌসেনাদের বলেন, 'ইংরেজ সাগর সারমেয়' English Seadogs!

কিন্তু ফিলিপের রাগ করাই সার হলো। ইংরেজরা স্পেনের উপকূলের বন্দরে বন্দরে অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে লাগল। কিছুই করতে পারলেন না স্পেনের রাজা।

কি করেই বা পারবেন? তার নিজের ঘরেই যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে; নেদারল্যাণ্ডসের ডাচ প্রজারা স্পেনীয় শাসনকর্তা আলভার নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করেছে।

এই সুযোগ! উল্লাসে এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে। বিদ্রোহীদের খুব—খুব গোপনে মদত দিয়ে স্পেনকে যতটা সম্ভব ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে। যেন বাছাধন ইংল্যাণ্ডের দিকে থাবা বাড়াতে না পারে। কিন্তু কাকে দিয়ে নেদারল্যাণ্ডসে তাঁর সাহায্য পাঠাবেন—সেরকম অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক কে আছে।

গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী !

শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, শুধু ইউরোপের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেরই এক চমকপ্রদ বিস্ময় এই মহীয়সী রমণী এলিজাবেথের ছিল একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য—মন্ত্রী এবং সভাসদদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করতেন বন্ধুর মত। তাঁদের কাউকে কাউকে তাঁর নিজের দেওয়া নামে ডাকতেন পর্যন্ত। যেমন আর্ল অফ লিস্টার বলতেন 'আমার দুটি নয়ন', জীবন বা জন ছিলেন ওয়াল্টার র‍্যালে, ওয়ালসিংহ্যাম 'মূর' আর বার্গলে তাঁর প্রেরণা বা স্পিরিট।

কিন্তু যত মাথামাথিই করুন না কেন, রাজনীতির অত্যন্ত গোপন কোন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কখনো একান্ত কাছের মানুষের সঙ্গেও একটি কথাও বলতেন না। তাই কেউ কখনো জানতে পারতো না—তিনি কি ভাবছেন, কাকে দিয়ে তিনি কী করাচ্ছেন।

কিন্তু কাউকেই আর মুখ ফুটে কিছু বলতে হলো না। ফ্রান্সের কাছ থেকেই এসে গেল তাঁর মনের মত প্রস্তাব—আমরা নেদারল্যাণ্ডসের এই অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ নিতে চাই—ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতা কামনা করি···

এলিজাবেথ তেমন কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না। তাঁর মনের গভীরে নানা রঙের সুতোয় বোনা চলতে লাগল এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা। উদ্ধত স্পেনকে দমিয়ে রাখতে হবে আর ফ্রান্সের শক্তিকেও বাড়তে দেওয়া চলবে না। কিন্তু খুব সাবধান ! নেদারল্যাণ্ডস হলো ইংল্যাণ্ডের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সেই নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে যেন তাঁর দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এতটুকু চিড় না ধরে।

নেদারল্যাণ্ডসে স্পেনের যে অধিকার তা যেমন আছে থাকুক। তাতে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। শুধু সেখানকার ডাচ বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্পেনের সংঘাতটাকে জীইয়ে রাখতে হবে। আর সেই চেষ্টা তিনি যথাসাধ্য করবেন।

আর ইতিমধ্যেই সে চেষ্টা যে তিনি করেননি, তা নয়। তিনিই বিদ্রোহী ডাচদের রণতরী ডোভার বন্দরে লুকিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এইখান থেকেই ইংরেজ নৌসেনাদের সহযোগিতায় আলভার সোনাভর্তি জাহাজ লুঠ করে নিয়েছিল তারা। তাঁর নির্দেশেই ইংরেজ সেনারা স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের নেতা উইলিয়ম অফ অরেঞ্জকে সক্রিয় সাহায্য করে চলেছিল। তাদের নিয়মিত অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন তিনিই।

স্পেন বুঝতে পেরেছিল বিদ্রোহীদের আড়ালে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা আছে। যথারীতি প্রতিবাদ এল স্পেন থেকে।

ও মা ! তাই নাকি ! এলিজাবেথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। খুব মৃদু

এবং দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না, আবার একটু থেমে আবার যেন বহু—বহু দূর থেকে কেমন অবসন্ন আর নির্লিপ্ত গলায় একটা দেশের নৃপতি হয়ে অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাহায্য করাকে আমি নীতিবিরুদ্ধ এবং গর্হিত কাজ বলে মনে করি—

ফ্রান্সেও গোলমাল শুরু হলো।

নেদারল্যাণ্ডসের ডাচদের মতই ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যাণ্টস বা হ্যাগনটসরা বিদ্রোহ করল। আর সুযোগসন্ধানী এলিজাবেথের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। এইবার—এইবার ইংল্যাণ্ডের পরম শত্রু ফ্রান্সের বিপর্যয়কে আরও ঘনায়মান ও প্রলয়ঙ্করা করে তুলতে হবে। স্বয়ং পরম করুণাময় ঈশ্বর তাঁকে পথ করে দিয়েছেন।

এলিজাবেথের বিক্ষোভের কারণ ছিল—তাঁর চিরশত্রু দুইটি রমণী—

ক্যাথারিন ডি. মেডিস বা মেরী অফ গাইজ।

মেরী স্টুয়ার্ট।

টিউডর বংশের আদি পুরুষ সপ্তম হেনরী তাঁর মেয়ে মার্গারেটের বিয়ে দিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমসের সঙ্গে। তাঁদের পুত্র পঞ্চম জেমস বিয়ে করেছিলেন ফ্রান্সের আভিজাত গাইজ পরিবারের মেয়ে মেরীকে। এই মেরীই ইতিহাসে মেরী অফ গাইজ নামে পরিচিত। আর পঞ্চম জেমস এবং মেরী অফ গাইজের মেয়ে—মেরী স্টুয়ার্ট।

মাতা এবং কন্যা। দুজনেই রাজবধূ। আর এঁরাই এলিজাবেথের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের ইতিহাসের অনেক অনেক অঘটনের নেপথ্য নায়িকা!

অত্যন্ত অল্প বয়সে মেরী স্টুয়ার্টের বিয়ে হয়েছিল ফ্রান্সের রাজকুমার দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে। কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হওয়ার পর আবার পিতৃরাজ্য স্কটল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। বিবাহ এবং জন্মসূত্রে তিনি যেমন ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডের তেমনি সপ্তম হেনরীর বংশসম্ভূতা বলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনেরও অধিকারী ছিলেন। মেরী অফ গাইজ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন থেকে এলিজাবেথকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর মেয়ে মেরী স্টুয়ার্টকে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করছিলেন। আর সেই ব্যাপক ষড়যন্ত্রের প্রধান কুশীলব ছিলেন স্পেনের রাজা ফিলিপ এবং রোমের মহামান্য পোপ তথা সমগ্র ক্যাথলিক সমাজ। কিন্তু—

যখুনি বিপদ আসে, সেই ঘনঘোর দুর্যোগের অন্ধকারে এলিজাবেথের সৌভাগ্য ঝিলিক দেয়। ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিদ্রোহ তাঁর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। এলিজাবেথ একটুও দেরি করলেন না। অত্যন্ত গোপনে হ্যাগনটসদের

অর্থ দিয়ে এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে যেতে লাগলেন।

এই সময় ফ্রান্সের শাসনভার ছিল মেরী অফ গাইজের ওপরে। কিন্তু আসল কলকাঠি নাড়ছিলেন তাঁর ভাই ডিউক অফ গাইজ। কিন্তু এঁরা ছিলেন অপরিণামদর্শী! দিনে দিনে হ্যাগনটসদের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করছে দেখে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে উঠলেন মেরী অফ গাইজ।

একবার নয়, দু-দুবার হ্যাগনটসদের নেতা অ্যাডমিরাল কলিনগিকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। গুরুতরভাবে আহত হলেন কলিনগি। রাস্তায় তাজা রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। শত শত হ্যাগনটস শহীদ হলো। রাজপথের মোড়ে মোড়ে প্রোটেস্ট্যান্টরা চরম ঘৃণার ধিক্কারে জ্বলে উঠে স্লোগান দিতে লাগল—প্রোটেস্ট্যান্ট বিদ্বেষী মেরী—নিপাত যাক—নিপাত যাক—

হ্যাটফিল্ডের নির্জন প্রাসাদে শান্ত হয়ে বসে রইলেন এলিজাবেথ। একটা চাপা হাসি শুধু ছুরির ফলার মত ঝিকমিক করতে লাগল তাঁর ধারালো মুখে।

হোক—পরিস্থিতি আরও খারাপ হোক। সেটাই তো চাই। হ্যাগনটসদের ওপরে নির্মম অত্যাচারের জন্য আকাশে বাতাসে যে নিন্দে ছড়িয়েছে তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে—এই কথাগুলো তাঁর মনের ভেতরে শুধু গুঞ্জরিত হতে লাগল।

স্কটল্যাণ্ড।

একেবারে গোড়া থেকেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের কোনদিনই প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। আর সেই সম্বন্ধই আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন সেই মেরী অফ গাইজ স্কটল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেমসের বিধবা পত্নী তার কন্যা মেরী স্টুয়ার্টের প্রতিনিধি হয়ে দেশ শাসন করতে শুরু করলেন।

প্রখর বুদ্ধিশালিনী এলিজাবেথ যেন তার মনের চোখে দেখতে পেলেন ফ্রান্স এবং স্কটল্যাণ্ড দু—দুটো দেশের রাজপ্রতিনিধি হয়ে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনেও তাঁর মেয়ে মেরী স্টুয়ার্টের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার দুর্বার স্বপ্ন নিয়ে উচ্চাশার ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছেন মেরী অফ গাইজ। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিধ্বংসী ঝড় ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ফ্রান্স আর স্কটল্যাণ্ড মিলে একেবারে ধ্বংস করে দেবে ইংল্যাণ্ড!

উপায়?

দুশ্চিন্তায় আর আশঙ্কায় এলিজাবেথ যখন আকুল হয়ে উঠেছেন ঠিক তখুনি এসে গেল সোনার সুযোগ। হয়ে গেল শত্রুকে বিপর্যস্ত করার এক চমকপ্রদ উপায়।

ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্কটল্যাণ্ডের বাতাসে এল এক নতুন জোয়ার।

আর সেই জোয়ার নিয়ে এলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং মনস্বী প্রোটেস্ট্যান্ট নেতা জন নক্স। নক্সের রিফর্মেশানের বাণীর ভেতরে একটা নতুন আদর্শ, একটা বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের সুর ধ্বনিত হলো। আলোড়িত হয়ে উঠল সারা স্কটল্যাণ্ড। চরম দুর্নীতিতে জর্জরিত ক্যাথলিক চার্চ এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের তীব্র বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল স্কটল্যাণ্ড।

কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশ জুড়ে সেই উত্তাল আন্দোলন আর গণবিক্ষোভের কারণ কিন্তু শুধু নীতিভ্রষ্ট ও পাপাচারী ক্যাথলিকরা নয়, আসল কারণ হলো স্কটল্যাণ্ডের জাগ্রত জাতীয়তাবোধ। নির্বাসন থেকে জননেতা জননক্সেরই উদ্দীপ্ত প্রেরণায় স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণ সেই প্রথম উপলব্ধি করেছিল—তাদের স্বদেশ—তাঁদের মাতৃভূমি কিন্তু তাদের নয়। স্কটল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদে, রাজদরবারে রাস্তায় ঘাটে বাজারে অলিতে গলিতে সব জায়গায় শুধু ফরাসীরাই গিজগিজ করছে। আর সর্বত্র—সর্বক্ষেত্রে তারাই প্রভুত্ব করছে। তাদের নির্দেশেই স্কটল্যাণ্ড চলছে। উঠছে। বসছে।

ভুলে যাবেন না—আপনারা যুগযুগান্তর থেকে একটা স্বাধীন জাতি, স্বাধীনতাকে আপনারা বংশপরম্পরায় ভালবেসেছেন জননক্সের বক্তৃতার এই কথাগুলো স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। তারা সমস্বরে ধ্বনি তুলল—

মেরী অফ গাইজের প্রভুত্ব, ফ্রান্সের আধিপত্য আমরা মানবো না—

নিদারুণ আক্রোশে ফুলে উঠল ফ্রান্স। বিক্ষুব্ধ হয়ে মেরী অফ গাইজ নির্দেশ দিলেন—এখুনি সৈন্য পাঠাও—ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও স্কটল্যাণ্ড। এতবড় আস্পর্ধা! ফ্রান্সের আধিপত্য তারা মানবে না।

শুরু হয়ে গেল অন্তর্বিপ্লব। দুই দেশ, ফ্রান্স আর স্কটল্যাণ্ডের ভেতরেও বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করল। এলিজাবেথের কানেও এল এসব খবর। তিনি ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হলেন। মনে মনে বললেন—অবস্থাটা আরও একটু জটিল হয়ে উঠুক—আরও বেশি করে জট পাকিয়ে যাক। তারপর সব দেখেশুনে সুবিধেমত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেই চলবে। কিন্তু—

হ্যাটফিল্ডের বিশাল প্রাসাদের প্রগাঢ় নির্জনতার ভেতরে তলিয়ে থেকে মনে মনে চিন্তার জাল বুনে যাওয়া হলো না এলিজাবেথের। নক্সের অনুগামী স্কচ অভিজাতরা এসে কেঁদে পড়লেন তাঁর কাছে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করুন। ফ্রান্স যে আমাদের পিষে মেরে ফেলতে চাইছে···আমাদের বিপদ তো আপনারও বিপদ—এলিজাবেথ চুপ করে থাকলেন।

কেমন একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য ফুটে উঠল তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। যেন এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের এই বিদ্বেষ সংঘাত কুটিলতার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয়ই নেই। কিছুক্ষণ ভেবে শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন, বুঝতেই পারছেন একটা দেশের রাণী হয়ে আর একটা দেশের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার মানেই তো ন্যায়নীতি আদর্শকে পা দিয়ে থঁাতলানো—এই কথাগুলো যখন নিভু-নিভু আর অস্পষ্ট কণ্ঠে এলিজাবেথ বলছেন তখন কিন্তু তাঁর মনে উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে।

নিশ্চয়ই সাহায্য করতে হবে—স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের দরাজ হাতে সাহায্য করে ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত না করতে পারলে ইংল্যাণ্ডের বিপদ অনিবার্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

মশালচিরা রাজপ্রাসাদের চারদিকে মশাল জ্বালিয়ে দিল। পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। ঘণ্টার ধাতব শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল দূরে।

এলিজাবেথ মনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে মুক্তো খোঁজার মত করে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। তাঁর অপর্যাপ্ত রূপের আগুনে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে এসেছে কত রাজা, কত রাজপুত্র, কত ডিউক, কত রাজপ্রতিনিধি। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর জন্য এখনও উদগ্র প্রতীক্ষায় বিনিদ্র নিশি যাপন করছে। কিন্তু—

তাঁদের কাউকে দিয়েই এ কাজ হবে না। তাঁদের ভালবাসার আড়ালে আছে রাজনীতির স্বার্থ, আছে ইংল্যাণ্ডের ওপরে প্রভুত্বের লোভ। তাহলে ?

হঠাৎ তাঁর মনের অন্ধকারে জলজল করে উঠল দীর্ঘ একহারা চেহারার এবং শান্ত সৌম্য স্বভাবের এক যুবকের ম্লান বিষণ্ণ মূর্তি।

আরার ডিউক।

বেচারী দূর থেকেই যাকে এতদিন ভালবেসেছে, কত দিন কত ভাবে যাকে প্রেম নিবেদন করেছে সেই এলিজাবেথের আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হয়ে ছুটে এলেন ডিউক অফ আরা! তাহলে এতদিন পরে এলিজাবেথ মন স্থির করেছেন—এবার এলিজাবেথ তাঁর হবে। তাঁর চেতনা যেন কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে এল।

ডিউকের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ আবেশ জড়ানো মধুর কণ্ঠে বললেন, তুমি তো আমার পুরানো বন্ধু—তুমি আমাকে ভালবাসো। পরম আবেগে ডিউকের হাতে হাত রেখে আবার চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আমি—আমি যা বলবো করতে পারবে—

বলো কি ! তীব্র উত্তেজনায় আবেগে টলমল করে উঠলেন ডিউক অফ আরা, তুমি বললে আমি—

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ। অন্তরঙ্গ প্রেয়সীর মত তাঁর কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন কতগুলো কথা—

ওঃ এই ব্যাপার। এলিজাবেথের সুরভিত নিশ্বাসের বাতাসে স্নান করে ডিউক যেন কেমন আবিষ্টের মত বলল, তুমি কিছু ভেব না—তুমি যেমন বলবে করবো। নিরুদ্ধ আবেগের উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না ডিউক।

তাঁর খুব কাছে তাঁর নিঃশ্বাসের সীমানার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন এলিজাবেথ। রক্তবর্ণ ভেলভেটের পোশাকের আবরণে তাঁর দীর্ঘ সুঠামতনু রঙীন মরীচিকার মূর্তির মত জ্বলজ্বল করছে। ডিউকের মনে হল— দূরের দিগন্ত পেরিয়ে বিপুল ব্যাপ্ত আকাশেরও সীমানা ছাড়িয়ে তিনি যেন ভেসে ভেসে চলেছেন অজানা কোন স্বর্গলোকে—

শোন—ডিউকের স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বললেন, মনে রেখ, তোমার ওপর আমার সব—সব কিছু নির্ভর করছে, একটু থেমে আবার করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার মান সম্ভ্রম—ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ—সব আমার ওপরে নির্ভর করছে। মধুর এক সুখের আবেশে তলিয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে ডিউক বললেন। তাঁর হঠাৎ মনে হল তিনি এখুনি স্কাইলার্ক পাখির মত ডানা মেলে উড়ে উড়েই চলে যেতে পারেন স্কটল্যাণ্ডে।

আমি—আমি যাচ্ছি। আচমকা এলিজাবেথের নিটোল হাত টেনে নিয়ে ডিউক আলতো করে তাতে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেলেন।

কিন্তু একবার—একবার যদি পিছন ফিরে তাকাতেন, দেখতে পেতেন, এলিজাবেথের মুখে ধূর্ত আর কুটিল হাসি ঝিকমিক করছে।

কিছুদিন পরই ফরাসী সরকারের কাছে থেকে এলিজাবেথের দপ্তরে এল তীব্র ক্ষোভ—স্কটল্যাণ্ডের বর্ডারে এত সৈন্য কোথা থেকে আসছে আর এত টাকাই বা জননক্সের দলটা পাচ্ছে কি করে ? মনে হচ্ছে এসবের আড়ালে ইংল্যাণ্ডের হাত আছে।

আমার ইংল্যাণ্ড। এলিজাবেথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দাঁতে দাত চেপে ধরে চাপা গলায় বললেন, অসম্ভব।

তাহলে নক্সের আগুনে দলটা এত মদত কি করে পাচ্ছে, মেরী অফ গাইজ

গজগজ করে এত তড়পাচ্ছে কি করে ? মনে মনে বলেন—শৃগালের চেয়েও ধূর্ত এই এলিজাবেথকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন।

ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে নার মত ভাব যতই দেখান না কেন এলিজাবেথ, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, মেরী অফ গাইজ ধরে ফেলেছেন।

ঠিক আছে। ধরেই যখন ফেলেছে তাহলে আর একটা কৌশল করে শত্রুকে খুশি রাখতে হবে।

কয়েকদিন পর।

ফরাসী রাজদূত এলিজাবেথের সিলমোহর করা একটা চিঠি পেলেন। 'আপনি যদি অনুগ্রহ করে হ্যাম্পটন কোর্টের প্রাসাদে পায়ের ধুলো দেন তাহলে খুব খুশী হবো—'

এলিজাবেথের সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে যথাসময়ে এলেন ফরাসী রাজদূত। মধুর হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে এলিজাবেথ নিয়ে এলেন প্রাসাদের আর্ট গ্যালারীতে। কিন্তু—

গ্যালারীতে পা দিয়েই রাজদূতের চোখ দুটো বিস্ময়ে ছটফট করে উঠল। এ কী ! গ্যালারীর ঠিক মাঝখানের দেওয়ালে টাঙানো আছে বিশাল সাইজের একটা ছবি—মেরী অফ গাইজের প্রতিকৃতি। জানেন, এই ছবিটির দিকে যত তাকাই—ফরাসী দূতের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে আস্তে আস্তে বললেন এলিজাবেথ, ততই শ্রদ্ধায় আমার মাথাটা নুয়ে আসে। দু-দুটো রাজ্য কী নিপুণ-ভাবে পরিচালনা করছেন। যেমন প্রখর বুদ্ধি, তেমনি দয়াবতী—নিষ্ঠাবতী, একটু থেমে আবার গভীর আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

কথা নয়, রাজদূতের মনে হল যেন কোন দূর স্বর্গলোকের সুমধুর সঙ্গীতের সুরলহরী শুনছেন। কী সুন্দর করে কথা বলতে পারেন ইংল্যাণ্ডেশ্বরী।

তিনি যেমন মুগ্ধ হলেন তেমনি বিস্মিতও হলেন। তাহলে এতদিন ধরে যা শোনা গিয়েছিল সব মিথ্যে। মেরী অফ গাইজের বিরুদ্ধে যদি এলিজাবেথের গোপন শত্রুতাই থাকবে তাহলে তাঁর ছবি অত যত্ন করে গ্যালারীর মাঝখানে টাঙিয়ে রাখবেন কেন ?

না—না—সব মিথ্যে—সবগুজব—বাজে অপবাদ। ফরাসী দূত বার বার মাথা নেড়ে নিজের মনে বললেন।

দেশে ফিরে গিয়ে সব বৃত্তান্ত মেরী অফ গাইজকে নিবেদন করে বললেন, এতদিন যা শুনেছেন সব মিথ্যে রটনা। আপনার সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের রাণীর অগাধ শ্রদ্ধা আর প্রীতি আছে।

ইতিমধ্যেই এলিজাবেথ কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের প্রচুর সৈন্য এবং প্রায় ৩০০০ পাউণ্ড দিয়ে সহায়তা করা হয়ে গিয়েছে।

এই হলো এলিজাবেথ— এই তাঁর বিদেশীনীতি।

শুধু মাত্র প্রখর বুদ্ধি, রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর আশ্চর্য অভিনয় নৈপুণ্যে ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ড আর স্পেনকে দমিয়ে রেখেছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রায় অচল করে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই আশ্চর্য সাফল্যের মূলে কিন্তু শুধু তাঁর কুমারী জীবন অপর্যাপ্ত যৌবন, এবং দীর্ঘ ছন্দিত সুঠাম দেহবল্লীরই ছিল না—এসব তো এহ বাহ্য! এ সব বাইরের জিনিস, বলেছেন England of Elezabeth-এর লেখক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. এল. রাউসে (A. L. Rowse)। এলিজাবেথের মানসিক গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এলিজাবেথের ছিল অফুরান প্রাণসম্পদ। জীবনের প্রতি ছিল তাঁর দুবার পিপাসা, কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন প্রাণের আবর্তে পরিপূর্ণ এক পার্থিব রমণী—Full of vitality and with inexhaustible gust for life. But she was essentially secular...

দেশের স্বার্থে, রাজনীতির প্রয়োজনে, ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি বারে বারে। কিন্তু তাঁর মন ভারি—ভারি হয়ে উঠেছে। অনুশোচনার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন তিনি। ডিউক অফ আরাকে স্কটল্যাণ্ডে বিপদের মুখে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে যেমন তেমনি ফরাসী রাজকুমার অ্যালেনকনকে নেদারল্যাণ্ডসে পাঠিয়ে নির্জন ঘরে বসে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এলিজাবেথ! আর তাঁর বুকের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল একটা ব্যাকুল প্রার্থনা—কবে শেষ হবে তাঁর এই খেলা?

বিয়ে।

প্রায়ই দেশ জুড়ে তাঁর বিয়ে বিয়ে রব ওঠে। পার্লামেণ্টেও প্রশ্ন ওঠে—কেন—কেন রাণী বিয়ে করছেন না? বিয়ে হোক, সন্তানের জন্ম হোক, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আসুক—আর পাঁচজন রমণী যা চান, যা করেন, সেসব কি তিনি চান না?

বিয়ে—একটা পুরুষের প্রেম ভালবাসার কবোষ্ণ বন্ধনে নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন, সন্তানের কলকণ্ঠে মুখর একটা শান্তির সংসার আবার কোন্ নারী না চায়! আজও কত—কত বিনিদ্র রাত্রে তাঁর রক্তের ভেতরে একটা নিশঃব্দ কান্না ঝরতে থাকে। আর মনের ভেতরে শুরু হয়ে যায় সেই রঙীন মিছিল—সেমুর···ডাডলি··· এসেকেস আরও কত রাজপুত্র—কত রাজপুরুষ তাঁর মনে প্রেমের রঙ ধরিয়েছিল। কিন্তু ভোরের পদ্মের মত তাঁর যৌবনের পাপাড়ি যখন সবে মেলতে শুরু করেছে, সেই উথালপাথাল পনের বছর বয়সেই তাঁর জীবনে প্রথম ভালবাসার আলো জ্বালিয়েছিল সেমুর। নারীপুরুষের জটিল জীবন রহস্যের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃস্থানীয় পুরুষ সেই সেমুয়ের কাছে থেকেই। রক্তের সেই অনাস্বাদিত পূর্ব বিচিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন তাঁর চেতনা। বিকল করে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত সত্তা। আর তার পরেই দুরপনেয় কলঙ্কের গ্লানিতে অতল পাঁকের ভেতরে ডুবে যেতে বসেছিল—

না—না—বিয়ের শখ তাঁর মিটে গিয়েছে। বিয়ে আর তিনি কখনো করতে পারবেন না।

তাঁর জন্মভূমি।

তাঁর দেশ ইংল্যাণ্ডের স্বার্থেই তিনি আজীবন কুমারী হয়েই থাকবেন। আর ডিউক অফ আরা অ্যালেনকনের মত যুবকদের রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করে বাজীমাৎ করে দেবেন। করতে হবে—এটাই তাঁর ভবিতব্য।

॥ সতের ॥

বিয়ে আমি করবো—নিশ্চয়ই করবো।

একেবারে রাজত্বের শুরুতে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যেমন জিদ ধরেছিলেন—বিয়ে করবো না বলে—প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছিলেন আজীবন কুমারী হয়ে থাকবেন, সেই এলিজাবেথকেই কিন্তু সেই পার্লামেন্টেই মাত্র সাত বছর পরে (১৫৬৬ খ্রী) বলতে হয়েছিল—বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিয়ে আমি করবো—নিশ্চয়ই করবো, শুধু একটু—একটু ধৈর্য ধরুন—

কিন্তু কেন?

তাহলেই আবার তাকাতে হয় সেই স্কটল্যাণ্ড-দুহিতা, ফ্রান্সের বধূ এবং

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনেরও ভাবী উত্তরাধিকারী ও এলিজাবেথের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী সেই—

মেরী স্টুয়ার্টের দিকে।

বেশিদিন আগে নয়। এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার মাত্র দু বছর পর (১৫৬১ খ্রী) স্বামী খুইয়ে বিধবা হয়ে শ্বশুরকুলের দেশ-ভিটে ফ্রান্স ছেড়ে মেরী এসেছিলেন পিতৃরাজ্য স্কটল্যাণ্ডে। আসতে বাধ্যই হয়েছিলেন।

ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস এবং মেরীর কোন সন্তান ছিল না। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক ভাই নবম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন। পিছন থেকে হাল ধরে রাখলেন তাঁর মা ক্যাথারিন দ্য মেডিস বা মেরী অফ গাইজ। তাই মেরীর পক্ষে স্বামীগৃহ ছেড়ে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

স্বামী নেই, সন্তান নেই, উত্তরাধিকারীও নেই—তাই তাঁরও এখানে স্থান নেই। অতএব—বিদায় ফ্রান্স। দূরে—বহু দূরে প্রয়াত স্বামীর সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ চোখের জলে কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট হয়ে এল।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দের উনিশে আগস্ট মেরী স্কটল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। তখন শুধু স্কটল্যাণ্ডে নয়, ইউরোপের দেশে দেশে ক্যাথলিকরা আবার নতুন করে ধর্মনীতির প্রচারে নেমেছে। প্রচারক মিশনারীরা নিজেদের জেসুইট বলে পরিচয় দিতে লাগল। আসলে ক্যাথলিকই নতুন নামে শুধু ভোল পালটানো লোকের মন ভোলানোর চেষ্টা। ক্যাথলিকরা নতুন উদ্দীপনায় মেতে উঠল। উদ্দীপনার সঙ্গে এল অফুরন্ত সাহস। ইউরোপের শক্তিমান ক্যাথলিক রাজারা ক্যাথলিক মিশনারীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। এঁদেরই অগ্রনায়ক হলেন স্পেনের রাজা, গোঁড়া ক্যাথলিক দ্বিতীয় ফিলিপ। তিনি তখনও এলিজাবেথের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলছিলেন। কিন্তু—

মেরী—অঘটনঘটনপটিয়সী মেরী স্টুয়ার্ট। সদ্যবিধবা। সবে উনিশে পা দিয়েছেন। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুলের ঢেউ। ফুলের মত সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ কমনীয়তা। ভাসা ভাসা আর বড় বড় দুটো কালো ডাগর চোখে আমন্ত্রণের হাতছানি। এই মেরীই যে এলিজাবেথের জীবনে ঘনিয়ে তুলবে ভয়ানক এক বিপর্যয় তাতে আর আশ্চর্য কি!

মেরী ডানাকাটা পরী না হলেও সুন্দরী। লেখাপড়াও জানতেন। বিশেষ করে গানে নাচে ছিলেন পারদর্শী। অশ্বচালনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল—তিনি যেমন খরযৌবনা তেমনি লাস্যময়ী। তাই—

যা হওয়ার তাই হলো। ইউরোপের নানাদেশ থেকে রাজপুত্র রাজা এবং ডিউকদের দল যেন পাখনা মেলে দিয়ে চলে এসে মেরীকে বিয়ে করতে চাইল।

সর্বনাশ! ইংল্যাণ্ডে বসে স্কটল্যাণ্ডের নাটক দেখতে দেখতে এবার এলিজাবেথ আতকে উঠলেন। মেরীকে যাঁরা বিয়ে করতে চান তাঁদের অধিকাংশই তো তাঁকে বিয়ে করার জন্য হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন বছরের পর বছর কিন্তু বিয়ে সম্বন্ধে তাঁর যে নীতি স্পষ্ট করে 'না' বলে হতাশ না করে তাঁদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তাঁরাই আবার স্কটল্যাণ্ডের রাণীর দিকে হাত বাড়িয়েছে।

তা বাড়াক। মেরী যাকে খুশি বিয়ে করতে পারতেন তাঁর কিছুই এসে যেত না। কিন্তু মেরীর হবু পাত্রদের ভেতরে এমন দুজন আছেন যাঁদের একজনের গলায় মালা দিলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁর চেয়েও মেরীর দাবি অনেক বেশি হবে—জোরালো হবে।

মড়ার ওপর আবার খাঁড়ার ঘা পড়ল। স্কটল্যাণ্ডের রাণী স্টুয়ার্ট মেরী তাঁর মা মেরী অফ গাইজের মতই গোঁড়া ক্যাথলিক। অতএব মেরীকে কেন্দ্র করেই ক্যাথলিকরা এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়ে উঠল। এলিজাবেথকে সরিয়ে মেরীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানোর সেই চক্রান্তের মূল পাণ্ডা ছিলেন স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ মহামান্য পোপ, এবং ইউরোপের ক্যাথলিক নৃপতিরা। আর তখন থেকেই মেরী আর এলিজাবেথ, দুই দেশের দুই রাণীর ভেতরে তীব্র বিদ্বেষের বীজ রোপিত হলো। কিন্তু—

মেরী দেখতে যত সুন্দরাই হোক, যতই নাচে গানে দক্ষ হোক না কেন এলিজা-বেথের চরিত্রের মত গভীরতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং জনজীবন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। ছিল না রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই সমগ্র ক্যাথলিক সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে এবং জন্মসূত্রে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তার মাথা ঘুরে গেল। দূতের মাধ্যমে এলিজা-বেথকে হাঁকিয়ে দিলেন এক চিঠি—'আপনি পত্রপাঠ আপনার পরে আমাকেই ইংল্যাণ্ডের রাণী বলে ঘোষণা করুন। তাতে আপনার মঙ্গল হবে—'

এলিজাবেথ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, মেরী স্টুয়ার্টের এই প্রস্তাবের নেপথ্যে আছে স্পেন, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড এবং সারা ইউরোপের ক্যাথলিক সম্প্রদায়।

না। ভয় নয়। ভীত হওয়ার মানুষ এলিজাবেথ নন। দুশ্চিন্তা—দারুণ একটা দুশ্চিন্তা বিষাক্ত কীটের মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল—

মেরীর পিছনে আছে তিন তিনটি দেশ—ফ্রান্স, স্পেন, স্কটল্যাণ্ড। আছে ইউ-রোপের তাবোড় তাবোড় ক্যাথলিক রাজারা। আর তিনি ?

একা। একেবারে একা। একক একটি রমণী।

এলিজাবেথের জীবনের ঘনায়মান সঙ্কট প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার বলেছেন—

Catholic Earls of North, several powerful Catholic Kings, Mary and behind her European backers made a formidable Combination…কিন্তু যতই জোট বাঁধুক। এলিজাবেথ নির্ভর করলেন শুধু তাঁর বিধিপ্রদত্ত দুটো ব্রহ্মাস্ত্রের ওপরে—ক্ষুরধার বুদ্ধি আর বিস্ময়কর অভিনয় নৈপুণ্য।

মেরীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তাঁর চিঠির উত্তর লিখলেন। বিস্ময়কর সে চিঠি। ঘোরতর শত্রুকেও যে অমন মিষ্টি করে চিঠি লেখা যায়, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

'শোন মেরী, তোমার সম্বন্ধে যে যাই বলুক আমার পরে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর তো কাউকে দেখি না। তোমার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাদীক্ষায় আমার গভীর আস্থা আছে। তবে মেরী, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসতে হলে তোমাকে অবশ্যই কতকগুলো সর্ত মানতে হবে—ফ্রান্সের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব নয়। সদাসর্বদা ইংল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

আর দেখ মেরী, তোমার বয়স কম। দেখতেও সুন্দরী। আমার কানে এসেছে অনেকেই তোমাকে বিয়ে করার জন্য ঝুঁকেছে। কিন্তু সাবধান! এমন লোককে বিয়ে করবে যিনি ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় এবং প্রজারা যাঁকে সমর্থন করবে। আর তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমাদের স্কটল্যাণ্ডে ধর্মে একটা নতুনের হাওয়া এসেছে। সারা দেশ আলোড়িত হয়ে উঠেছে। দেখ—নতুন একটা আদর্শ একটা নতুন উদ্দীপনার হাওয়া যখন এসেইছে তখন তুমিও সেই বাতাসেই পাল তুলে দাও না। পুরানোকে আঁকড়ে ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে কেন ?'

এক চিঠিতেই থেমে গেল মেরীর তড়পানি। তিনি যাঁকে বিয়ে করবেন, তিনি অবশ্যই ক্যাথলিক তাঁকে ইংল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রজারা কখনো সমর্থন তো করবেই না। আর নতুনের হাওয়া অর্থে স্কটল্যাণ্ডে জন নক্সের প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা আন্দোলনকে সমর্থন করলে তো আর রক্ষা নেই। তাঁর অভিভাবক মহামান্য পোপ, ক্যাথলিক যাজক, দুঁদে ক্যাথলিক রাজা-মহারাজারা সবাই তো তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে চলে যাবে! হঠাৎ মেরীর মনে হলো—এসব প্রস্তাব—এসব সাংঘাতিক সর্ত দিয়ে এলিজাবেথ কি তাঁকে মৃত্যুফাঁদে ফেলে দিতে চায় ?

মেরী স্টুয়ার্ট কি করবেন না করবেন—সেটা পরের কাহিনী।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্রোত অনেক—অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছিল। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা হ্যাগনটসদের ভেতরে যে ধর্মযুদ্ধ বা সংঘাত শুরু হয়েছিল এবং সেই রক্তক্ষয়ী অন্তর্বিপ্লবে শুধু ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার জন্যই এলিজাবেথ যে খুব—খুব গোপনে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন সেখানেই নেমে এল এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

অতএব কারোরই কিছু করার ছিল না। ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বিদ্রোহীদের সাহায্যে এলিজাবেথের এই অভিযান যেমন বিপজ্জনক তেমনি ছিল ব্যয়বহুল। তারপরে আবার বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মত সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হলো তখন, যখন ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীতে মড়ক লাগল। বীভৎস আর ভয়াবহ সেই মড়ক। সপ্তাহে একশো থেকে তিন হাজার লোকের মৃত্যু হতে লাগল। কে কাকে কোথায় কবর দেবে সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সমস্যা।

বিপদ কখনো একা আসে না। তারা আসে গোরুর গাড়ির মত একটার পর একটা মিছিল করে। সেই খরযৌবনবতী অসামান্য রূপসী এলিজাবেথ যাঁর দীর্ঘ সুঠাম দেহে ছিল অটুট স্বাস্থ্যের আশ্চর্য সৌন্দর্য, যাঁরা সামান্য কোন অসুখবিসুখ কখনো কেউ দেখেনি সেই এলিজাবেথ—

এইখানেই বলা দরকার, রাণীর কি তাই বলে কখনো অসুখ করতো না? এইসঙ্গে তাঁর এক বিদগ্ধ মহিলা জীবনীকার লিখছেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী এলিজাবেথ তাঁর সাময়িক অসুস্থতাকে গোপন করতে চাইতেন বা স্বীকার করতেন না। বা বলা যায় ছোটখাটো অসুখকে তিনি আমলই দিতেন না। কিন্তু—

একবার এলিজাবেথ দাঁতের তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। নিশঃব্দে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সেই তীব্র ব্যথা সহ্য করছেন। নিথর স্তব্ধ ঘর থেকে শুধু থেকে থেকে ভেসে আসছে অব্যক্ত যন্ত্রণার অমানুষিক গোঙানি আর অস্ফুট আর্তনাদ—আঃ—উঃ—

একটু গরম জল দিয়ে কুলকুচো করুন হার একসেলেন্সি।

ডাক্তার ডাকবো?

এসব কথা তার সহচরীদের মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ একটা কথা বলার সাহস পেল না। পরিচারিকা এবং তাঁর সহচরীরা সবাই বাইরে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তারও দাঁত পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, দাঁতটা তুলে না ফেললে যন্ত্রণা

কখনো কমবে না। কিন্তু ডাক্তার হয়েও তাঁর ডায়গোনিসিসটুকু বলতে ভরসা পেলেন না।

আরো একবার। এলিজাবেথের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এমন ব্যথা হলো যে আঙুলটা নাড়াতে পর্যন্ত রীতিমত কষ্ট হতে লাগল।

কি ব্যাপার– কী বুঝছেন? অঙুলহাড়া?

রাণীর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না ডাক্তার। তেমন কিছুই নয়। আসলে একটু বয়স হলেই যা হয় বাত—স্রেফ বাত। কিন্তু সে কথা বলে কে রাণীকে, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে?

সুযৌবনা চিরকুমারী এলিজাবেথ কখনো স্বীকার করতেন না। করতে চাইতেন না তাঁর বয়সে ভাঁটার টান ধরেছে। যৌবনও বেলাশেষের পড়ন্ত রোদের মত ঝিকমিক করছে—এসব অত্যন্ত সাধারণ আর গতানুগতিক পরিণতি তাঁর মত রাণীর হবে কেন?

সেই এলিজাবেথ!

সেই এলিজাবেথকে আক্রমণ করল সাংঘাতিক বসন্ত রোগ। প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কেমন আচ্ছন্নের মত শয্যায় অবলীন হয়ে থাকতেন। সেই একবার—দীর্ঘ সত্তরটি বছর পাড়ি দেওয়া জীবনে মাত্র সেই একবার নিজের মুখে তাঁর এই কাল অসুখের কথা বলেছিলেন। 'মনে হতো যেন মৃত্যু এসে বাসা বেঁধেছে দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কী ব্যথা, কী অসহ্য যন্ত্রণা…

এই অসুখের সময়েই পথেঘাটে লোকের মুখে মুখে শুরু হয়ে গিয়েছিল চাপা গুঞ্জন—এলিজাবেথ আর কদিন? তারপর—এর পরে কে আসছেন?

সত্যিই তো এলিজাবেথের পরে কে বসবে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে, কে হবে তাঁর উত্তরাধিকারী? বয়সও ত্রিশ পেরিয়ে গেল। আর কি রাণী বিয়েই করবেন না— এই প্রশ্নই পার্লামেণ্টে উঠেছিল। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে এলিজাবেথ নিজেই পার্লামেণ্ট ডেকেছিলেন।

আপনি কি ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎকে গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে দিতে চান, পার্লামেণ্ট সদস্যরা বললেন, কেন আপনি বিয়ে করছেন না? আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন, নির্দিষ্ট কোন ওয়ারিশ না থাকলে সিংহাসন নিয়ে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। ইংল্যাণ্ডের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি তার ভবিষ্যৎ সব রসাতলে যাবে—

এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না।

তাঁর চোখে মুখে পাথরের দেবীপ্রতিমার মত কেমন নির্বিকার ঔদাসীন্য।

আমি যদি এই মুহূর্তে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্দেশ করে দিই, সুরেলা মধুর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন এলিজাবেথ, তাহলে কি আপনারা মনে করেন—হঠাৎ থেমে গেলেন, সদস্যদের প্রত্যেকের মুখের ওপর তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটোর খরদৃষ্টির ঝলক ফেলে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, কোন গৃহযুদ্ধ, কোন ষড়যন্ত্র হবে না? সব শান্তিতে মিটে যাবে?

সদস্যদের কারো মুখে একটা কথা নেই। কি বলবেন তাঁরা? নিজের গর্ভজাত সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে দাবীদার করা মানেই ডালপালা ছড়ানো রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আরও উত্তরাধিকার আসবে। অতএব আরো চক্রান্ত—আরো ব্যাপক গৃহযুদ্ধের পটভূমি রচিত হবে—

এলিজাবেথের স্কটল্যাণ্ডের দিকে সজাগ দৃষ্টির প্রহরা ছিল। তাঁর গুপ্তচরেরা মেরী স্টুয়ার্টের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এলিজাবেথের মনে হয়, সত্যিই তো তাঁর পরে কাকে ইংল্যাণ্ডের দায়দায়িত্ব দেওয়া যায়। সেরকম যোগ্য লোক কোথায় যে শুধু ইংল্যাণ্ডের মঙ্গলের দিকে সদাসর্বদা দৃষ্টি রাখবে।

মেরীর মুখখানা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। লেখাপড়াও জানে। এই মেয়ে যদি একটু বুদ্ধি করে ইংল্যাণ্ডরই কোন অভিজাতক বিয়ে করতো, তাহলে মেরীকে সিংহাসনের দাবিদার নির্দেশ করে দিয়ে যেতে তাঁর খুব সুবিধে হতো। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণও খুশি হতো।

এই প্রসঙ্গে একদিন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ এক সভাসদ মেইটল্যাণ্ডকে বললেন। মেইটল্যাণ্ড মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। থেমে থেমে কেমন ঝাপসা গলায় বললেন, দেখুন সবচেয়ে ভাল অভিজাত পাত্র তো ডাডলি—রবার্ট ডাডলী—আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মেইটল্যাণ্ড। আবার টেবিলে নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, অবশ্য এক সময়ে ডাডলীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতাই বেশি ছিল, হঠাৎ রাণীর কানের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই বললেন মেইটল্যাণ্ড, এক কাজ করুন না হার একসেলেন্সি—আপনিই আগে ডাডলীকে বিয়ে করুন। তারপর মারা যাওয়ার সময় স্বামী এবং সিংহাসন—দুটোই মেরীকে দিয়ে যাবেন—কি?

দপ করে যেন জ্বলে উঠলেন এলিজাবেথ। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন বিয়ে করবেন তিনি ওই খুনেটাকে? যাকে দেখলে

ইংল্যাণ্ডের প্রজারা নিদারুণ ঘৃণায় থুথু ফেলে তাকে তিনি কথনো বিয়ে করতে পারেন না ! জনসাধারণের অমতে মেরী টিউডরের মত বিয়ে করে খাল কেটে কুমীর আনতে তিনি রাজী নন—

ডাডলী !

রবার্ট ডাডলী। দীর্ঘ কন্দর্পকান্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় স্বর্গ থেকে বুঝি নেমে এসেছেন অ্যাপেলো। কিন্তু তাঁর অসামান্য রূপের ভেতরেই ছিল নিদারুণ অভিশাপ। অভিশাপ ছিল তাঁর বংশের প্রবহমান রক্তধারায়।

ম্যাডাম কি রাগ করলেন ?

আপনি এখন আসতে পারেন—ঝনঝন করে বেজে উঠল এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর।

অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর যিনি তার পুত্রবধূ জেন গ্রে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে প্রভুত্ব করার চক্রান্ত করেছিলেন সেই জন ডাডলী বা ডিউক অফ নর্দাম্বা-ল্যাণ্ডের পঞ্চম পুত্র এই—

রবার্ট ডাডলী !

ডাডলীকে ভালবেসেছিলেন এলিজাবেথ। মেরী টিউডরের রাজত্বে যখন তিনি লণ্ডন টাওয়ারের নির্জন কারাবাসে দিন কাটাচ্ছেন, সেই দুঃসময়ে ডাডলীই ছিলেন তাঁর একমাত্র বন্ধু। অবশ্য ডাডলীও ছিলেন তাঁর মত বন্দী হয়ে। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এলিজাবেথের বন্দীজীবনের বিস্বাদ বিবর্ণ দিনগুলো রঙীন হয়ে উঠেছিল।

ডাডলী তখন সাতাশ-আটাশ বছরের সুদর্শন যুবক আর তাছাড়া, অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র যখন ষষ্ঠ এডওয়ার্ড হয়ে সিংহাসনে বসলেন তখন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করতেন তাঁর পিতা নর্দাম্বারল্যাণ্ড। সেই সূত্রে রাজবাড়িতেই ডাডলীর আনাগোনা বেশি ছিল। সেই তখন থেকেই এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব।

সেই এলিজাবেথ !

রবার্ট ডাডলীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাল্যসখী—যে কথনো ঝড় দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবেন—এমন অসম্ভব স্বপ্নও কথনো দেখেননি। আর সেই সিংহাসনের পাশে তাঁরও বসার একটু সুযোগ হবে—এমন দুরাশাও মনের কোণেও ঠাঁই দেননি ডাডলী। কিন্তু—

সেই অবাস্তব স্বপ্ন এবং অসম্ভব সেই দুরাশা, দুটোই যখন সত্যি হয়ে গেল তখন ডাডলী যেন কেমন হয়ে গেলেন। এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে

হঠাৎ আনমনা হয়ে যান। চাপা বিষণ্ণতায় থমথম করে মুখখানা। কিসের যেন দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন।

এলিজাবেথ চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তাহলে কী ডাডলী খুশি নন? সিংহাসনে বসেই তো তাঁকে তাঁর দেহরক্ষী অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি বা মাস্টার অফ হর্সই শুধু নয়, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যও করে নিয়েছেন। তাঁর রাজসভায় যথেষ্ট উঁচু আসনটিই তাঁকে দিয়েছেন। থাকার বন্দোবস্তও করে দিয়েছেন রাজপ্রাসাদে। তাহলে ডাডলী বিমর্ষ কেন?

এলিজাবেথের মন ভারি—ভারি হয়ে ওঠে। ডাডলী কি জানেন না, বুঝতে পারেন না—তিনি তাঁকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন। ডাডলী কেন মুখ ফুটে বলছে না—কি হয়েছে, কেন তার মন খারাপ! কিন্তু তিনি নিজে তাকে কোন কিছু বলেন না। সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

এলিজাবেথ নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। হয়তো মন্ত্রী সভাসদদের সঙ্গে কোন আলোচনা করছেন কিম্বা পার্লামেণ্টের জরুরী কাগজপত্র দেখছেন, দূর থেকে তাঁর দিকে মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন ডাডলী।

উদগ্র যৌবনপুষ্ট দেহের কী অপরূপ সৌন্দর্য! ছোটবেলা থেকে দেখছে। তবুও ডাডলীর কেমন খটকা লাগে, ওঁর এত রূপ, এই অপার্থিব সৌন্দর্য কি যৌবনের? না ওঁর প্রখর বুদ্ধি আর মহিমাময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই ওঁকে অপরূপ করে তুলেছে!

ডাডলী আগের মতই নির্জন দুপুরে, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে এমন কি কোন কোন দিন গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ নিশুতি হয়ে গেলে যেমন এলিজাবেথের ঘরে আসতো, তেমনি আসে। কিন্তু কেন যেন আগের মত হাসিতে গল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতরে মাথাটা চেপে ধরে আদর করতে গেলে সরে যায়। মরাল যেমন সরোবর দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ঘরে পা দিয়েই ডাডলী উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাঁর ওপরে। আর বাইরে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বেড়ে যাওয়া রাত্রির প্রহরগুলো মধুর এক আবেশে আবিষ্ট হয়ে যেত।

সেই ডাডলী!

—তাঁর স্বপ্নের ডাডলী। গভীর রাতের নিরালায় তাঁর ঘরে এসে কেমন দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর চেতনা বিকল হয়ে গিয়েছে। তাঁর মনের ভেতরে কোথায় একটা বড় রকমের গোলমাল হয়েছে।

মনে মনে আহত হন এলিজাবেথ। এ অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে একেবারেই

নতুন। তবুও—তবুও প্রনয়ীকে কিছু বলেন না। তাঁর মর্যাদায় বাধে।

কিন্তু তাঁদের ভেতরে যাই হোক, যাই থাক, রাজপ্রাসাদের আনাচেকানাচে কিন্তু শুরু হয়ে যায় চাপা ফিসফিসানি।

—জানিস—ডাডলী প্রায়ই রাত্রে রাণীর ঘরে যান—

—সময় সময় রাণী নিজেও ডাডলীর ঘরে যান—

সেই কানে কানে বলা চাপা ফিসফিসানিই বেশ কিছুটা পাঁক বহন করে সরব এবং মুখরোচক গুজব হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শহরের পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে।

—আরে শুনেছো, আমাদের 'চিরকুমারী রাণী'। না কি মা হতে চলেছেন!

প্রধান পরিচারিকা কেটঅ্যাসলি একদিন এলিজাবেথের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাকুল হয়ে বললেন, দোহাই আপনার, বিয়ে করুন—বিয়ে করে এই নোংরা গুজবের* মুখ বন্ধ করুন, একটু থেমে আবার বললেন, আপনি এত বোঝেন, এত বুদ্ধি আপনার, আর এটা বুঝতে পারছেন না। প্রজাদের কাছে আপনার উঁচু মাথাটা কাটা যাচ্ছে।

কিছু বলেন না এলিজাবেথ। শুধু চোখে চিন্তার ছায়া নামে। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন—বিয়ে! হ্যাঁ, বিয়ে তো করতেই হবে।

দিন কাটে। রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে তাঁদের গোপন অভিসার।

রাণীর খাস পরিচারক খানসামারা অধৈর্য হয়ে ওঠে—আমাদের রাণী যে কি করছেন, কেন যে ডাডলী সাহেবকে বিয়ে করছেন না? দাঁড়াও বৎস—দাঁড়াও, সেই অষ্টম হেনরীর আমলের এক বহুদর্শী বৃদ্ধ ভৃত্য মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, আরে এসব রাজরাজড়ার ব্যাপার—তোদের মত ইতরজনরা এসবের কি বুঝবে রে? একটু থেমে পিচুটিমাখা চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে গুজগুজ করে হাসল। কুট করে বলল—ডাডলীরই বিয়ে করতে আছে মস্ত বাধা—

বাধা! কি—কি? সবাই একসঙ্গে তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

ক্রমশ—

---

* তখনকার ইংল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের সর্বত্র এই কলঙ্ক রটে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি রটনা একেবারেই গুজব? জানা যায় ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন থেকে এক ইংরেজ গোয়েন্দা জানিয়েছিলেন, আর্থার ডাডলী নামে ২৬।২৭ বছরের এক ছোকরা নিজেকে এলিজাবেথের জারজ পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছে। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তাকে রাজসভায় আশ্রয় দেন এবং দৈনিক ছ ক্রাউন বরাদ্দ করেন।

(Dictionary of National Biography—Vol. 6. P. 115)

একদিন ডাডলী আর পারল না। নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। এলিজাবেথের হাত দুটো ধরে যেন তীব্র একটা যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে সহ্য করতে করতে অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি—আমি আর পারছি না—

বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ বিদ্যুৎচমকের মত বুঝতে পারলেন ডাডলী কি বলতে চান। একটু মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, কি পারছো না ডাডলী—

এই চোরের মত লুলিয়ে লুকিয়ে আসা--এই লুকোচুরি খেলা—আমাদের প্রেস্টিজের।

তাহলে কি করতে চাও—বিয়ে? বলেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন এলিজাবেথ। তাঁর আকস্মিক হাসির জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আওয়াজের মূর্ছনায় কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠল স্তব্ধ ঘরটা।

সেদিনের পর থেকে ডাডলী যেন আরও কেমন হয়ে গেলেন। সদাসর্বদা কিসের যেন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। কোন কোন সময় তাঁকে দেখে মনে হয় কোন একটা নিদারুণ বিষের জ্বালা নিয়ে সরীসৃপের মত কোন রহস্যময় আর সর্পিল পথে চলেছেন। আবার কখনো কখনো কারো কারো নজরে পড়ে যায় প্রাসাদের বিশাল অলিন্দের দূর কোণে কি কার্নিশের আড়ালের অন্ধকারে ধূর্ত একটা অভিসন্ধির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন সম্রাজ্ঞীর নয়নের মণি, তাঁর প্রণয়ী—

ডাডলী!

ডাডলীর প্রতি গভীর প্রেমে এলিজাবেথ এমন মোহবিষ্ট হয়ে থাকতেন যে তাঁর রহস্যময় গতিবিধি তাঁর মনের কোন কোণে এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলতো না। এই হয়—এই নিয়ম। ভালবাসলে তাকে কখনো সন্দেহ করা যায় না।

ডাডলীকে দেখলেই এলিজাবেথ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতেন। শুধু আদর আর প্রেম ভালবাসার কূজনেই প্রহরের পর প্রহর পেরিয়ে রাত গভীর হতো।*

অবশেষে এল সেইদিন!

১৫৬০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এমন এক রহস্যময় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যা না ঘটলে হয়তো ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিতান্তই সাদামাটা, অত্যন্ত সাধারণ এক

---

* 'ডাডলীর প্রতি রাণী এলিজাবেথের প্রগাঢ় প্রেম তিনি নিজে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের বহু লোক তা বিশ্বাস করতো'—এই উক্তি করেছেন এক দেশীয় বিদগ্ধ জীবনীকার।

সম্রাজ্ঞীকে পেতো, কিন্তু কখনোই পেতো না স্বর্ণযুগের স্রষ্টা, রেনেসাঁসের বরপুত্রী মহিমাময়ী এলিজাবেথকে !

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হওয়ার আগে ডাডলী চলে এসেছিলেন রাজপ্রাসাদে। তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তাঁর মনের গহনে একটা আনন্দ যেন নিঃশব্দে মোমের মত গলে গলে পড়ছে।

ইতিহাসে আছে সেই রাত্রে তাঁদের প্রণয়লীলার বাসর বসেছিল উইণ্ডসরের প্রাসাদে। তাঁরা দু'জন যখন প্রেম ও নিশিযাপন করছিলেন, যখন ফুটফুটে চাঁদের আলো বুকে নিয়ে নিষুতি রাতের পৃথিবী স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল সেই সময় ডাডলীর বাড়ি থেকে ভৃত্য ছুটে এসে খবর দিয়েছিল—নিদারুণ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন।

ডাডলী এসে দেখলেন, একটা খাড়া সিঁড়ির নিচে পড়ে রয়েছে তাঁর হত-ভাগিনী স্ত্রী অ্যামি রবসার্টের প্রাণহীন দেহ।

দুর্ঘটনা? আত্মহত্যা? কোনটাই নয়। খুন—নিছক খুন—লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়া গেল না!

এখন বলা দরকার ডাডলী আঠারো বছর হতে না হতে বিয়েটা সেরে ফেলে-ছিলেন। কিন্তু সেই পর্যন্তই! তাঁর দুর্ভাগিনী স্ত্রী অ্যামিকে না দিয়েছেন ভালবাসা না সন্তান।

তারপরে তাঁর বাল্যবান্ধবী এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে বসলেন, তাঁকে বিয়ে করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলেন রবার্ট ডাডলী। কিন্তু তখন ইংল্যাণ্ডে এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ আইন অনুসারে ছিল অবৈধ। তাই তাঁর পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দীফিকির খুঁজছিলেন। কোন ঐতিহাসিকের মতে এলিজাবেথের প্রতি স্বামীর গভীর আসক্তি দেখে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছেন অ্যামি রবসার্ট। আবার কেউ বলেছেন রবার্ট ডাডলীই এলিজাবেথকে বিয়ে করার দুর্বার লোভে অ্যাণ্টনী ফরেস্টার নামে একটা লোক দিয়ে খুন করিয়েছিলেন স্ত্রীকে।

ডাডলী অবশ্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়ে-ছিলেন। যাই করুন জনসাধারণ কিন্তু ডাডলীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিদ্বেষে জ্বলে উঠল। আর রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং অভিজাতরা তাঁকে কোনকালেই পছন্দ করতেন না। তাঁর স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুতে ডাডলীর বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ এবং ঘৃণা আরও উগ্র হয়ে উঠল।

এলিজাবেথ ঠিক সময়ে মনের রাশ টেনে ধরলেন।

ডাডলীর এই দুর্নামের পর এলিজাবেথের মত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মেয়ের পক্ষে তাঁকে বিয়ে করা অসম্ভব হলো। আরও বড় কথা জনজীবনের গতি-প্রকৃতি জরিপ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাই জনমতের বিরুদ্ধে বিয়ে করায় পাত্রী আর যেই হোক এলিজাবেথ নন! জনসাধারণের অমতে তাঁর দিদি মেরী ফিলিপকে বিয়ে করে তাঁর নিজের এবং রাজ্যের যে সর্বনাশা সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছিল তা তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কাছে আগে দেশ—দেশের স্বার্থ—দেশের মানুষ—আগে রাজনীতি! তারপর নিজের চিন্তা—নিজের স্বার্থ—বিয়ে স্বামী ঘর সংসার সন্তান। হুহু করে উঠল তাঁর বুকের ভেতরটা। মনে ভেসে উঠল ডাডলীর সেই খাপখোলা তলোয়ারের মত ধারালো দীর্ঘ ঝকঝকে চেহারাটা। পরনে বর্ণাঢ্য পোশাক। চলনেবলনে দুরন্ত স্মার্ট। আর যখন কার্নিভালে (কোন আনন্দোৎসব) ঘোড়ার পিঠে অবধ্য লক্ষ্যে বর্শা ছুঁড়ে যুদ্ধের অভিনয় করতেন তখন ডাডলীকে মনে হতো—মনে হতো আকাশ থেকে নেমে এসেছে রণনিপুণ কোন দেবদূত। তাঁর শরীর অবশ হয়ে যেত। বিকল হয়ে যেত তার স্নায়ুগুলো!

সেই ডাডলী—তাঁর স্বপ্নের ডাডলী।

তাঁকে বিয়ে করার লোভে খুন করে বসল স্ত্রীকে! এত নিচে নেমে যেতে পারল! এ কি তাঁর প্রতি ডাডলীর প্রগাঢ় প্রেম, উত্তাল ভালবাসা? না, তাঁর ভাই ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের আমলের রিজেন্ট, অনেক কুকীর্তির নায়ক ডাডলীর বাবা ডিউক অফ নর্দাম্বাল্যাণ্ডের মতই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপরে লোভ? তাঁর সাতাশ বছরের এই কুমারী জীবনে অনেক—অনেক পুরুষ দেখেছেন তিনি। পুরুষদের প্রেম ভালবাসার আড়ালে ওত পেতে বসে থাকে কঠিন স্বার্থের কালো বিড়াল।

আর এক ডিউক—ডিউক অফ সামারসেট বা সেমুর তাঁর বাপের বয়সী হলেও তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁর কানে ভালবাসার গুঞ্জন তুলেছিলেন। তাঁর উঠতি বয়সের পুরন্ত দেহটাকে নিয়ে বেশ লোফালুফিও করেছিলেন। তাঁর আড়ালেও ছিল সেই দুর্বার লোভ, তাঁকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে প্রভুত্ব করা।

না না দু নৌকোয় পা দেওয়া ঠিক নয়। কোন অবিবাহিত সম্রাজ্ঞার বিয়ে করা কখনোই উচিত নয়। দৈববাণীর মত তাঁর কানে বেজে উঠল অভিষেকে শোভাযাত্রায় সেই বৃদ্ধের উক্তি—অষ্টম হেনরীকে স্মরণ করুন—প্রতি মুহূর্তেই তো পিতাকে স্মরণ করছেন। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই তিনি দেশের স্বার্থে—রাজ-নীতির স্বার্থে তিনি নিজের জীবনে তিলে তিলে নিঃশেষে উৎসর্গ করবেন! না,

বিয়ে তাঁর জন্য নয়! তাঁর বুকে ঠেলে ঠেলে উঠল কান্নার ঢেউ। চোখ দুটো ফেটে জল এসে পড়ল।

হার একসেলেন্সি আমার একটা অনুরোধ ছিল, বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী এবং এলিজাবেথের রাজত্বের অসামান্য সাফল্যের রূপকার সেসিল নম্র বিণীত কণ্ঠে বললেন রবার্ট ডাডলী সম্বন্ধে একটু সতর্ক হন এবার।

সেসিল একা নন। সেদিন তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সাস্কেস, হাম্সডন, ডর্সেট প্রমুখ রাজ্যের বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিরা।

—আরে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নামের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন গীর্জা থেকে সোনাদানা সব লুটে নিয়েছিল—সেই ডিউক অফ নর্দাম্বাল্যাণ্ডেরই রক্ত তো ডাডলীর শরীরে!

—কি করেননি ডিউক, চার্চের জমি আত্মসাৎ করে গীর্জাকে ঘোড়ার আস্তাবল করা থেকে শুরু করে মুদ্রা জাল পর্যন্ত করেছিলেন।

—ছেলেও বাপেরই মত দুর্নীতিপরায়ণ নিষ্ঠুর লোভী অসৎ—

সব চুপ করে শুনলেন এলিজাবেথ।

একটা কথাও বললেন না। শুধু চাপা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর ধারালো মুখখানা। অস্ফুটস্বরে শুধু বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—।

কিছুদিন পরেই ইংল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো। স্তব্ধ হয়ে গেল জনসাধারণের রসালো আলোচনা। সম্রাজ্ঞী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—তিনি বিয়ে করবেন না—

কিন্তু আশ্চর্য—সেই প্রেম! প্রেম ভালবাসা, মনে হয়, যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়ে যায় তা কখনো যায় না নিঃশেষ হয়ে। সেই ঘটনার পরেও ডাডলীর প্রতি এলিজাবেথের বন্ধুত্ব বা ভালবাসা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ডাডলীর মত দুর্নীতিপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও লোভী মানুষ শুধু ভালবাসায় সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? কি করেছিলেন—কি হয়েছিল জানা যায় না। ইতিহাসে শুধু আছে 'ডাডলির ঔদ্ধত্যে রাণী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আর ডাডলীকে উদ্দেশ্য করেই জনসমক্ষে করেছিলেন সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তি—I will have here but one mistress and no master এই কথাটি ডাডলীর প্রতি প্রযুক্ত হলেও তার অর্থ ছিল ব্যাপক অর্থাৎ রাণী চিরকুমারী থাকতেই সঙ্কল্প করেছিলেন।'

এবার আবার এলিজাবেথের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তুললেন স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী

স্টুয়ার্ট। তিনি বিয়ে করে বসলেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি তাঁর মাতৃকুলের দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। অতএব এই বিয়ের ফলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপরে দাবি আরও বাড়ল।

পাত্রের নাম—ডার্নলী। বয়সে মেরীর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। দেখতেও ছোটখাটো। প্যাকাটির মত সরু সরু পায়ের ওপরে রোগা দেহটা নড়বড় করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা অল্পবয়সী রোগা ছেলে বুঝি হেঁটে যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য স্কটল্যাণ্ডের প্রগোতিশীল ধর্ম আন্দোলনের নেতা জন নক্স এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই বিয়েতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু হা হা করে ছুটে এসেছিলেন মহামান্য পোপ, এসেছিল ফ্রান্স, তারা সমর্থন করেছিল এই বিয়ে।

এলিজাবেথ একেবারে গোড়া থেকেই এই বিয়ের বিরোধী ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন—বিরোধীদের গোপনে সক্রিয় সাহায্য করবেন। কিন্তু—

কিছুই করতে হলো না এলিজাবেথকে। লাস্যময়ী মেরীর উচ্ছলতা, তার কালো ডাগর চোখ দুটোর দৃষ্টিতে আমন্ত্রণের হাতছানি সব মিলিয়ে তার উদ্বেল যৌবনই তাকে অক্টোপাশের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে সর্বনাশের অতল অন্ধকারে তলিয়ে দিয়েছিল।

মেরীর মত উদগ্র যৌবনবতীর রোগশীর্ণ ডার্নলীকে কখনো ভালো লাগবে না —ভালোবাসতে পারবে না—সেটাই তো স্বাভাবিক। অতএব তাঁদের মাঝখানে এল ডেভিড রিজিও ইতালীর এক সঙ্গীত শিল্পী। কিন্তু মেরী তাঁকে তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সুবাদে রিজিওর সঙ্গে মেরীর মাখামাখি এমন বেড়ে গেল সেটা শোয়ার ঘর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল।

ত্রিভুজ প্রেমের যা নিয়ম—যা হয় তাই হলো। ডার্নলী হিংসায় জ্বলে যেতে যেতে রিজিওকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত পাকাপাকি করে ফেললেন।

ওদিকে খবর পাওয়া গেল মেরী স্টুয়ার্ট সন্তানসম্ভবা। আর সেই সন্তানের পিতা ডার্নলী নন—রিজিও—ডেভিড রিজিও! এই বিশ্বাসটা শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, সারা ইউরোপেই বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রচলিত ছিল। মেরীর এই পুত্র ষষ্ঠ জেমস যখন প্রথম জেমস নাম নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেছিলেন তখন ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী রঙ্গ করে বলেছিলেন আহা ডেভিড রিজিওর ছেলে যখন তখন সে তো রাজা সলোমান—বলা যেতে পারে আধুনিক সলোমন।

ওদিকে ডার্নলী অস্থির হয়ে উঠলেন। ডেভিড তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাকে সরাতে না পারলে তার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। কবে—কবে—সেদিন

আসবে ? নিদারুণ অস্থিরতায় তার হাত দুটো নিসপিস করতে থাকে।

স্কটল্যাণ্ডের রাজঅন্তঃপুরে ঘনায়মান নাটকটির খবর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মন্ত্রী সেসিল আগেভাগে জানিয়ে দিলেন এলিজাবেথকে।

খুশিতে দুলে উঠলেন এলিজাবেথ।

অবশেষে এল সেইদিন—ডার্নলীর পরমাকাঙ্খিত সেইদিন।

৯ মার্চ, ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামল। খাবার টেবিলে বসেছিলেন মেরী স্টুয়ার্ট, পাশে তার প্রণয়ী ডেভিড রিজিও। বেশ জমিয়ে দুজনে গল্প করছেন। হঠাৎ—

একেবারেই হঠাৎ ডার্নলী জুতো মসমসিয়ে ঘরে এল। তার সঙ্গে একটা খ্যাপাটে চেহারার লোক। তার হাতে ঝকমক করছে ধারালো একটা ছোরা।

সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে গেল রিজিওর শরীরের রক্ত। সে ভয়ে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল—মেরী আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—ওরা আমাকে খুন করতে এসেছে—খুন—বলতে বলতে মেরীর আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করল।

কিন্তু ডার্নলী আর তার ভাড়াটে ঘাতক রুথভেন রিজিওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। বার দুয়েক তীক্ষ্ণ একটা আর্ত চিৎকার আর অমানুষিক গোঙানির শব্দ শোনা গেল। তারপর—সব চুপ।

শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল বাড়ির চারদিকে।

কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা রিজিওর রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন মেরী। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আগুনঝরা চোখে ডার্নলীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল—নির্মম ও ভয়ঙ্কর এক প্রতিশোধের স্থির সঙ্কল্প।

এল ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯শে জুন মেরীর পুত্র ষষ্ঠ জেমস ভূমিষ্ঠ হলেন। মেরীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর এলিজাবেথের মুখে চেপে নেমে এল অন্ধকার। মেরীর সন্তান আছে—পুত্র সন্তান। অতএব তার ভবিষ্যৎ আছে। আর তার ? এখন পর্যন্ত বিয়েই হয়নি। স্বামী নেই, পুত্র নেই। ধু ধু রুক্ষ, অনুর্বর এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মত যে জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, সেখানে শুধু নিঃসীম শূন্যতা।

বিয়ে করুন—উত্তরাধিকারী দিন—

আবার পার্লামেণ্টে এই দাবী সোচ্চার হয়ে উঠল। সদস্যরা শালীনতা বিসর্জন দিয়ে আক্রমণাত্মক ভাষায় উত্তপ্ত বক্তৃতা করলেন, কী ভেবেছেন আপনি। সিংহাসন দখল করে বসে আছেন, অথচ দেশকে তার ভবিষ্যৎ কর্ণধার দেবেন না ?

এলিজাবেথ এইবার ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। রেগে গিয়ে বললেন, আমি কুমারী বলে রাজ্যশাসনে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা কি এসেছে? কোথাও কোন ত্রুটি কি করেছি? কোথাও কারো ওপরে কি অবিচার-অত্যাচার করেছি? তাহলে কেন-কেন—বার বার আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিয়ে এত হৈচৈ? কেন—কেন? একটু থেমে হাঁফাতে হাঁফাতে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন—বিয়ে আমি করবো—নিশ্চয়ই করবো—

কিন্তু বিয়ে করবো করবো বলে তিনি স্পেন, ফ্রান্স এবং তথা সারা ইউরোপ-কেই মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করতে পেরেছেন, সক্ষম হয়েছেন ইংল্যাণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে। অতএব বিয়ে না করে থাকাটাও যে মস্তবড় রাজনীতি—এই সত্যটি এলিজাবেথ উপলব্ধি করেছিলেন অনেক—অনেক আগে। ব্যক্তিগত সুখ তাঁর কাম্য ছিল না। তাঁর স্বপ্ন—তাঁর সাধনা ছিল—রাজনৈতিক সাফল্য— ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি।

আবারও বলতে হয় এই মহিয়সী মহিলা রেনেসাঁসের বরপুত্রী এলিজাবেথের বুদ্ধির প্রখরতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়।

তাঁর বিয়ে নিয়ে পার্লামেণ্টে তুমুল হট্টগোলের পরেই এলিজাবেথ তাঁর সভাসদ এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে এমন করে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন, এমন একটা ভাব দেখালেন যেন মেরীর সদ্যজাত পুত্রটিকে ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই—

ওয়ারিশের ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হলে পার্লামেণ্ট চুপ করে যাবে প্রজারাও উচ্চবাচ্য করবে না। আর ক্যাথলিক মা মেরী স্টুয়ার্টের পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হবে বলে ক্যাথলিকরা খুশিতে উল্লসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু—

এলিজাবেথকে এসব কিছুই করতে হল না। স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী স্টুয়ার্টের শিথিল চরিত্র, কুটিল এবং গোপন স্বভাব এবং তার বিবিধ সর্বনাশা দুষ্কৃতি এলিজাবেথের ভাগ্যে দেখা দিয়েছিল আশীর্বাদ হয়ে।

সেই রিজিও ডেভিড আর মেরীর অবৈধ প্রণয় নিয়ে যেমন স্কটল্যাণ্ডে বহুদিন ধরে গুলতানি চলেছিল তেমনি আবার সেখানকার বাতাসে নতুন এক গুঞ্জন শোনা গেল মেরী আর তাঁর স্বামীর সম্বন্ধ নিয়ে।

—শুনেছো রাণী না কি ডার্নলীর সঙ্গে কথা বলে না। একসঙ্গে শোয় না পর্যন্ত—

—বলছো কি, তাহলে ডিভোর্স করছে না কেন?

—শোনা যাচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদে রাণীরই আপত্তি বেশি। ডিভোর্স হয়ে গেলে

তো ছেলেটার কোন বৈধ সত্তাই থাকবে না—

সত্যিই তাই। ডার্নলীকে দেখলেই মেরীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠতো। নিঃশব্দে দূরে সরে যেত। কিন্তু ডিভোর্স করেনি। তাহলে যে তার ছেলের ইংল্যাণ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ডের কোন সিংহাসনের ওপরেই অধিকার থাকবে না। অতএব তীব্র বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা আর নিদারুণ একটা প্রতিহিংসার জ্বালার এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েই মেরী স্বামীর ঘর করতে লাগলেন।

মনে হয় ডার্নলীকে শায়েস্তা করার জন্যই লাস্যময়ী মেরী স্টুয়ার্ট কাছে টানলেন আর এক পুরুষকে—বথওয়েল—আর্ল অফ বথওয়েল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় খুব স্মার্ট, কিন্তু আসলে চালিয়াত। চালবাজী বড় বড় কথা—খিস্তি আর খেউড়ের একেবারে শিরোমণি। এই বথওয়েলকে নিয়েই মেরীর বাসরে শুরু হলো নতুন এক লীলাবিলাস।

ডার্নলী নিঃশব্দে মাথার চুল ছেঁড়ে। মনের দুঃখে হাওয়া বদলানোর কথা বলে পাড়ি দিলেন গ্লাসগোতে। সেখানকার রাজপ্রাসাদে বিরহী যক্ষের মত একা বাস করছেন।

একেবারেই হঠাৎ মেরী চলে এলেন। হাসি হাসি মুখে স্বামীর কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ কি হলো তোমার? বিস্মিত ডার্নলীর মুখে ক্লিষ্ট হাসি ফুটল। আমি—আমি তোমার ওপর অনেক—অনেক অবিচার করেছি সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত গলায় বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জলও এসে পড়ল।

ডার্নলী বিহ্বল।

তার চেতনার ভেতরে অদৃশ্য সেতারের মধুর ঝঙ্কার একটানা বেজে যেতে লাগল। তীব্র আবেগে মেরীর নিটোল হাত দুটো নিজের বুকের ওপরে খুব জোরে চেপে ধরে যেন মিষ্টি একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল রাণী—আমার আদরের মিষ্টি রাণী—বলতে বলতেই স্ত্রীর গালে বহুদিন—বহুকাল পর এক দীর্ঘায়ত তপ্ত চুম্বন এঁকে দিল।

ভাবে ভালবাসায় দিনগুলো যেন খুশির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে লাগল। এসে পড়ল সাল ১৫৬৭।

মেরী স্বামীকে নিয়ে চলে গেলেন এডিনবরায়। ডার্নলীকে আরও সুস্থ আর সতেজ করে তুলতে হবে। এই শহরের জলে বাতাসে আছে সেই বিচিত্র সঞ্জীবনী শক্তির দাক্ষিণ্য। আশ্চর্য, স্বামীর স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্য যখন মেরী এত কাণ্ড করছেন তখুনি দিনে একটা করে প্রেমপত্র লিখছেন বথওয়েল।

যৌনগন্ধী উত্তেজক আর রগরগে তার ভাষা। এদিকে স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের সীমা নেই মেরীর। সারা এডিনবরা শহরের এমাথা থেকে ওমাথা চুঁড়ে খুঁজে খুঁজে তার পছন্দসই একটা বাড়ি নিলেন মেরী স্টুয়ার্ট। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। বেশ নির্জন আর নিঝুম পরিবেশে গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে একটানা ঝমর ঝমর শব্দে যেন আসন্ন কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়।

ডার্নলী, কী চমৎকার বাড়ি—দেখেছো। মেরী খুশিতে গলে গলে পড়ে—এখানে তোমার শরীর তিনদিনে সেরে উঠবে।

ডার্নলী কথা বলে না। বলতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসায় আর শ্রদ্ধায় শুধু চোখ দুটো অবাধ হয়ে ওঠে। কিন্তু মেরীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ডার্নলী খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারতো—হাসিটা কুটিল হাসি। তার ভেতরে অনেক জ্বালা!

এই নতুন বাড়িতে এসে হাস্যোচ্ছল মেরী তাঁর স্বামীর প্রতি আরও মনযোগী, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না ডার্নলীকে। আশ্চর্য একটা মধুর অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে যায় ডার্নলীর মন।

এইখানেই থামলেন না মেরী। হঠাৎ একদিন স্বামীর বুকে মাথা রেখে গুনগুন করে আদর আর ভালবাসার কথা বলতে বলতেই ঝপ করে তার হাতটা টেনে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন মেরী। কি ব্যাপার। আংটি!

আমি যে তোমাকে কী গভীরভাবে ভালবাসি এটা তার অভিজ্ঞান—গদগদ হয়ে ডার্নলী কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাঁর শুকনো ফাটা ফাটা বেগুনী ঠোঁটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাছরাঙা পাখির মত মেরীর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটো!

অবশেষে এল—এসে পড়ল সেইদিন—৯ ফেব্রুয়ারী।

এই দিনটি কিন্তু এসেছিল যেমন দিনের পর দিন আসে। না, কোথাও ছিল না এতটুকু অস্বাভাবিকতা, ছিল না কোন ব্যতিক্রম। সেদিন সকাল থেকে ডার্নলীর দিন বড় আনন্দে কেটেছিল। মেরী সারাদিনই স্বামীর কাছে কাছে থেকে হেসে হেসে কত যে অফুরন্ত কথা বলেছিল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল। রোজ যেমন বসে। খেতে বসেও ওদের কথা আর ফুরোয় না। গল্পের তোড়ে ওরা খাবার মুখে তুলতেও ভুলে যায়।

দিন শেষ হয়ে আসে। চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। বাড়ির চারদিকে সারি সারি জ্বলন্ত মশাল বসিয়ে দিয়ে চলে যায় মশালচিরা। বাতাসে মশালের

ছায়া কাঁপা আলোয় বাইরের অন্ধকার যেন আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

ডার্নলী মেরীকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন এমন সময় বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়েই চলে এলেন মেরী।

তুমি এসে গিয়েছো! চল—বেরোনো যাক—পরম স্নেহে মেরীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন ডার্নলী, অনেক দিন তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয়নি—

কিন্তু আমাকে যে এখুনি একবার হলিয়ুডে যে যেতে হবে ডার্নলী—কেমন বিব্রত মনে হল মেরীকে। ঝাপসা আর অস্পষ্ট গলায় বলল—আমি যাবো আর আসবো—তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি—বলেই বাইরের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন স্টুয়ার্ট।

রাত দশটা বেজে গেল।

মেরী কিন্তু ফিরলেন না। চিন্তিত হলেন ডার্নলী। খাটে বসে দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে একমনে মোহময়ী স্ত্রীর কথাই ভাবতে লাগলেন ডার্নলী এই স্ত্রীকেই ভুল বুঝে কুপিয়ে কুপিয়ে একেবারে খুন করে ফেললেন একটা নিরীহ মানুষ রিজিওকে। অনুশোচনার গ্লানিতে নিঃশব্দে দাবদাহের মত জ্বলে যেতে লাগলেন ডার্নলী।

দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলল। মেরীর কথা ভাবতে ভাবতেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন ডার্নলী। ঘুমের ঢেউ এসে মেরীর মুখখানাকে কোথায় কোন অজানা দেশে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বিলুপ্তব্যাপ্ত আকাশ, যাকে বলা যায় উদার অনন্ত নীল গগন। যতদূর চোখ যায় কাশফুলের মত সাদা সাদা সেই মেঘের রাজ্য পাড়ি দিয়ে চলেছেন ডার্নলী। চলেছেন কোন সুদূর অজানা এক স্বপ্নের রাজ্যে। তার কণ্ঠলগ্না হয়ে আছেন তার প্রিয়তমা তন্বী সুন্দরী পত্নী—মেরী—তার মেরী।

দুম্—দুম্—হঠাৎ রাত্রির প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো। ভয়ানক একটা বিস্ফোরণে সেই সুদৃশ্য বাংলো বাড়িটা একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেল।

পরদিন সকালে দেখা গেল, বাগানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ডার্নলীর প্রাণহীন দেহটা। মেরী এসে স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝাপসা ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, কোন্ দুর্বৃত্ত যে আমার এই সর্বনাশ করল! একটু থেমে আবার অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, ভাগ্যিস আমি ছিলাম

-না, তাহলে আমারও তো এই দশা হতো—

মেরীর অভিনয়টা নিখুঁতই হয়েছিল। না, কোথাও ছিল না এতটুকু ত্রুটি। কিন্তু—তাঁর অনবদ্য অভিনয়ও কিন্তু চাপা দিতে পারল না সেই নিষ্ঠুর আর নির্মম সত্য—কোন দুর্বৃত্তের বোমার বিস্ফোরণ নয়, ডার্নলীকে খুন করা হয়েছিল। তার গলায় ছিল পাঁচটা আঙুলের নীলচে দাগ। আর খুনটা করিয়েছিলেন টিউডর যুগের বহু রোমাঞ্চকর অঘটনের লাস্যময়ী হাস্যোচ্ছল নায়িকা—

মেরী স্টুয়ার্ট।

স্কটল্যাণ্ডের দিকে দিকে ধিক্কার উঠল—তাড়াও—তাড়াও—বেশ্যাটাকে তাড়াও। ওর ছেলেটাকে রেখে দিয়ে ওকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও—

মেরীর এই অপযশ—এই কলঙ্কে এলিজাবেথ খুশিতে দুলে উঠলেন। শত্রু লোকচক্ষে হেয় হলো এবং ক্যাথলিকরা যে মেরীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানোর স্বপ্ন দেখছিল—সেটাও কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল বলে এলিজাবেথের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। যা শত্রু পরে পরে।

কিন্তু মেরী স্টুয়ার্ট রাজেন্দ্রাণী। তার দেহের রক্তধারায় বহমান পুরুষানুক্রমিক রাজবংশের ঐতিহ্য—লোকের কথায় দমে যাওয়ার পাত্রী নন তিনি। যে প্রেমাস্পদের জন্য পথের কাঁটা ডার্নলীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ে করে ফেললেন সেই বথওয়েলকে। দেরী করে ফেললেন না এতটুকু।

মেরী কিন্তু এত করেও সুখী হলেন না। বথওয়েলের মনের ভেতর থেকে তার প্রতি সেই দুর্বার প্রেমের অনুভূতির বাষ্পটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। তার মনে সন্দেহ বাসা বাঁধল—যে মেয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে—

মেরীর বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের বিক্ষোভ আরও তীব্র—আরও উত্তাল হয়ে উঠল। তারা সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল—ডার্নলীর হত্যাকারী বথওয়েলের শাস্তি চাই—তার মৃত্যু চাই—

শুরু হল রক্তাক্ত সংঘর্ষ। একদিকে মেরী বথওয়েলের অনুরাগীদের দল আর একদিকে দেশের জনসাধারণ। বথওয়েল হেরে গিয়ে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু মেরীকে বন্দী করা হলো স্কটল্যাণ্ডের কুখ্যাত কারাগার লচভেনে।

তাতেও সন্তুষ্ট হলো না স্কটল্যাণ্ডের প্রজারা। তারা সমবেত কণ্ঠে দাবী জানালো—বেশ্যাটাকে বাঁচতে দেওয়া চলবে না—ওকে পুড়িয়ে মারো—সৈন্যরা সেই বিক্ষোভের সামিল হলো।

শেষ পর্যন্ত মেরীকে বলা হলো—তাঁর শিশুপুত্র জেমসকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি রাজ্যপাট ত্যাগ করুন—আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।

প্রখর বুদ্ধিমতী, বহুদর্শী এলিজাবেথ, স্কটল্যাণ্ডের লীলাচঞ্চলা নায়িকা মেরী স্টুয়ার্টের রোমাঞ্চকর নাটকটি তীব্র কৌতূহল নিয়ে তীব্র চোখে লক্ষ্য করছিলেন। আর তাঁর মনে চিন্তার প্রবাহ তোলপাড় করছিল—ঠিক এই সময় স্কটল্যাণ্ডের গোলমালে তাঁর হস্তক্ষেপ করা কি সঙ্গত হবে? আর স্কটল্যাণ্ডের এই ঘটনায় ফ্রান্সেরই বা কি মনোভাব হবে—আর কী চোখেই বা দেখবে স্পেন!

এমন সময় তাঁর কাছে খবর এল—ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ডের অভিজাতদের জানিয়েছেন জেমসে তার হাতে তুলে দিলে তাদের সাধ্যমত সাহায্য করবে।

কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন মেরী স্টুয়ার্ট।

গরাদে মাথা রেখে ভাবেন, আর কি কোন উপায়ই নেই। সত্যিই কি স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে! একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

তখনও বয়স মেরার উদ্দাম যৌবন এবং অতুলনীয় রূপরাশিকে এতটুকু গ্রাস করতে পারেনি। তখনো—তখনো তার চেহারায় ছিল সেই মোহময় লাবণ্য, তখনো তার বড় বড় ডাগর দুটো নীলাভ চোখের কটাক্ষ জগৎসংসার টলিয়ে দিতে পারতো।

অতএব মেরী তার সেই চোখেই আমন্ত্রণের হাসি মাখিয়ে কারারক্ষকের দিকে তাকালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাবির ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারাগারের লোহার দরজা খুলে গেল। মেরী পালিয়ে গেলেন।

তখনো মেরীর অনুরাগী যেসব বন্ধুবান্ধব ছিল তাদের নিয়ে তিনি শেষবারের মত তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু লঙসাইডের যুদ্ধে কোথায় তলিয়ে গেলেন মেরী। বেশ বুঝতে পারলেন, আর স্কটল্যাণ্ডে তাঁর ঠাঁই হবে না—তাঁর পিতৃভূমির একবিন্দু ধূলিকণার ওপর পর্যন্ত তিনি অধিকার হারিয়েছেন। না! আর এখানে নয়! এবার অন্য হাটে—

মেরী ঘোড়ার পিঠে উঠেই চাবুক কষলেন। ঝড়ের বেগে ছুটল ঘোড়া। কত ছোট ছোট নদী, কত প্রান্তর পেরিয়ে চলে এলেন সলওয়েতে। সলওয়ে ছাড়িয়ে স্কটল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে পা দিলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে।

এলিজাবেথের জীবনেও ঘনিয়ে এল সত্যিকারের রাজনৈতিক সঙ্কট।

॥ আঠারো ॥

এলিজাবেথ বেড়াতে বেরিয়েছেন।

চলেছেন খোলা পালকিতে। রক্তলাল ভেলভেটের পোষাকের ফ্রেমে তার সুঠাম তন্বী দেহ অগ্নিশিখার মত জলজল করছে। তাঁর সঙ্গে চলেছেন তাঁর পাত্র মিত্র পরিষদ অনুরাগী ভক্তের দল। সেই রাজকীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা চলেছে হোয়াইট হল থেকে রিচমণ্ডে, সেখান থেকে হ্যাম্পটন কোর্ট অথবা উইণ্ডসর.

রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক জনতা। তাদের কারো হাতে রঙ-বেরঙের ফুলের স্তবক, কারো হাতে সুদৃশ্য কেক—আরও কতরকমের শ্রদ্ধার উপহার। এলিজাবেথ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তাদের উপহার গ্রহণ করেই মিষ্টি হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছেন—ভাল আছেন তো? শারীরিক কুশল তো?

প্রজারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সম্রাজ্ঞীর দিকে। একী মানবী—না স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন করুণার প্রতিমূর্তি কোন দেবী। বলুন—বলুন—নির্ভয়ে বলুন, আবার তাঁর সেই নিটোল পেলব হাতের বিপুল সৌন্দয মেলে ধরে গানের সুরের মধুর কণ্ঠে বলেন, কার—কি অসুবিধা আছে—কী অভিযোগ আছে—সব—সব বিনা দ্বিধায় বলুন—নির্ভয়ে বলুন—মনে রাখবেন আমি—আমি আপনাদের একান্ত আপনজন—কেউ একটা কথা বলে না।

বলতে পারে না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, অভয়দাত্রী সম্রাজ্ঞীর দিকে। আর একটু একটু করে কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যায়। তাদের ঘোর কাটতে কাটতে সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা বহুদূরে এগিয়ে যায়।

এই ছিলেন এলিজাবেথ।

এই তাঁর রাজনীতি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জল এবং স্বাতন্ত্রমণ্ডিত—যেটা ছিল পুরোপুরিই এলিজাবেথীয়—প্রজাদের আনুগত্যের ওপরেই নির্ভর করে রাজশক্তির ভিত্তি। সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে শুধু হুকুম আর নির্দেশ দিলেই হবে না—জনসাধারণের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে—সেই যুগে সেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একমাত্র তাঁর সমসাময়িক মোগল বাদশাই মহামতি আকবর ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভূখণ্ডের তথা ইউরোপের আর কোন রাজা বা রাণীর এই মহৎ ও দূরপ্রসারী উপলব্ধি ছিল বলে মনে হয় না। আর সেইজন্যেই তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন স্বনামে স্বতন্ত্র একটা যুগ—

এলিজাবেথীয় যুগ।

শুধু তাঁর মন্ত্রী, সভাসদ নয়—সমস্ত মানুষেরই মন জয় করে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া বা স্নেহধন্যা হওয়ার আশ্চর্য যাদু জানতেন তিনি। একবার তাঁর মিছিল চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার?

শহরের লোক রাণীকে সংবর্ধনা দেবে। মঞ্চে এলেন সেখানকার স্কুলের এক প্রবীন শিক্ষক। কিন্তু ল্যাটিনে লেখা অভিভাষণ পাঠ করতে করতে যখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন তখন এলিজাবেথ কিন্তু এতটুকুও বিরক্ত হলেন না। কোন ব্যঙ্গ কি তা ছলোর হাসিও দেখা গেল না তাঁর মুখে। বরং বারবার বলতে লাগলেন—পড়ুন—আপনি পড়ুন—পড়ে যান ভয়ের কি আছে?

অনেকবার ঠেকে কেশে তোতলামি করে যেই পড়া কোনরকমে শেষ হলো অমনি এলিজাবেথ উচ্ছ্বসিত সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমি এমন সুন্দর অভিভাষণ কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না—

আর এক জায়গায় রাণীর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। আঠাশ ফিট লম্বা টেবিলে একশো ছটি ডিশে একশো ছ রকমের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী রাণীরই পারিষদ-দের একজন প্রতিটি খাবার চেখে দেখার জন্য এগিয়ে এলেন। যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে খাবারে বিষ দিয়ে থাকে—সেটা পরীক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

না—না—ওসব করতে হবে না—প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানালেন এলিজাবেথ। কেমন অন্তরঙ্গ মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনারা আমাকে এত আদর করে ও সম্মান দিয়ে খেতে দিয়েছেন, সেই খাবারে বিষ থাকবে আমি কল্পনাই করতে পারি না, একটু থেমে আবার বললেন এই খাবার পরীক্ষা করে তারপর খাবো—এত নীচতা আমি কিছুতেই দেখাতে পারবো না—

বিস্ময়ে ছটফট করছে উদ্যোক্তাদের চোখ।

আবার যেন অনেক—অনেক দূর থেকে কেমন উদাস আর মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে বললেন, আপনাদের যে প্রীতি, যে স্নেহ আমার জীবনের পরম সম্পদ তাকে আমি কিছুতেই অপমান করতে পারবো না—কিছুতেই পারবো না—

উপস্থিত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা মুহূর্তের জন্য কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন।

ঘোর কেটে যেতেই সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—

জয়—রাণী এলিজাবেথের জয়।

আমাদের সম্রাজ্ঞী— দীর্ঘজীবী হন।

সকলেই অবাক হয়ে দেখল, এলিজাবেথের বড় বড় নীলাভ চোখ দুটো জলে টলমল করছে।

বেড়াতে ভালবাসতেন এলিজাবেথ।

তাই এমনি করেই বেড়াতে বেরোতেন। রাণী তাঁর প্রজাদের দেখবেন। নিজেকে দেখবেন। সকলের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের খোঁজ নিয়ে প্রতিকার করবেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা শুভেচ্ছা সফর হলেও তার গূঢ় উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল রাজনৈতিক এক দূরপ্রসারী একটি অভীষ্টসিদ্ধি—দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করে তাঁর রাজত্বের ভিতটাকে মজবুত করে তোলা।

হয়েওছিল তাই।

সার্থক হয়েছিল তাঁর এই অভিলাষ। সিংহাসনে বসার মুহূর্তে যে রাজ্য ধর্ম আন্দোলনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগে টলমল করছিল সে রাজ্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেননি—দৃঢ় নিরাপত্তা দিয়ে তাকে সুখের ও শান্তির এবং ইউরোপের একটি অগ্রগণ্য শক্তিশালী দেশ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর রাজত্ব পরিচালনায় ছিল আরো একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। এলিজাবেথ ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয়। নিত্যি নতুন ফ্যাসানের জমকালো পোশাকে নিজের যৌবনোদ্ধত তনুদেহটিকে সাজাতে ভালবাসতেন। দেশদেশান্তরের হীরে জহরত মণিমুক্তার অলঙ্কারের প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিল তীব্র। কিন্তু আশ্চর্য নিজের বিলাসব্যসন কি নিয়মিত রাজকীয় পরিভ্রমণে রাজকোষ থেকে ব্যয় করতেন না একটি কপর্দকও! তিনি কোনও না কোন সভাসদ কি মন্ত্রীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করতেন। বলা বাহুল্য তাঁরা রাণীর প্রসাদ ও অনুগ্রহ আরও বেশী করে পাওয়ার প্রত্যাশায় দু হাতে অকাতরে খরচ করতেন। কিম্বা যে নগরে পরিভ্রমণ করতে যেতেন সেখানকার নাগরিকদের চাঁদায় রাণীর রাজকীয় শোভাযাত্রার এবং তাঁর সংবর্ধনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহণ করা হতো।

এলিজাবেথ দেশকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবেসেছিলেন। চেয়েছিলেন প্রজাপালন করতে। তাই রাজনীতিতে তিনি শান্তি আর সৌহার্দ্যের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যুদ্ধে শুধু লোকক্ষয় এবং অর্থের অপচয় ছাড়া আর কোন সুরাহা হয় না। তাই তাঁর সুদীর্ঘকালের শাসনে তাঁর ইংল্যাণ্ডকে সর্বনাশা বড় রকমের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বীভৎসতা থেকে সতর্ক প্রহরায় আগলে রেখেছিলেন। তাই তাঁর রাজকোষে কখনও অর্থের অনটন হয়নি।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা এলিজাবেথের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছেন—এত কম খরচে, এত কম টাকায় বিপুল গৌরবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তিনি রাজ্য চালালেন কি করে? রাজত্বের প্রথম বছরে আয় মাত্র দু'লক্ষ পাউণ্ড। ফ্রান্স ও স্পেনের তুলনায় কত কম। তবুও এলিজাবেথ সেই সামান্য আয়ে সব রকমের ব্যয় বহন করেছেন। ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নিয়মিত টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন আর তাঁর রাজত্বের

অন্তিমপর্বে স্পেনীয় আর্মাডার মত শক্তিধর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন—সেই যুদ্ধের রণনৈপুণ্যে সারা জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধও হয়েছে।

কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?

এলিজাবেথের প্রখর ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধিই ছিল তাঁর সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি।

রাজ্যপাট তো এলিজাবেথ বেশ ভাল চালাচ্ছিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাচ্ছিল আসল বিষয়টা—রাণীর বিয়ে। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও এমন অপরূপ যৌবনশ্রী, দীর্ঘ সুঠাম তনুতে এমন অটুট স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য তবুও বিয়ে নিয়ে এমন টালবাহানা করছেন কেন? তাহলে কি তাঁর আপাতসুন্দর মজবুত দেহের গোপনাঙ্গেই কোন গোলমাল আছে!

আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন? ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে বলে বসলেন, রাণীর ইয়ে—মানে আসল জায়গাটার সব ঠিকঠাক আছে তো?

কি বলতে চান আপনি? চিকিৎসকের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

সন্তান ধারণের কোন অসুবিধা নেই তো? সসংকোচে বললেন রাষ্ট্রদূত, সাংঘাতিক কোন কারণ না থাকলে তিনি বিয়ে নিয়ে এমন টালবাহনা করছেন কেন?

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রাণীর ডাক্তার বললেন, আমি বাজি ধরে বলতে পারি—আমাদের রাণীর কম করে দশ ছেলের মা হওয়ার ক্ষমতা আছে—তাঁর দেহ নীরোগ—স্বাস্থ্য অটুট।

কিন্তু আসল গোলমাল তো এলিজাবেথের দেহে নয়, মনে। তাঁর বিয়ে, ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—নারীজীবনের চিরন্তন স্বপ্ন—স্বামী-সংসার-মাতৃত্ব—সবকিছুর উর্ধ্বে তিনি স্থান দিয়েছিলেন দেশ—তাঁর পিতৃপিতামহের জন্মভূমিকে। ইংল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি—ইংল্যাণ্ডের কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা—একমাত্র ব্রত। কিন্তু মনের ভেতরের এসব কথা কাউকে খোলাখুলি বলার পাত্রী এলিজাবেথ নন। তাই দেশের নিরাপত্তা বা রাজনীতির খাতিরে তাঁকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসা পাত্রদের কাউকেই সরাসরি যেমন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, তেমনি কাউকে কথাও দিতে পারলেন না। ফলে তাঁর বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন বেড়েই চলল।

টিউডর যুগের রঙ্গিনী নায়িকা মেরী স্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ডে আসার পর থেকে এলিজাবেথের বিয়ে নিয়ে সেই গুঞ্জন ক্রমশ সরব হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বলা বাহুল্য তার আড়ালে আছে মহামতি পোপ তথা ক্যাথলিকদের ষড়যন্ত্র। এলিজাবেথকে হটিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে মেরীকে বসানোর চক্রান্ত ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

—আপনি—হার একসেলেন্সি এত বুদ্ধিমতী, এলিজাবেথের এক সভাসদ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিস্টার একদিন বলেই ফেললেন, এটা কেন বুঝতে পারছেন না, মেরী স্টুয়ার্টের সন্তান আছে—সেই ছেলে জেমসেরই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিকারও আছে খুব ন্যায্য এবং জোরালো। মেরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোপ থেকে শুরু করে স্পেনের রাজা ফিলিপ পর্যন্ত ফন্দীফিকির করছে আপনাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামানোর—আপনি যদি—যদি এখনও বিয়ে না করেন তাহলে—এলিজাবেথের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না লিস্টার।

একটা কথাও বললেন না এলিজাবেথ। মনের গভীরে ডুব দিলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল ইউরোপের মান চত্র। স্পেনের স্পর্ধা অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। স্পেনকে দাবিয়ে রাখতে হলে ফ্রান্সকে কাছে টানতে হয়। আর স্পেনকে ঢিট্ করার একটা সুযোগও এসে গেছে। উত্তর নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্টরা স্পেনীয় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে। সেই বিদ্রোহের আগুনটাকে জীইয়ে রাখতে হবে। গোপনে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে হবে আর দেখতে হবে নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের লাভজনক বাণিজ্যিক সম্বন্ধটা যেন চিড় না খায়—

কি এত ভাবছেন হার ম্যাজেস্টি ?

বিয়ে আমি করবো মিঃ লিস্টার—এলিজাবেথের মুখে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ হাসি ঝিকাঝকিয়ে উঠল—আপনি বিয়ের প্রস্তাব করে ফ্রান্সে দূত পাঠান এখুনি—আজই—

ফ্রান্স উল্লসিত হয়ে উঠল।

ফরাসী দেশের রাজকুমারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাণীর বিয়ে হলে ইঙ্গ-ফরাসী সখ্যতাবন্ধন আরও দৃঢ় হবে। স্পেনও তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস করবে না। কিন্তু—

ফ্রান্সের হাসি আর উল্লাসের কণ্ঠরোধ করে একেবারে স্তব্ধ করে দিলেন পাত্র ক্যাথরিন ডি মেডিসির দ্বিতীয় পুত্র আঁজু স্বয়ং। তিনি বেঁকে বসলেন। চোখে ঘৃণার ধিক্কার জ্বেলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—আমি গোঁড়া ক্যাথলিক হয়ে কিনা ওই নচ্ছার প্রোটেস্ট্যাণ্ট মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করবো ?

এবার এলিজাবেথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব হলো আঁজুর ছোট ভাই ডিউক অফ অ্যালেনকনের। মোটা থপথপে চেহারা। গোল আর নাদুসনুদুস শরীর। তার ওপর আবার সারা মুখে দুর্দান্ত বসন্ত রোগের বীভৎস ক্ষত।

কিন্তু এলিজাবেথ তো পাত্রের চেহারা নিয়ে মোটে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কেননা সত্যি সত্যি তো আর তাকে বিয়ে করছেন না। বিয়ে করবো করবো বলে ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নেবেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রজারা কেন রাণীর কাউন্সিলের সভারা এবং একান্ত অন্তরঙ্গজনরাও কিন্তু জানতে পারল না এলিজাবেথের মনের ভেতরের গোপন অভিসন্ধিটা। রাণী

বিয়ে করবেন শুনে তাঁরা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

হোক—কুমারী রাণীর বিয়ে হোক—স্বামী হোক—সন্তান আসুক—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক—কিন্তু—

তবুও—তবুও কাউন্সিলে চিন্তার ছায়া নামল ব্যাপারটা কেমন যেন হচ্ছে—রাণীর এখন পঁয়তাল্লিশ আর ফ্রান্সের যুবরাজের বয়স যে মোটে পঁচিশও পেরোয়নি। কেমন বেমানান মনে হচ্ছে না? আর এই বয়সে বিয়ে—সন্তান! সন্তানের প্রসবে রাণীর জীবনের ভয় আছে না? চিকিৎসকের মতামত জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, না রাণীর জীবনের কোন আশঙ্কা নেই। তাঁর শরীরের গঠন অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক এবং নিখুঁত—

অ্যালেনকনের চেতনা কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। তার দিবানিশির একটাই স্বপ্ন—এলিজাবেথ! ইংল্যাণ্ডের রাণী রূপসী বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ সিংহাসন আলো করে বসে আছেন। তাঁর পাশেই তিনি বসেছেন। ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড—দু-দুটো দেশের ওপর তাঁর প্রভুত্ব করার অনাগত আলোকোজ্জ্বল দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিন্তু কবে—কবে কতদিন পরে এলিজাবেথের সেই উদ্দাম যৌবনের সরসীতে মরালের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন? অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতা তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দেয়।

প্রথমে নিজে না গিয়ে বন্ধু সিমারকে পাঠালো এলিজাবেথের কাছে—উদ্দেশ্য কেমন করে প্রেম নিবেদন করা যায় এলিজাবেথকে এবং তাঁর মনটাকেও সেই সঙ্গে জরীপ করে আসা আর সিমার এসব ব্যাপারে মানে মেয়েমানুষের মন মজাতে খুবই নাকি পটু।

সত্যিই তাই। সিমার এলিজাবেথের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল। আর মাত্র এক সপ্তাহের ভেতরে তার প্রভুর কাছে এলিজাবেথের প্রীতির নিদর্শন—একটি রুমাল ও একটা টুপিও পাঠিয়ে দিল। কিন্তু—

অ্যালেনকনের মন এই উপহারে ভরল না। রুমাল-টুপি দিয়ে কি হবে? কতক্ষণে আর কতদিন পরে থরযৌবনা এলিজাবেথের সেই সুঠাম দেহবল্লরীকে তার কবোষ্ণ সান্নিধ্যের ভেতরে পাবেন আর বুকের ভেতর জাপটে ধরে চুমোয় চুমোয় একেবারে আচ্ছন্ন করে দেবেন। তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুনের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। একেবারে বদ্ধ উন্মাদের মতই একটা কাণ্ড করে বসলেন।

সিমারের সঙ্গে এক অপরিচিত যুবককে দেখা গেল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করছে! রাত্রি যেই গভীর হলো অমনি সে একেবারে ঢুকে পড়ল এলিজাবেথের ঘরে। আর তার ছদ্মবেশের নকল দাড়িগোঁফের জঙ্গল খুলে ফেলেই সে খপ করে এলিজাবেথের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলল, অপরাধ নিও না—আমি ডিউক অফ অ্যালেনকন, তোমাকে না দেখে থাকতে

পারিনি, তাই—

এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না।

খরচোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন অ্যালেনকনকে। মুখে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন থাকলেও এবং দেহে কিছুটা মেদের আধিক্য থাকলেও তারুণ্যের আলোয় তার চেহারায় বেশ একটা জৌলুস ও সজীবতা আছে।

এলিজাবেথের মুখে এবার সেই মোহনী হাসি ফুটল। প্রশ্রয়ের হাসি। আমন্ত্রণের হাসি। আলতো করে অ্যালেনকনের চিবুক স্পর্শ করে বললেন, কে বলে তুমি কুৎসিত, আমার চোখে তুমি সুন্দর—তুমি সুশ্রী—তুমি উজ্জ্বল—

সত্যি—সত্যি বলছো ; উত্তেজনায় আনন্দে থরথর করে কাঁপতে লাগল অ্যালেনকন। দ্রুত এলিজাবেথের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরম আবেগে নিচু হয়ে সে হাতে তাঁর ঠোঁট স্পর্শ করল।

সেই শুরু। তের দিন, তের রাত ধরে তাঁরা প্রেমভালবাসার উত্তাল নদীতে ডুবে রইলেন। দুজনে মুখোমুখি বসে শুধু কথা আর কথা। কত গুঞ্জন, কত হাসি, কত উচ্ছ্বাস, কত শপথ, কত প্রতিশ্রুতি, কত উপহার দেওয়া নেওয়া দিয়ে ভরা তাদের উদ্দাম ভালবাসার ছন্দোস্থরভিত মুহূর্তগুলো দ্রুত—অতি দ্রুত মহাকালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেল। ঘানয়ে এল অ্যালেনকনের বিদায়ের দিন।

সিমার জানিয়েছেন যাওয়ার আগের দিন অ্যালেনকন শুধু নাকি দুহাতে বুক চেপে ধরে ঘন ঘন বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। আর বার বার বলেছিলেন এলিজাবেথকে না দেখে কি করে থাকবো—কেমন করে বাঁচবো—

রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এলিজাবেথের হাত দুটো বুকের ভেতরে চেপে ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল, অ্যালেনকন—বল বল—আর কয়েকদিন পরেই তোমার দেখা পাবো প্রিয়তমে—বলো—তুমি—তুমি আমার হবে—বলো বলো—

একটা কথাও বললেন না এলিজাবেথ।

বলতে পারলেন না। অ্যালেনকনের সেই অস্থির ব্যাকুল বিপর্যস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেই প্রথম সত্যি সত্যিই ব্যথিত হলেন এলিজাবেথ। না, অভিনয় নয়, কপটতা নয়। বেদনার কালো ছায়া নেমে এল তাঁর সেই ধারালো মুখে। আর দুটো বড় বড় নীলাভ চোখের কালো তারায় তারায় ঘনবর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করে উঠল। বুকের ভেতরে পাক দিয়ে উঠল নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ। তার গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল। সেমুর···ডাডলী···আরও কত পুরুষ তাঁকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিল কিন্তু সে তাদের প্রত্যেককে নির্মমভাবে বঞ্চনা করেছে—করেছে—করতে হয়েছে। কেন—কেন যে অষ্টম হেনরীর কন্যা হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন আর কেনই বা ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী হয়েছিলেন কেন—কেন ?

তুমি কিছু বলছো না—কিছুই কি বলবে না ?

তুমি—তুমি কোন চিন্তা করো না অ্যালেনকন, বুকের ভেতরের হু-হু করা কান্নাকে কোন রকমে সংযত করে কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা কণ্ঠে বললেন এলিজাবেথ,

আমি—আমি তোমাকে ভালবেসেছি—ভালবেসে ফেলেছি অ্যালেনকন—

দেশে ফিরে গিয়ে অ্যালেনকন পর পর সাতটি চিঠি লিখেছিল। প্রতিটি চিঠিই যেন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে লেখা। আর একই আকুতি একই উচ্ছ্বাস —বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরের এপার থেকে আমি—আমি তোমার দুটি পায়ে চুম্বন করছি…এই পৃথিবীতে। আমি—আমি তোমার বিশ্বস্ততম ক্রীতদাস…

রাণী এলিজাবেথ।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের রহস্যময়ী, চিরযুগের প্রহেলিকা—রূপকথার ফোয়েনিক্স (Phoenix) পাখির মতই মৃত্যুলোকের পরপার থেকেও তাঁর অসামান্য প্রভাব শত শত বছরের সীমানা পেরিয়ে আরও—আরও দূর অনাগতকালে প্রসারিত হয়ে যায়—সেই রূপসী প্রখরব্যক্তিত্বশালিনী এলিজাবেথের মনের কাছাকাছি এসেছিলেন অ্যালেনকন।

স্বপ্ন নেমেছিল অ্যালেনকনের চোখে।

আর এলিজাবেথ ?

ইতিহাসে স্পষ্ট আভাস আছে যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে প্রেমের অভিনয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত এলিজাবেথেরও রাজনীতির জগদ্দল পাথর চাপা পড়া মনের ভেতর থেকে নাকি সেই চিরন্তন বাসনা উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু—

রাণীর কাউন্সিলে ঝড় উঠল—ফ্রান্সের ক্যাথলিক যুবরাজের সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না—অসম্ভব! সেই সঙ্গে জনমতও উগ্র হয়ে উঠল —এত ক্ষুরধার বুদ্ধিমতী রাণী এলিজাবেথ তাঁর দিদি মেরার মত মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছেন কি করে? মেরী স্পেনের রাজা ফিলিপের গলায় মালা দিয়ে দেশের কী সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, দুঃখদুর্যোগের দিনগুলোর কথা তো তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

তাছাড়াও আরও বিপদ বাধল। নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের যে এলিজাবেথ গোপনে সাহায্য করছেন, সেটা স্পেনের নৃপতি ফিলিপ জানতে পারলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নেদারল্যাণ্ডসে ইংল্যাণ্ডের রমরমা ব্যবসার কিছু কাত করিয়ে এলিজাবেথকে জব্দ করার জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে লাগলেন।

স্পেনকে নিয়ে এলিজাবেথ যখন খুব চিন্তিত তখুনি তাঁর কাছে খবর এল, ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান আয়ারল্যাণ্ড থেকে পোপ না-কি তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাচ্ছেন। তখন বাধ্য হয়েই তাকে ফ্রান্সের দিতে তাকাতে হলো।

হ্যাঁ। মেরীর নিরবিচ্ছিন্ন শত্রুতা, পোপ এবং স্পেনের চক্রান্ত থেকে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করতে হলে তাকে তাকাতে হবে ফ্রান্সের দিকে—বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে হবে। অ্যালেনকনের দিকেই—যতই তাঁর কাউন্সিলে যুক্তিতর্কের ঝড় উঠুক না কেন…

অতএব অ্যালেনকনের কাছে এলিজাবেথের সাদর আমন্ত্রণ-এল। উল্লাসিত হয়ে উঠল অ্যালেনকন। তাঁর বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিনী বাজতে লাগল। এতদিনে নিশ্চয়ই এলিজাবেথ মনস্থির করে ফেলেছেন—এইবার তাকে বিয়ে করবেন—

যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ইংল্যাণ্ডে এল অ্যালেনকন। বিয়েটিয়ে সম্বন্ধে একটা কথাও তাকে বললেন না এলিজাবেথ। তার হাত টেনে নিয়ে আলতো করে চুমু খেয়ে আদর আর ভালবাসার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে পাঠিয়ে দিলেন নেদারল্যাণ্ডস অভিযানে। যাত্রাপথেই অ্যালেনকন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এলিজাবেথ অফুরন্ত প্রেম-প্রীতিতে ভরা একটা মিষ্টি চিঠি লিখলেন অ্যালেনকনকে ···দেখ রাজনীতির জটিল বেড়াজাল ছিন্ন করে তোমার আমার বিয়ে হয়তো সম্ভব নয়—কিন্তু জানবে আমার দেহ মন এবং আমার সমস্ত সত্তা তোমাতেই সমর্পিত—

এই চিঠির কথাগুলো অ্যালেনকনের মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে তীব্র একটা প্রেরণা সঞ্চারিত করে দিল। সে আরও উৎসাহিত হলো—এই চিঠির সঙ্গে এলিজাবেথ তাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পাঠিয়েছেন—

কিন্তু অ্যালেনকন ইংল্যাণ্ড থেকে বহু—বহুদূরে সেই নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার কাজে আর মন স্থির করতে পারল না। হুট করে এসে উপস্থিত হল ইংল্যাণ্ডে।

এলিজাবেথ তাঁকে দেখে বিস্মিত হলেন। মনে মনে ক্ষুব্ধও হলেন। কিন্তু তাঁর মনের ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আদর ভালবাসার নিপুণ ছলাকলা দিয়ে একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে দিলেন অ্যালেনকনকে। তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, বলো—বলো—প্রিয়তম কথা দাও—তোমার দেশ ফ্রান্স স্পেনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে থাকবে?

যে সমস্ত সত্তাই একেবারে ঢেলে দিয়েছে ইংল্যাণ্ডের রাণীকে সে আর কি বলবে—কিই বা বলার থাকতে পারে। যে কোন কঠিন শপথ, যে কোন দুরূহ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সে শুধু চায় সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীর প্রেম! তাই অ্যালেনকন এলিজাবেথের হাত দুটো নিজের বুকের ভেতরে চেপে ধরে কেমন নিশিপাওয়া মানুষের মত অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বলল, আমি—আমি যতদিন যতকাল বেঁচে থাকবো ততদিন ফ্রান্স তোমার দেশকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে প্রিয়তমে। তোমার বিপদে সবসময় পাশে থাকবে আমার দেশ···

এইভাবে এলিজাবেথ ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন করে স্পেনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আর এই সরল নিরীহ এবং তাঁর প্রেম অভিলাষী যুবরাজকেই রাজনৈতিক দাবা খেলার গুটি করে তিনি নেদারল্যাণ্ডসকেও স্পেনবিরোধী এক শক্তিশালী চক্র করে গড়ে তুললেন।

স্পেনকে নিয়ে ইদানীং এলিজাবেথের আশঙ্কা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল।

কারণ স্পেনের রাজা ফিলিপ ইতিমধ্যে পর্তুগালের সিংহাসনটাও পেয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন—কেউ বুঝতে পারতো না, কি তিনি ভাবছেন—কখন কাকে দিয়ে তিনি কী করাচ্ছেন অনেক সময় তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরাও তাকে বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারতো না।

তাঁর বিদেশনীতি তথা অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সাফল্যের প্রধান কারণই ছিল—তিনি কখনো চট করে কিছু বলতেন না। চিন্তা না করে হুট করে কোন কাজ করতেন না। যে কোন অতি সামান্য সমস্যাতেও তিনি বহু সময় নিয়ে অনেক ভেবে তবে সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এতটা ভাবতেন বলেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন—অ্যালেনকনকে বিয়ে করলেই তাঁর রাজনীতির খেলার রহস্যটা ধরা পড়ে যাবে। তখন বহু চেষ্টা করেও আর দাবা খেলায় বাজিমাৎ করতে পারেন না। অতএব—

অতএব অ্যালেনকনের সঙ্গে শুধু প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে যেতে হবে। তাকে বিয়ে করতে পারবেন না। না—কিছুতেই না—মুহূর্তের জন্য তাঁর বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল। আর কতদিন কতকাল তাঁকে এই প্রণয় আর অনুরাগের অভিনয় করে যেতে হবে। মানুষটাকে যে তিনি সত্যি ভালবেসেছিলেন। কিন্তু—

না। কোন উপায় নেই। কোন গত্যন্তর নেই। তাঁর প্রেমের চেয়ে তাঁর দেশ অনেক—অনেক বড়। কিন্তু—

বড় আশ্চর্য। যখন এলিজাবেথের মনের ভেতরে এই যুদ্ধ চলছে তখুনি হোয়াইটহলে এক প্রকাশ্য বর্ণাঢ্য সভায় ফ্রান্সের রাজদূত এবং আরও অনেক বিশিষ্ট লোকের উপস্থিতিতে তিনি নিজের আংটি খুলে অ্যালেনকনের আঙুলে পরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন—অ্যালেনকনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে—তিনি ফ্রান্সের যুবরাজের বাগদত্তা—

অ্যালেনকন উল্লসিত। অভিভূত। একেবারে নিশ্চিন্ত—প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছেন এলিজাবেথ স্বয়ং। নিশ্চয়ই তা আর নড়চড় হবে না। অতএব এবার অ্যালেনকন স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার নেদারল্যাণ্ডসে পাড়ি দিলেন।

শোনা যায় অ্যালেনকনকে বিদায় দিয়ে এসে রাণী এলিজাবেথ নাকি অনেক অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। তারপর - তারপর আর কি?

লণ্ডন থেকে নেদারল্যাণ্ডস। নেদারল্যাণ্ডস থেকে লণ্ডন। চিঠি লেখালেখি শুরু হল। রাণীর চিঠি পেয়ে অ্যালেনকন উন্মত্ত। রাণী উল্লসিত অ্যালেনকনের চিঠি পেয়ে। এলিজাবেথ অনেক ভেবে খুব সুন্দর করে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন—তার প্রত্যেকটি চিঠি স্পেনের বিরুদ্ধে গাইডেড মিসাইল হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্পেনকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে এই ছিল এলিজাবেথের ইঙ্গ-ফরাসী নীতি—

শত্রুকে জব্দ করার জন্য যদি কাউকে একটু আদর উচ্ছ্বাস দেখাতে বা একটু প্রেমভালবাসার ছলাকলা দেখাতে হয়, তাতে দোষের কি। তাতে তো টাকা খরচ

নেই। সৈন্য ক্ষয়ও নেই—

বলতেই হয়, এলিজাবেথের সফল রাজনীতিতে তাঁর কুমারী জীবন আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অ্যালেনকন কিন্তু হল্যাণ্ডের অ্যাণ্টওয়ার্প দখল করতে গিয়ে হেরে পালিয়ে চলে গেল। তার কয়েকদিন পরই এলিজাবেথের কাছে এল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ—অ্যালেনকন তীব্র জ্বরে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

এলিজাবেথ কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। না—অভিনয় নয়। এইবার তিনি সত্যিই কেঁদেছিলেন। কারণ, অ্যালেনকনই ছিল তাঁর জীবনের শেষ পুরুষ, যাঁকে বিয়ে করে তাঁর স্ত্রী হতে পারতেন, পারতেন সন্তানের মা হতে।

এলিজাবেথের বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল—রাজনীতিরই জয় হোক—হৃদয়ের অনুভূতি, ভাব ভালবাসা—সব—সব মিথ্যা—

এবার সেই মেরী।

ফ্রান্সের রাজবধূ, স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী স্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ডেই বসে পোপ এবং স্পেনের ক্ষমতাশালী রাজা ফিলিপ ও ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজবংশীয় ডিউকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলেন।

সেই চক্রান্তের আভাস পেয়ে গেলেন এলিজাবেথ হঠাৎ একটি আশ্চর্য ঘটনায়—একদিন ভরদুপুরে এক গোবেচারী দাঁতের ডাক্তার ঘুস দিয়ে সীমানা পেরিয়ে এল ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু লোকটা ভুল করে সীমান্ত রক্ষীদের ক্যাম্পে তার চশমাটা ফেলে গেল। আর সেই হল কাল!

চশমার খাপের ভেতরে ভাঁজ করা একটি চিঠি। চিঠিতে ছিল এলিজাবেথের বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। এই রকমের আরও কতগুলো মারাত্মক চিঠি এলিজাবেথের অতি দক্ষ মন্ত্রী ওয়ালসিংহ্যামের হাতে পড়ে গেল। তিনি দেখলেন, চিঠিগুলো আসছে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে স্কটল্যাণ্ডের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে। তিনি সব চিঠিগুলোর কপি রেখে আবার খামে ভরে সীল করে যেমন যাচ্ছিল তেমনি পাঠিয়ে দিলেন স্কটল্যাণ্ডে।

সেই দাঁতের ডাক্তার সেজে থাকা লোকটার নাম—ফ্রান্সিস থ্রকমর্টন। মেরীর গুপ্তচর। তাকে খোঁজ করে গ্রেপ্তার করা হল। আর তাকে ধরতে গিয়ে পুলিস পেয়ে গেল একটা কাসকেটের ভেতরে এমন কিছু অত্যন্ত জরুরী এবং গোপন কাগজপত্র, যা স্পেনের দূতকে পাঠানো হচ্ছিল। সেই সব রেকর্ডের ভেতরে ওয়ালসিংহ্যাম দেখলেন—ইংল্যাণ্ডের কতগুলো বন্দরের নাম। আরও জানা গেল বিদেশী ক্যাথলিক সেনাবাহিনী এইসব বন্দর আক্রমণ করে ইংল্যাণ্ডকে ভেতর-বার থেকে একসঙ্গে ঘা মারবে—তারই প্রস্তুতি চলছিল। এলিজাবেথ বিস্মিত হলেন—

আশঙ্কিত হলেন ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে।

থ্রকমর্টনের প্রাণদণ্ড হলো। মৃত্যুর আগে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—এই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন রাণী মেরী স্টুয়ার্টের জন্যই যখন কিছু করতে পারলাম না—আমার মরণই ভাল—

কিন্তু থ্রকমর্টনকে বধ করেও তেমন কোন সুরাহা হলো না।

ক্যাথলিকরা এলিজাবেথকে শুধু সিংহাসন থেকে হটানো নয়, পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপক চক্রান্ত করেছিল ধীরে ধীরে পাওয়া যেতে লাগল তার প্রমাণ—

একদিন এক অল্পবয়সী ক্যাথলিক ছোকরা প্রকাশ্য দিবালোকে খোদ লণ্ডনের রাস্তায় পিস্তল উঁচিয়ে ধরে যেতে যেতে বলতে শোনা গেল—নচ্ছার মাগীর মাথাটা ধড় থেকে খসিয়ে লাঠির ডগায় বসিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

আর এক জেসুইট পাদ্রী প্রার্থনাসভায় যীশুর সম্বন্ধে বলতে বলতে হঠাৎ ভাবাবেগে বলে ফেললেন—বিধর্মী এলিজাবেথের মুণ্ডই আমরা চাই—বলাবাহুল্য এরা সবাই রাণী মেরীর অনুরাগী এবং এলিজাবেথকে খতম করার জন্য তিনি যে দল গড়েছিলেন সেই বণ্ড অফ অ্যাসেসিয়েশনের কর্মী। মেরী ইংল্যাণ্ডে নজরবন্দী থেকেও ঘোষণা করে বসলেন। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁর দাবীকে যেমন করে হোক প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে—

'যেমন করে হোক' অর্থে এলিজাবেথকে হত্যা—এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল—

পার্লামেণ্টে ঝড় উঠল। আর নয়—এবার রাণী মেরীর অবসান হোক—সভ্যরা অনুরোধ করল—মেরীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক—তিনি জীবিত থাকলে ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি হবে এবং রাণী বিপন্ন হবেন—

এলিজাবেথ সব শুনলেন। কোন কথা বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিঃশব্দ কণ্ঠে বললেন, আমাকে একটু সময় দিন—

এলিজাবেথের মনের ভেতরে চিন্তার ঝড় বয়ে চলল—তিনি কখনো খোলাখুলিভাবে কি ক্যাথলিক কি প্রোটেস্ট্যাণ্ট কোন সম্প্রদায়কেই বুঝতে দেননি—কাদের তিনি পছন্দ করেন এবং কাদের ওপরই বা বিরূপ। তাঁর এই স্পষ্ট করে কিছু না বলার নীতির ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ধর্মনীতি এবং তাঁর বৈদেশিক নীতিও। আর তাঁর শাসননীতির বিপুল সাফল্যের মূলেও ছিল তাঁর এই সংযম—অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যদি তিনি ক্যাথলিক সমাজের নেত্রী মেরীকে হত্যা করেন, তাহলে তো তাঁর মনের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়বে আর অভিনয় কি কথার মারপ্যাচ চলবে না। এবং সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী!

এসব ভেবে এলিজাবেথ মেরীকে প্রাণদণ্ড দিলেন না। কিন্তু ওয়ালসিংহ্যামের কাছে গোপনে খবর এল—ক্যাথলিকদের আরও ভয়াবহ আরও মারাত্মক আর

এক চক্রান্তের।

একটা চিঠি ওয়ালসিংহ্যামের হাতে এল—ব্যারিংটন নামে একজন রাণী মেরীকে লিখছেন—"এলিজাবেথকে হত্যা করার জন্য ছজন লোক একেবারে প্রস্তুত··· সেই একই সঙ্গে বিদেশী ক্যাথলিক সৈন্যবাহিনীও ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবে···"

ওয়ালসিংহ্যাম চিঠিটার নকল রেখে খামে সীল করে পাঠিয়ে দিলেন মেরীর কাছে। যথাসময়ে সে চিঠির উত্তরে যা লিখলেন—সেটাও ওয়ালসিংহ্যামের হাতে এল। মেরী ব্যারিংটনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন এবং হত্যার ব্যাপারে আরও বুদ্ধিপরামর্শও দিয়েছেন—

মেরীর হাতের লেখা জাল করে—যেন মেরীই জানতে চেয়েছেন ঘাতক হিসেবে কোন ছজন—তাঁরা কে কে, একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন ওয়ালসিংহ্যাম ব্যারিংটনের কাছে।

দুর্ভাগিনী মেরী। বেচারী ব্যারিংটন! তারা যখন তাদের চক্রান্তের সাফল্যে রঙীন স্বপ্ন দেখছেন—তখুনি ওয়ালসিংহ্যামের ফাঁদে ধরা পড়ে গেল ব্যারিংটন এবং তার ছয় সঙ্গী ও আরো অনেক ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রকারী। সারা লণ্ডন শহর উল্লসিত হয়ে উঠল। ঘণ্টা বাজতে লাগল। গীর্জায় গীর্জায় ধর্মসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এলিজাবেথের জয়োল্লাসে চারিদিক কেঁপে উঠল!

ব্যারিংটন এবং তার ছয় সঙ্গীকে ফাঁসী দেওয়া হলো। এবার মেরীর পালা। মেরীর বিচার শুরু হল। মেরীর বিরুদ্ধে সে সব প্রমাণ ছিল তা অকাট্য। অতএব বিচারে রায় বেরুল—মৃত্যুদণ্ড। হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অফ কমনস-পার্লামেন্টের দুই কক্ষই ঘোষণা করল—মৃত্যুদণ্ড—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখন প্রয়োজন রাণীর চরম অনুমোদন—

এইবার এলিজাবেথ অস্থির হয়ে উঠলেন। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে একেবারে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেলেন তবুও মেরীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর করতে পারলেন না। গোপনে মেরীকে চিঠি লিখলেন—তুমি তোমার সব অপরাধ স্বীকার করো—তাতে তোমার মঙ্গল হবে—মেরী উত্তরে লিখলেন—আমি কোন অপরাধ করিনি—

দোহাই আপনার—আর দেরি করবেন না—পার্লামেন্টের সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, আর অনুকম্পা নয়—দয়া নয়—মেরী জীবিত থাকলে চক্রান্তের শেষ হবে না—

বাধ্য হয়েই এলিজাবেথ স্বাক্ষর করলেন।

মেরী স্টুয়ার্ট মৃত্যুর দণ্ডাদেশ পেয়ে এতটুকু বিচলিত হলেন না। ভয় পেলেন না। সম্রাজ্ঞীসুলভ আভিজাত্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরদিন ভোরেই তাঁর প্রাণদণ্ড। সারারাত ধরে মেরী প্রার্থনা করলেন।

রাত কেটে গিয়ে পূবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল। মেরীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হলো। সেখানে দুজন ঘাতক অপেক্ষা করছিল।

সেদিন মেরীর পরনে ছিল কালো পোশাক। তাঁর হাতে ছিল ক্রশ। তাঁর কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছিল জপের মালা। আশ্চর্য একটা আলোর আভায় তার মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল।

মনে হলো যেন সমাজসংসার কি কারো ওপরে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। কোন নালিশ নেই। পরম করুণাময় যীশুর কাছে সমর্পিত প্রাণ ভক্তিমতী ক্যাথলিকের মতই শেষ বিদায় নেবেন তিনি।

মেরীর বয়স এখন চুয়াল্লিশ। তাঁর মাংসল মুখে তাঁর সেই সুডৌল ধারালো মুখশ্রীর কোন আদলই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই তন্বী সুঠাম দেহ এখন অবাঞ্ছিত চর্বির দৌরাত্ম্যে কেমন বিশ্রী রকমের স্থূল হয়ে গিয়েছে।

—ম্যাডাম, একটু অনুতাপ করুন, পিটার বার্গের ডীন এগিয়ে এলেন, আপনার ধর্মমতের পরিবর্তন করুন—আপনার মুক্তির পথ—দোহাই আপনার—

আগুনে পোড়া সাপের মত দারুণ যন্ত্রণায় মেরীর সারা দেহ কেমন দুমড়ে মুচড়ে উঠল। দু হাতে বুক চেপে ধরে ককিয়ে বলে উঠলেন—এই মুহূর্তে আপনি আর আমাকে বিরক্ত করবেন না। একটু থেমে আবার শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, শুনে রাখুন, মৃত্যুর পরেও যদি জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহলে সেখানেও আমি রোমান ক্যাথলিক হয়েই থাকবো—

ডীন আর কিছু বললেন না। তিনি অন্তিমকালের প্রার্থনা শুরু করলেন। মেরীও দুটো হাত বুকের ওপরে ক্রশের মত আড়াআড়ি রেখে তন্ময় হয়ে ক্যাথলিক প্রার্থনা উচ্চারণ করতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে চলে যেতে লাগল। প্রার্থনার মন্ত্রগুলো চারিদিকের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন দিগন্ত ছাড়িয়ে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে কোন সুদূর অজানা মৃত্যুলোকে পৌছে গেল।

দুইদিক থেকে দুই ঘাতক এগিয়ে এল। তারা মেরীর পোশাক ছাড়াতে সাহায্য করতে এল। মেরী হেসে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—এসব লোক দিয়ে আমার পোশাক ছাড়াতে আমি অভ্যস্ত নই—

মেরী এবার শান্ত ও স্থির পদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। অস্ফুট-কণ্ঠে বললেন, আমি আমার ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করছি—অদ্ভুত একটা অপার্থিব জ্যোতিতে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাতকের কুঠার ঝলসে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত পরই মেরীর রক্তাক্ত মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরল। দর্শকরা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—রাণী এলিজাবেথ—দীর্ঘজীবী হন—

আমেন।

শত্রুর শেষ হলো।

আমেন।

মেরীর বড় আদরের পোষা ছোট্ট কুকুর কখন কি করে তাঁর পোশাকের ভেতরে গুটিগুটি মেরে ঢুকে পড়েছিল। এখন বেরিয়ে এসে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড আর কাঁধের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া রক্তস্রোতের ওপরে আছড়ে পড়ে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

লণ্ডনে উল্লাসের স্রোত বয়ে গেল।

পথে পথে হর্ষোৎফুল্ল জনতা রাণীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কিন্তু—

একজন। সারা লণ্ডনে মাত্র একজন সেই আনন্দ উৎসবে মত্ত হতে পারলেন না। সারা রাত তিনি কিছু খেলেন না। চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলেন না। তিনি আর কেউ নন—এলিজাবেথ!

তিনি কখনো হিংসা বিদ্বেষীর নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তাই অনেক—অনেক চিন্তা করেছিলেন মেরীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। তিনি জানতেন—মেরীকে বধ করা মানেই স্পেন এবং সমস্ত ক্যাথলিকদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। হলোও তাই।

ক্যাথলিকদের অগ্রনায়ক, স্পেনের রাজা ফিলিপ, এলিজাবেথের দুঃসাহস আর স্পর্ধা দেখে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপরে ঘোর কেটে যেতেই রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠলেন—সাজাও নৌবহর—ধ্বংস করে দেব ইংলণ্ডকে—পৃথিবী থেকে মুছে দেব এলিজাবেথকে—

এলিজাবেথের কানে এল ফিলিপের আস্ফালন। ভয় পেলেন না। বিচলিত হলেন না। ধৈর্য হারালেন না। শুধু মনের ভেতরে একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধতে লাগল—যুদ্ধে তো অনেক—অনেক টাকার প্রয়োজন—টাকা কোথায়?

ইংল্যাণ্ডের ভুবনবিখ্যাত দুর্ধর্ষ নৌশক্তির মূলে ছিলেন বেপরোয়া আর দুর্দান্ত সাহসী দুই নাবিক। জগৎবিখ্যাত দুই নাবিক—

ড্রেক।

হকিন্স।

সেকালে সমুদ্রের রাজ্যের আতঙ্ক ছিলেন—ড্রেক। তাঁকে বলা হতো সাগর দৈত্য বা সমুদ্র শয়তান। তাঁর কাছে সমুদ্র ছিল যেন এক গণ্ডুষ জল। তাঁর সম্বন্ধে রটনা ছিল ড্রেকের সমুদ্রের বুকের ওপর যা খুশি করে বেড়ানো তাঁর সহজ চলা ফেরার মূলে নাকি ছিল ড্রেকের আজ্ঞাবহ এক বিশ্বস্ত প্রেত। ড্রেক যা বলতেন সে সঙ্গে সঙ্গে তাই করতো—একটা লোকের সম্বন্ধে কতখানি ভীতি থাকলে এমন সব আজগুবী গল্পের সৃষ্টি হয়।

এলিজাবেথ ড্রেক হকিন্স রেমণ্ড ওয়ালটার র‍্যালে প্রমুখ নাবিকদের ডেকে যুদ্ধের কথা বললেন। যুদ্ধের কথা শুনেই ড্রেকের স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল।

এলিজাবেথ তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন বটে—কিন্তু টাকার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী সিসিল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত অর্থ নেই ইংল্যাণ্ডের রাজকোষে—

না থাক। তবুও তো ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করতে হবে—নিরাপদ রাখতে হবে প্রজাদের। এতদিন অতি সামান্য আয়েই তো রাজ্যের সর্বাধিক ব্যয় বহণ করে নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের, স্কটল্যাণ্ডের হ্যাগনটসদের নিয়মিত সাহায্য করেছেন যেমন করে তেমনি করে এই যুদ্ধেরও টাকা যোগাবেন! তাঁর একমাত্র সম্বল প্রজাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়—এলিজাবেথের অতি বড শত্রু, যিনি সারাজীবন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। যিনি তাঁকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন সেই তদানীন্তন পোপ পঞ্চম সিনট্যাক্স পর্যন্ত এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দক্ষতা দেখে বলছেন—হ্যাঁ রাণীর মত রাণীই বটে—একটা রমনীর কী বিস্ময়কর শাসনক্ষমতা! হায় ঈশ্বর—ও যদি ক্যাথলিক হতো।

কিন্তু নিয়মমাফিক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই ড্রেক একটা কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর কাছে খবর ছিল—স্পেন কাডিজ বন্দরে নৌবহর সাজাচ্ছে—১৫৮৭ সালের এপ্রিলের এক গভীর রাত্রে মাত্র কয়েকটা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে কাডিজ বন্দরে ঢুকে আচমকা বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেনের জাহাজগুলোর ওপর। অতিকায় স্পেনীয় জাহাজগুলো আগুন ধরে গেল। বিরাটবপু নিয়ে জাহাজগুলো নডাচডা করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

স্পেনের রাজা ফিলিপ হতভম্ব।

ডেয়ো পিঁপড়ের মত ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে স্পেনের অত বড় বড জাহাজগুলো ড্রেক ঘায়েল করল কি করে।

কিন্তু বোকা হয়ে চুপ করে বসে থাকার পাত্র ফিলিপ নন। আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—নতুন করে জাহাজ তৈরি কর—নৌবহর সাজাও—ইংলিশ চ্যানেলে ডুবিয়ে মারবো রাণী এলিজাবেথকে তবে আমার নাম ফিলিপ।

অনেক টাকা খরচ করে বহু লোকলস্কর লাগিয়ে আবার এক বিশাল নৌবহর তৈরি করে ফেলল স্পেন। একশো ত্রিশটি দৈত্যের মত বড় বড় জাহাজ নিয়ে এই নৌবহর! প্রতিটি জাহাজের সামনে পিছনে বড় বড় কামান।

নৌবহর দেখে ফিলিপ খুশিতে ডুলে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে করে ফেললেন তাঁর নামকরণ—অজেয় নৌবহর—আর্মাডা—কারো সাধ্য নেই আমার এই আর্মাডাকে জয় করে।

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। ২১ জুলাই দুই পক্ষের নৌবহরে সংঘর্ষ হলো। ড্রেকের পরিচালনার কী আশ্চর্য কৌশলে স্পেনীয় নৌবহরকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এল ইংলিশ চ্যানেলে। আর তারপরেই শুরু হলো যুদ্ধের আসল খেলা।

রাত নামল গভীর হয়ে। আকাশে রাত্রির কালো অন্ধকারের বুকে তারার চুমকি জ্বলছে। নীচে সমুদ্রের কালো জল। চারিদিকের আবহাওয়ায় কেমন থমথমে ভাব।

স্পেনীয় জাহাজের ডেকের ওপরে নৈশপ্রহরীরা কড়া নজর রাখছিল—কোনদিক থেকে ইংরেজদের জাহাজ যেন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। কারো কারো চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

হঠাৎ একজনের নজরে পড়ল—সমুদ্রের জলের ওপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সাগরের জলের ভেতরে এতবড় জায়গাজুড়ে আগুন ধরল কি করে? সমুদ্রের জীন-পরীদের ভূতুড়ে কাণ্ড নয় তো! সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল—আগুন—আগুন—কিন্তু আশ্চর্য! জলের ওপর দিয়ে সেই প্রকাণ্ড উঁচু আগুন যে হেলেদুলে তাদের নৌবহরের দিকেই আসছে—কিন্তু একটা নয় পর পর সাজানো অনেক আগুন দুলতে দুলতে আসছে। আরও একটু এগিয়ে আসতেই স্পেনীয় নৌসেনারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—আগুন লেগেছে—শত্রুর জাহাজে আগুন ধরেছে—মরুক মরুক ব্যাটারা—নিজেদের আগুনে পুড়ে মরুক—

অজেয় নৌবহর উল্লাসে ফেটে পড়ল। কিন্তু একটু পরেই স্পেনীয় সেনাধ্যক্ষরা আর্তনাদ করে উঠল—আগুনে জাহাজগুলো হুড়মুড় করে যে চলে আসছে তাদের অজেয় নৌবহরের ভেতরে। তাদের কয়েকটা জাহাজের পালে দেখতে দেখতে আগুন ধরেও গিয়েছে—শীগগির আমাদের জাহাজের মুখ ফেরাও—নৌ সেনাধ্যক্ষরা আর্তকণ্ঠে হুকুম দিলেন—বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে হবে—

তাড়াতাড়ি! বিশালবপু জাহাজগুলোর মুখ ঘুরিয়ে জল কেটে কেটে যাওয়া তো সহজ নয়। ততক্ষণে এক জাহাজের দড়িদড়া পালের আগুন হিংস্র রক্ত-লোলুপ বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য জাহাজগুলোকে ধরছে। অজেয় নৌবহরের নাবিকদের আর্তচিৎকার যেন মহাপ্রলয় নেমে এল। সব জাহাজ একসঙ্গে পালাতে গিয়ে একে অন্যকে ধাক্কা মারল—সেই ধাক্কায় নিজেদেরই কয়েকটা জাহাজ খতম হলো। হবেই—অত বড় বড় জাহাজ মুখ ফেরাতেই তো অনেকখানি জায়গা চাই—তবুও তারা আগুনের তাড়া খেয়ে নৌবহরের নোঙর তুলে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বেসামাল হয়ে পড়ল। পিছনে পিছনে এক ঝাঁক হাঙরের মত তাড়া করে এল ইংল্যাণ্ডের ক্ষুদে ক্ষুদে জাহাজ-গুলো। ইংরেজরা তাদের আস্ত পনেরটি জাহাজ দখল করে নিল। অজেয় নৌবহরের যে কটা জাহাজ অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে পড়ল খোলা সমুদ্রে।

স্পেনীয় নৌসেনাধ্যক্ষরা অবাক হয়ে গেল—এত শক্তি ইংল্যাণ্ড কোথা থেকে পেল! কিন্তু এই সাফল্যের মূল কৃতিত্ব ছিল সেই সমুদ্র শয়তান দুঃসাহসী ড্রেকের। ড্রেক বুঝতে পেরেছিলেন স্পেনের এই অতিকায় জাহাজগুলোর সঙ্গে

তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে জাহাজ নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করা মানে ইংল্যাণ্ডের ধ্বংস ডেকে আনা। তাই তিনি নিজেদের কয়েকটি জাহাজে নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেগুলোকে ঠেলে দিলেন নৌবহরের মাঝখানে। তাঁর এই অভিনববুদ্ধিতেই ইংল্যাণ্ডের অ'মাডা বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু শুধু ড্রেকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কি ! কি দুর্দান্ত সাহস এবং নৌযুদ্ধের চমকপ্রদ নৈপুণ্যই শুধু ইংল্যাণ্ডের সাফল্যের কারণ নয় ! ক্ষুদ্র দ্বীপের দেশ ইংল্যাণ্ডের এই বিস্ময়কর কৃতিত্বের মূলে ছিল ইংরেজদের জাগ্রত জাতীয়তাবোধ, ধর্মমত নির্বিশেষে প্রজাদের মিলিত শক্তি, মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় তাদের একাগ্র নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি ছিল রাণী এলিজাবেথের আন্তরিক সহযোগিতা। বিপদ তুচ্ছ করে তিনি রণাঙ্গনে এসে সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মেলামেশা করতেন। তিনি বুদ্ধিমতী। লোকচরিত্র সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তিনি জানতেন তাঁর উপস্থিতি, স্নেহপ্রীতি সহানুভূতিসিক্ত ব্যবহার, দুটো মিষ্টি কথা বন্দুক গোলাগুলি এবং রসদের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি যোগাবে সৈন্যদের। জানতেন বলেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন।

৮ই আগস্ট, শ্বেতকায় ও তেজস্বী এক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে রণচণ্ডী মহাদেবীর মতই টিলব্যারীর যুদ্ধশিবিরে আবির্ভূতা হলেন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ। উল্লসিত হয়ে উঠল সৈন্যরা।

রাণীর দিকে তাকিয়ে তাদের মুগ্ধ দুটো চোখের পলক পড়ে না। যৌবনের প্রান্তসীমায় এসেও কী আগুনের মত রূপ। তাদের মনে হল ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব, মহিমময় আভিজাত্যের আলোই তাদের রাণীকে এখনও রূপসী করে রেখেছে। সৈন্যরা সম্মোহিতের মত প্রার্থনার ভঙ্গাতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাথা নিচু করে রাণীর সামনে—

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন—এলিজাবেথের উদাত্ত কণ্ঠে সমস্ত অন্তর দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। চারিদিক কাঁপিয়ে সৈন্যরা রাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—

রাণী এলিজাবেথের জয়। রাণী এলিজাবেথ দীর্ঘজীবী হন।

॥ উনিশ ॥

দেখতে দেখতে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালের ত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেল।

চিরকুমারী রহস্যময়ী এই রমণীর বয়স এখন ছাপান্ন। কে জানে কোন যাদুতে এলিজাবেথের সেই দীর্ঘ ঋজু দেহে এখনও অটুট স্বাস্থ্য ও অপর্যাপ্ত যৌবন জেগে রয়েছে প্রখর হয়ে। সেই বুদ্ধিদীপ্ত দুটো বড় বড় চোখের খর জ্যোতিতে সেই কোমল পেলব হাত দুটোর সৌন্দর্যে বয়স তার কালো ছায়া ফেলতে পারেনি।

তার রূপের আগুনে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছিল রবার্ট ডাডলি, ফ্রান্সের যুবরাজ অ্যালেনকন, ইয়র্কের ডিউক এবং আরও কত অভিজাত রাজপুরুষ। স্পেনের

রাজা ফিলিপ, সুইডেনের রাজকুমার এরিক, অস্ট্রিয়ার দুই যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড এবং চার্লস, ফ্রান্সের আর্ল অফ আরুণ্ডল, চার্লস পিকারিং এবং আরও কত দূরদূরান্তরের ভূখণ্ডের রাজা মহারাজেরা তাঁকে বিয়ে করার দুর্মর স্বপ্ন নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিল কিন্তু—

এলিজাবেথ কাউকে যেমন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি, তেমনি কাউকে বিয়েও করেননি। প্রতিটি প্রণয়ী এবং পানিপ্রার্থীদের সঙ্গে ভাবভালবাসার নিপুণ অভিনয় করে বিদেশনীতিতে সফল হয়েছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডকে সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছিলেন—এ সব তথ্য ইতিহাসে আছে। কিন্তু কোন ইতিহাসেই স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই কেন তিনি বিয়ে করেননি? শুধুই তাঁর কুমারীজীবন তাঁর আশ্চর্য যৌবনসম্ভারের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যই কারো সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাননি?

তাঁর বিয়ে সম্বন্ধে তাঁর মনের গহনলোকে কি দ্বিধা ছিল—কোন বাধা ছিল যার জন্য তাঁকে নিঃসঙ্গ কুমারী জীবনের দুর্বহ ভার বয়ে যেতে হয়েছিল—এ সব প্রশ্ন মনে জাগে। এমন কোন ঘটনা কি ঘটেছিল যার দুঃসহ এবং বীভৎস দুঃস্মৃতি দুষ্টু প্রেতের মত সারা জীবন তাঁর কাঁধে চেপেছিল। আর বিয়ে, প্রেমভালবাসা বা নরনারীর চিরন্তন সেই যৌনলীলা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণাই একেবারে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু—

সে কথা এখন থাক। তার আগে বলা দরকার তাঁর জীবনের শেষ প্রেমিক—শেষ পুরুষটির কথা। দীর্ঘদেহী অসামান্য রূপবান সেই যুবক যেমন দুর্দান্ত স্বভাবের তেমনি জেদী, একগুঁয়ে। কিন্তু যত দোষই তার থাক, তার স্বপ্নালু বড় বড় দুটো চোখ, দেবদূতের মত তার আশ্চর্য অপার্থিব সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ কেমন অবশ হয়ে যেতেন। বিশৃঙ্খল হয়ে যেত তাঁর চেতনা।

আসল নাম রবার্ট ডেবরা।

এলিজাবেথের পরিষদের শক্তিশালী সদস্য আর্ল অফ লিস্টারের সৎ ছেলে। ইতিহাসে তিনি আর্ল অফ এসেক্স নামেই পরিচিত।

এলিজাবেথের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের ইতিবৃত্ত জানতে হলে যেতে হবে আরও চোদ্দ পনের বছর পেছিয়ে। ২৭ জুলাই, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। আর্ল অফ লিস্টারের কেনিলওয়ার্থের সুদৃশ্য বিশাল প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করছিল। ঘন সবুজের ছবির মত ঘাসে ঢাকা বিরাট উদ্যানে ডিনার পার্টি বসেছে। ছোট ছোট এক একটি টেবিলের মুখোমুখি দুটো চেয়ারের কোনটায় আছেন স্যার উইলিয়ম সেসিল—রাণীর বিচক্ষণ মন্ত্রী, কোনটায় আছেন রবার্ট ডাডলী, আছেন বরার্ট দেভে রিউস প্রমুখ। বলা যায় এলিজাবেথের সমসাময়িক অভিজাত বিত্তবান সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই সেই সান্ধ্য সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। বাগানের বাইরে অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার জটলার মত ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল আশপাশের গ্রামের লোক। তারা এসেছে উৎসবের সমারোহ দেখতে।

আমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই উপস্থিত। টেবিলে টেবিলে সুগন্ধী দামী ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কি এবং নানাবিধ পানীয়ের স্রোত বয়ে চলেছে। প্লেটে প্লেটে শোভা পাচ্ছে অপর্যাপ্ত মহার্ঘ আহার্য সম্ভার। তবুও—

কেন যেন পার্টিতে প্রাণের স্পন্দন নেই। কিসের যেন অস্বস্তি অভ্যাগতদের বুকের ভেতরে কাঁটার মত বিঁধছে। তাদের উৎসুক দৃষ্টি বার বার আছড়ে পড়ছে গেটের দিকে। রাণী আসছেন না কেন?

রাত বাড়ে। আর্ল অফ লিস্টার অস্থির হয়ে ওঠেন।

হঠাৎ প্রাসাদের প্রধান তোরণের দিকের জনতা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল চাপা গুঞ্জন—রাণী—রাণী আসছেন।

মাহিমাময়ী সম্রাজ্ঞী এলেন। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বর্ণাঢ্য সেই সান্ধ্যপার্টির ঔজ্জ্বল্য কোথায় হারিয়ে গেল। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও তাঁর অসামান্য রূপ যেন আগুনের মত জ্বলছে। রক্তলাল ভেলভেটের পোশাকের আবরণে রাণীর দীর্ঘ তন্বী দেহটা যেন প্রদীপ্ত একটা দীপশিখার মত জ্বলছে। বড় বড় দুটো প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, খড়্গের মত নাকে অনিন্দ্যসুন্দর ধারালো মুখাবয়বে কঠোর ব্যক্তিত্বের আভাস। না, কোথাও পড়ন্ত যৌবনের কোন ম্লান ছায়া নেই।

বিদ্যুৎগতিতে আমন্ত্রিতরা উঠে দাঁড়িয়ে রাণীকে অভিবাদন করলেন। এলিজাবেথ টেবিলে টেবিলে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন এমন সময়—

কি হে ছোকরা, তুমি এখানে কি চাও? আর্ল অফ লিস্টারের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে বছর এগারোর এক কিশোর সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঘাড় পর্যন্ত ঝুলনো বাবরি চুল। বড় বড় দুটো চোখে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন মেদুর দৃষ্টি। দেখছে সব কিছু আবার কিছুই দেখছে না—যেন কোন দূর অজানা গ্রহে তার গহন মনের আনা-গোনা।

কি নাম তোমার? মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে রাণী বললেন।

উইলিয়ম সেক্সপীয়র—বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন ভুবনজোড়া খ্যাতির অধিকারী ভাবীকালের মহাকবি, আমাদের গ্রামের লোকের সঙ্গে আপনাদের উৎসব দেখতে এসেছি—

হার একসেলেন্সী, এদিকে একবার আসুন, প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম সেসিল রাণীকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আর্ল অফ লিস্টার একটা সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলেকে নিয়ে এল এলিজাবেথের কাছে।

আমার সৎ ছেলে—আর্ল অফ এসেক্স—

কোন কথা বললেন না রাণী। খর চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে। কী আশ্চর্য সুন্দর! যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা চোখমুখ। ভাসা ভাসা দুটো নীল চোখে চঞ্চল দৃষ্টি।

কুমারী রাণীর বুকের শিরাউপশিরায় টান পড়ে। তাঁরও—তাঁরও তো এইরকম

একটা ছেলে থাকতে পারতো। হু হু করে ওঠে তার বুকের ভেতরটা। ভেতর থেকে তীব্র একটা কান্নার দলা যেন পাক খেয়ে খেয়ে গলার কাছে উঠে আসে। কিন্তু—

কয়েকমুহূর্ত পরেই নিজেকে সংযত করলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণী অষ্টম হেনরীর কন্যা। তাঁর কাছে নিজের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক—অনেক বড়!

এসো আমার কাছে এস—সস্নেহে সেই আট বছরের এসেক্সকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিলেন। তার আপেলের মত রক্তাভ নরম গাল দুটোতে তপ্ত চুম্বনে চুম্বনে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন আর বিহ্বল করে দিতে যেই উদ্যত হলেন—

কি করছেন—এ কী করছেন আপনি? ছিটকে সরে গেল বালক, যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে!

এলিজাবেথ হতভম্ব। তাঁকে প্রত্যাখ্যান! এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে প্রথম।

এই আর্ল অফ এসেক্সই পরে রাণীর কুমারী জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর শেষ প্রেমিক—শেষ নিয়তি হয়ে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখেছিল।

টিউডর যুগের এক ইতিহাসবিশেষজ্ঞ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যেদিন রাণীর চুম্বনকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেইদিনই সেই আট বছরের বালকের প্রেমে পড়ে ছিলেন চল্লিশ বছরের অনূঢ়া সম্রাজ্ঞী।

এলিজাবেথ।

আর্ল অফ এসেক্সের প্রেমের ইতিবৃত্ত মনে হয় পৃথিবীর নরনারীর প্রণয়লীলার ইতিহাসেই বিস্ময়কর!

গোড়াতেই মনে রাখতে হবে রাজরাজড়াদের প্রেমপ্রণয়লীলার ভেতরেও রাজনীতির গন্ধ থাকে। সুদর্শন যুবকদের প্রতি এলিজাবেথের অপরিসীম দুর্বলতা ছিল সর্বজনবিদিত।

প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম সেসিল এবং রাণীর পরিষদের সদস্য ওয়াল্টার র‍্যালের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাবপ্রতিপত্তি দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। হিংসায় জ্বলে যেতে লাগলেন আর্ল অফ লিস্টার। মাথায় এসে গেল এক দুরভিসন্ধি।

ন দশ বছর আগে কেনিলওয়ার্থের প্রাসাদে সেই গার্ডেনপার্টি যে আট বছরের সুন্দর ফুটফুটে বালকটিকে নিয়ে এসে রাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আর্ল অফ এসেক্সকেই রাজসভায় নিয়ে এলেন।

চমকে উঠলেন রাণী।

ও কে! মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে দিব্যকান্তি এক দেবতা! দীর্ঘ সুঠাম দেহে অপার্থিব সৌন্দর্য! বড় বড় নীলাভ দুটো চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা অস্থিরতা তাঁকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে।

এলিজাবেথ মুগ্ধ হলেন।

আরও বেশি আকৃষ্ট হলেন এসেক্সের সেই অস্থির চঞ্চলতায়। তাঁর মনে হয়েছিল দুর্বার একটা প্রাণশক্তিতে তেজী ঘোড়ার মত টগবগ করছে যুবকটি।

আর্ল অফ লিস্টারের উদ্দেশ্য সফল হলো।

রাণীর কাছে তাঁর সম্মান এবং খাতির বেড়ে গেল। উইলিয়াম সেসিল এবং ওয়াল্টার র‍্যালে কেমন ম্লান হয়ে গেলেন। তখন হল্যাণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট আর ক্যাথলিকদের সংঘাত চলছিল। এলিজাবেথ সঙ্গে সঙ্গে সেইদিনই লিষ্টারের অধীনে সেনাবাহিনীতে এসেক্সকে নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন হল্যাণ্ডে। ফিরে এলেন এসেক্স ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এসেক্স একুশ। রাণী চুয়ান্ন।

তা হোক! এলিজাবেথ সেই যুবকের অপরিসীম সৌন্দর্য সেই দীর্ঘ উদ্ধত দেহছন্দে খরযৌবনের প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেলেন। আর আশ্চর্য একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে তাঁর মনের গহনে বিদ্যুৎচমকের ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ধারালো লম্বাটে মুখ—

অ্যাডমিরাল থমাস সেমুর। পিতৃস্থানীয় এই মানুষটাই তো তাঁকে যৌবন-রহস্যের প্রথমপাঠ দিয়েছিল। অজানা একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে তার কোথায় কি আছে দেখার মত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর অনাবৃত দেহের যৌবনচিহ্নগুলির সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল।

তিনি তখন সবে তেরতে পা দিয়েছেন। সেই কৈশোরেই তাঁর দীর্ঘতন্বী দেহের দুকূল ছাপিয়ে যেন যৌবনের ঢল নেমেছিল। তিনি বেশ অনুভব করতেন ভেতরে ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন জাগছে। সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। সেই দারুণ ঝড়ো সময়েই থমাস সেমুর—

কি ভাবছেন এত—আমাকে চিনতে পারছেন না? এসেক্সের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ ঘরে ঝনঝন করে বেজে উঠল।

বাবা! বলছো কি, তোমাকে চিনবো না। খিলখিল করে হেসে মিষ্টি স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন রাণী। তার হাত দুটো পরম আদরে জড়িয়ে ধরে পাশে বসালেন। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বললেন—মনে নেই সেই কেনিলওয়ার্থের পার্টিতে তোমাকে আমি—

ওসব ছোটবেলার হাবিজাবি কথা রাখুন তো। তীরের মত উঠে দাঁড়ালো এসেক্স। এলিজাবেথের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কিসের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বললেন—কাজের কথা বলুন হার হাইনেস—কি করতে হবে বলুন—

এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না।

তাঁর চোখে ব্যথার কালো ছায়া।

যেন দূর—বহুদূর থেকে অশুভ সঙ্কেতের মত ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। রূপযৌবনের বিদায়ের ধ্বনি। সত্যিই কি একদা তার আগুনের মত রূপে প্রৌঢ়ত্বের কালো ছায়া পড়েছে! তা না হলে এই তরুণ তাকে এমন করে অবহেলা করছে—

আমি তাহলে যাই ম্যাডাম—

তুমি অমন ছটফট করছো কেন বলো তো? সস্নেহে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এসে স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বললেন সম্রাজ্ঞী—তোমার কাজ কি জানো?

কি?

প্রত্যেকদিন নিয়ম করে আমার কাছে আসা—আমাকে কম্প্যানী দেওয়া কেমন?

কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকালেন এসেক্স। রাণীকে যেন তাঁর গভীর নেশাচ্ছন্ন মানুষের মত কেমন ঘোর লাগা মনে হলো।

অবশ্যই রয়্যাল আর্মিতে তোমার নামটা থাকবে—যেন কোন নিবিড় সুখস্বপ্নের ঘোরে অস্ফুটস্বরে বললেন এলিজাবেথ, তুমি হবে আমার বন্ধু—সখা—বয়স্যা—

সেই শুরু।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল থেকে রাত, গভীর রাত। কোন এক মুহূর্তের জন্য এসেক্সকে চোখের আড়াল করতেন না এলিজাবেথ। কোন কারণে দৈবাৎ তাঁর প্রেমিকের কোনদিন দেরী হলে অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি। কিন্তু সেই দীর্ঘ সুঠামদেহী অসামান্য রূপবান যুবকটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেই বদলে যেত পৃথিবীর রং। চারিদিক কেমন মায়াময় হয়ে উঠতো। তারপরে—

তারপরে আর কি।

কখনো হোয়াইটহলে, কখনো তাঁর নিজের বেডরুমে দুজনে গল্পে গল্পে আর হাসিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতেন। আবার কখনো চলে যেতেন তাঁরা বাগানে। দুজনে দুটো তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে কথার জাল বুনতে বুনতে পেরিয়ে যেতেন ড্যাফোডিলের ঝাড় ছাড়িয়ে চলে যেতেন ঘনসন্নিবদ্ধ পপলার বীথি। উদ্যানের প্রান্তদেশে প্রাচীন সেই ওক গাছটার নিচে নীলাভ ছায়ায় এ ওর কোলে মাথা রেখে নিরবচ্ছিন্ন কূজনে ছন্দোসুরভিত করে তুলতেন তাঁদের মুহূর্তগুলো।

সুখস্বপ্নের মতো কেটে যেত দিন। কিন্তু—

রাত?

রাত ঘন হয়ে নেমে এলেই কে জানে কিসের যেন আশঙ্কায় এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে কাঁপতো। আর তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণায় দাবদাহের মত জ্বলে যেতে লাগতো তার সারা দেহ।

নিস্তব্ধ রাজপ্রাসাদ।

সুদৃশ্য শয়নকক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যা।

সেই মনোরম শয্যায় আসীন উদ্দাম যৌবনের প্রদীপ্ত শিখা এখুনি—এখুনি এই মুহূর্তেই তো তিনি কামনার আগুনে দগ্ধ মরালীর মত তার চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী হয়ে মিশে যেতে পারেন তার দেহে। বহু—বহুকালের বুভুক্ষার জ্বালা মিটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু—

সম্রাজ্ঞীর মনের ভেতরে প্রেতের মত ঘোলা চোখ মেলে তাকায় সেই লোভী স্বার্থপর কামুক এবং অত্যন্ত হীনমনের সেই প্রৌঢ় থমাস সেমুর! এই পিশাচটা তাঁর সর্বস্ব লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল একটা অত্যন্ত করুণ ও শোকাবহ পরিস্থিতিতে।

১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতা অষ্টম হেনরী দেহ রাখলেন।

তাঁর ছোট ভাই ন বছরের বালক এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসলেন। বয়স কম বলে তাঁর প্রোটেক্টার নিযুক্ত হলেন তাঁর মামা এডওয়ার্ড সেমুর বা ডিউক অফ সামারসেট। তাঁরই ছোট ভাই থমাস সেমুর!

প্রোটেক্টার মানেই তো আসলে এম্পারার! দাদা অত উঁচু ধাপে উঠে গেল আর সে শুধু সেনাপতি হয়ে থাকবে কেন? সেও তো রাজমাতুল। কুটিল হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল থমাস। যেমন করে হোক ছলেবলেকৌশলে তাকে রাজ-দরবারের উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে। অতএব—

তাঁর মস্তিষ্কে ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল হাজারো কুটিল দুরভিসন্ধি—প্রথমেই পুরুষ অভিভাবকহীন রাজঅন্তঃপুরের দিকে থাবা বাড়ালো সেমুর। তাঁর বিধবা মা ডাকসাইটে রূপসী ক্যাথারিনকে বিয়ে করে বসল সে। একবার ভেবে দেখল না ক্যাথারিন এর আগে তিন তিনটি স্বামীকে কবরে পাঠিয়েছে আবার হেনরীর মৃত্যুর মাত্র চৌত্রিশদিন পরেই আবার আর একজনের গলায় মালা পরাচ্ছে।—এসব চিন্তাভাবনা করার সময় কোথায় সেমুরের। তার উচ্চাশার পাগলা ঘোড়া তখন উদ্দামগতিতে ছুটছে।

এই সময় ক্যাথারিনের কাছেই তিনি থাকতেন। রাণীকে বিয়ে করার পরই অন্দরমহলে তাঁর যাতায়াত অবাধ হয়ে উঠল। যখন-তখন হুট-হাট করে এসে পড়তো সেমুর। তা আসুক। যত খুশি আসুক। ক্যাথারিনের কাছে যাও। উঁহু—তা নয়—তাঁর আশেপাশে ছোঁক ছোঁক করতে লাগল বুড়োটা!

এক একদিন সাতসকালে এসে পড়তো সেমুর। সোজা তাঁর বেডরুমে। তখন হয়তো তাঁর ঘুমই ভাঙেনি। কিম্বা জেগেই শুয়ে রয়েছেন। আরে আরে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমবে নাকি! ওঠ—ওঠ—বলতে বলতেই টান দিয়ে লেপটা সরিয়ে দিত। তখন তাঁর পরনে শুধু হালকা নাইট গাউন। তার নিচেই সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহ-বল্লরীর অপরূপ যৌবনশ্রীর ছায়াময় লোভানি! তখুনি—ঠিক তখুনি—

আমি কিন্তু আপনার কোন ব্যাপারই বুঝতে পারছি না—তীব্র বিরক্তিতে গজগজ করে বলে এসেক্স—কেন যে আমার মুখের দিকে অমন হা করে তাকিয়ে থাকেন—একমনে কি চিন্তা করেন—

তুমি যে কী—না? কিশোরী মেয়ের মত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আদুরে গলায় সম্রাজ্ঞী বলেন, অতবড় একটা রাজ্য চালাতে হচ্ছে। চিন্তা হবে না?

তাহলে বসে বসে ভাবুন—আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতেই

উঠে দাঁড়ালো এসেক্স—আমি আর কখনো আসছি না—

আরে—আরে—তুমি এত ক্ষ্যাপা কেন বলো তো, তার হাত ধরে জোর করে কাছে টেনে এনে তার মাথাটা কোলের ভেতরে গুঁজে অস্ফুটস্বরে বললেন, তোমাকে কী অসম্ভব ভালবাসি—তুমি বুঝতে পারো না ?

তাতে কি—কোন ইয়ং ছেলে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে বসে থাকতে পারে ? এসো—এসো—আমরা পেশান্স খেলি—মুখে মোহাচ্ছন্ন হাসি ফুটিয়ে তাসের গোছা নিয়ে বসলেন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ। তারপর ?

রাত্রির প্রহরগুলো ভারমন্থর হয়ে দণ্ডে দণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে যেত। সুষুপ্ত চারিদিক। তারা পরস্পরের কবোষ্ণ সান্নিধ্যে বসে খেলেই যেতেন। ইতিহাসে আছে—Whole night they played one game after another···

পূবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠতো। চুয়ান্ন বছরের অনূঢ়া রাণীর সঙ্গে প্রেম ও নিশিযাপন করে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যেত বিশ বছরের উঠতি যুবক। রাত্রিশেষের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে কোন রাতচরা পাখি কর্কশস্বরে ডেকে উঠে ডানা ঝটপট করে উড়ে চলে যেত অন্ধকার দিগন্তে !

আর্ল অফ এসেক্সের প্রধান পরিচারক মন্তব্য করেছিল—My Lord cometh not to his own lodging till birds sing in the morning···

বলা দরকার—অনায়াসেই বলা যায় এই প্রেমপ্রণয়ের লীলাই এসেক্সের সমাধি রচনা করেছিল। মহিমাময়ী শক্তিমতী সম্রাজ্ঞীর আদর ভালবাসা স্নেহের প্রশ্রয় তাকে করে তুলেছিল উদ্ধত আর উচ্ছৃঙ্খল এবং বেপরোয়া।

ইংল্যাণ্ড থেকে নৌঅভিযান যাবে প্রাচ্যদেশে। কে—কে যাবে ?

আমি—আমি—আমার চেয়ে যোগ্য লোক কেউ আছে নাকি ? উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন এসেক্স।

তাঁর ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ানো—এই ঔদ্ধত্যই রাণীর বড় ভাল লাগে। পাঠালেন তাঁকে নৌঅভিযানে। ফ্রান্সে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘাত শুরু হল। স্পেনের ক্যাথলিক নৃপতি ফিলিপ ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করল। এলিজাবেথ শঙ্কিত হলেন—ফ্রান্স স্পেন যদি হাত মেলায় তাহলে তো ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ ! কে যাবে ফ্রান্সে ?

কেন—আমি—বলিষ্ঠকণ্ঠে দাবি জানায় এসেক্স। নেদারল্যাণ্ডসে এবং আরও বড় ব্যাটলফিল্ডে আমি আমার নৈপুণ্য—

বেশ বেশ তুমিই যাবে—রাণী বললেন, শোনো আগে ব্রিটানী, তারপর রুয়েন দখল করবে কেমন ?

কিছুই হল না। নিজের খেয়ালখুশিমত যা-তা কতগুলো কাণ্ড ঘটিয়ে চুপটি করে ঘরে রইল।

ওদিকে লণ্ডনে বসে ছটফট করছে এলিজাবেথ। এসেক্সের কোন খবর নেই।

হঠাৎ একটা চিঠি পেলেন এলিজাবেথ। খুশিতে গুরগুর করে উঠল তাঁর বুকের ভেতরটা। নিশ্চয়ই তার প্রিয়তম এসেক্স ব্রিটানী এবং বুয়েন জয় করেছে। "আমার প্রিয় সম্রাজ্ঞী আপনি অনুপমা—আপনি মনোরমা···আপনি যতদিন—যতকাল রাখবেন ততদিন আপনার কাজে অচল হয়ে থাকবো—না আকাশচ্যুত তারকা হয়ে আমি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হবো না—আমি বরং সূর্যালোকে বাষ্প হয়ে আমার অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে স্বর্গালোকে আপনার আসন পাতবো···

রাগে চিঠি দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এলিজাবেথ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সেনানায়ক এইরকম ভাবাবেগের বাষ্পে ভরপুর চিঠি লেখে সে আর যাই করুক —কখনো যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না।

এলিজাবেথ আরও চটলেন। তাঁর কানে এল ব্রিটানী রুয়েন কিছুই দখল করতে না পেরে এসেক্স না কি বুয়েনের গভর্নরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে—চলে এস এক হাত হয়ে যাক—

যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে কি ভাঁড়ামি করা? চলে এস—এলিজাবেথ হুকুম দিলেন।

এলিজাবেথ।

তাঁর পাঁজরে যেন দুদিক থেকে দুটো তীর বিঁধে গিয়েছে। নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, ফ্রান্স হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আর একদিকে তাঁর প্রিয়তম আর্ল অফ এসেক্স—জলের মত টাকা খরচ করে চলেছে, সৈন্যক্ষয় সময় নষ্ট অথচ কাজের কাজ কিছুই করেনি—করতে পারেনি। তবুও—

তবুও এলিজাবেথ তার ওপরে কঠোর হতে পারে না। যখন যে বায়না ধরে এসেক্স, ঘাড় বাঁকিয়ে দাবী জানায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান এলিজাবেথ। সিসিল বার্গলের ছেলে রবার্ট সিসিলকে রাণী তার পিতার পদে অর্থাৎ পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করলেন—

আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি? হিংসায় টগবগ করে ফুটছে এসেক্সে।

তাকে পরিষদের সদস্য করে দিলেন রাণী। কিছুদিন শান্ত থাকল। আবার সেই অস্থিরতা—সেই দাপাদাপি। নৌ অভিযানে ব্যর্থ হলেন। সেখানে ওয়াল্টার র‍্যালের কৃতিত্বের জন্য এলিজাবেথ তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলেন।

শেষে চলে এল এসেক্স। তাকে শান্ত করার জন্য সকলকে অবাক করে দিয়ে তাঁকেও নাইট উপাধির শিরোপা পরিয়ে দিলেন। এসেক্স রাগ করবে, দুঃখ পাবে এ যেন কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

সেই এসেক্স।

তাঁর স্বপ্ন। তাঁর শেষ প্রেম। তাঁর চেতনার ভেতরের জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। সেই এসেক্সকে যে আকাশচুম্বী উচ্চাশার বিষাক্ত কীট কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। সে যে

অসুস্থ বিকৃত তা কি এলিজাবেথ উপলব্ধি করতে পারেননি ? তিনি কি জানতেন না ছোটবেলায় প্রেমব্রোকশায়ারের কান্টি হাউসের সাবেককালের ভাঙা নড়বড়ে বাড়িটায় যার চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলে লাল হরিণ বুনো শুয়োর আর রাশি রাশি বিষাক্ত সরীসৃপের অবাধ বিচরন, সেই আরণ্যক পরিবেশে থাকতে থাকতে সে কেমন বন্য হয়ে গিয়েছিল। হয়তো তিনি জানতেন না—তাঁর দীর্ঘ সুঠামদেহের ভেতরে রোগের বিষও ছিল—কিডনীতে পাথর হয়ে অনেকদিন অসুস্থ হয়ে থেকেছিল এমনও হতে পারে—সেই রোগের যন্ত্রণা এখনও আছে—তাই সময় সময় মেজাজ তিরিক্ষি হয়েই থাকে। এসব কোন বৃত্তান্তই হয় তো তাঁর জানা ছিল না। তাই—

তাঁর এসেক্স যখন আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিজেই বিদ্রোহী আইরিশ নেতা টাইরনের সঙ্গে হাত মেলালো, এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকা করে ফেলল তখনও সাম্রাজ্ঞী বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁর এসেক্স এসব করতে পারে—প্রায়ই মনে হতো এসেক্স তার উজ্জ্বল সতেজ চেহারাটা নিয়ে তাঁর সামনে এসে বলবে—যা শুনেছেন—সব—সব—ভুল—

কিন্তু—

কয়েকদিন পরই—সীমান্তে গুপ্তচর ধরা পড়ল। তার কাছে চিঠিতে এসেক্সে টাইরনের চক্রান্তের ব্যাপক পরিকল্পনার খসড়া পাওয়া গেল।

এলিজাবেথের বুক ভেঙে গেল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। স্নেহ প্রেম ভালবাসা—সব—সব—ভুল—মিথ্যা মিথ্যা—কিন্তু কিছুই বললেন না।

এইবার—এইবার এলিজাবেথ সমস্যায় পড়লেন। এসেক্স এর আগে আরও অনেক বেয়াদপি করেছে—কাউন্সিলের প্রকাশ্য সভায় তাঁকে অপমান করেছে। তিনি তার কান ধরে মুচড়ে দিয়েছিলেন। সেই অপমানে রাগে বেশ কিছুদিন রাজসভায় আসেনি এসেক্স। এমন কি তাঁর রাজত্বের চল্লিশ বছর পূর্তির উৎসবে পর্যন্ত যোগদান করা প্রয়োজন মনে করেনি। তাঁকে পরিষদের সদস্যদের সামনে স্বার্থপর কুটিল বুড়ী পর্যন্ত বলতে তার মুখে বাধেনি। তবুও—

তবুও যেই এসেক্স তার তেজোদৃপ্ত চেহারাটা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে অমনি তাঁর সব রাগ সব বিক্ষোভ গলে জল হয়ে গিয়েছে। তিনি যে ভালবাসেন—গভীর ভাবে ভালবাসেন তাকে। তাই কিছুতেই এমন কোন কাজ করতে পারেন না—যাতে এসেক্স আঘাত পায়। কিন্তু—

এবার এসেক্সকে রক্ষা করবেন কি করে ? সাত মাসে আয়ারল্যাণ্ডে বসে তিন লক্ষ পাউণ্ড খরচ করেছে সে। কাজের কাজ কিছুই করেনি। এলিজাবেথের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে টাইরনের সঙ্গে মিলে। এই ষড়যন্ত্রের আরও অনেক—প্রামাণিক খবর তথ্যাদিও এলিজাবেথের হাতে এল।

আর একটুও দেরী করলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণী। অষ্টম হেনরীর কন্যা। দেশ—দেশের স্বার্থ আগে। প্রেম ভালবাসাকে তিনি কোন দিনই স্বদেশ-

ভূমির সম্মানের চেয়ে বড় করে দেখেননি।

এসেক্সের বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেশদ্রোহীতার সব তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে তড়িঘড়ি কাউন্সিলের সভা ডাকলেন। আয়ারল্যাণ্ডে যেসব কাজ করেছেন এবং করেননি তার কৈফিয়ত তলব করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এসেক্সকে তাঁর নিজের বাড়িতে আটকে রাখা হলো। এই সময় আর একটা কাণ্ড ঘটল।

টাকাপয়সার ব্যাপারে এলিজাবেথ ছিলেন অত্যন্ত কঞ্জুস। এমন কি প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট কার্পণ্য ছিল। অনেকদিন আগে প্রণয়ী এসেক্সকে ৩০,০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। তিনি সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছিলেন। এবার জানিয়ে দিলেন সরকারী ভাবে টাকা তিন দিনের ভেতরে শোধ না দিলে তোমার মদের দোকানের একচেটিয়া অধিকারের লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে।

টাকা দিতে পারল না এসেক্স। লাইসেন্স ক্যানসেল করে দিলেন এলিজাবেথ। প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতিতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এসেক্স। ওদিকে এলিজাবেথের মন্ত্রী বেকন বললেন আর্ল অফ এসেক্স আয়ারল্যাণ্ডে যা করে এসেছে—তার বিচার করা উচিত—

বিচার চাই—ওয়াল্টার র‍্যালেও পরিষদে বললেন, এবার যদি হার হাইনেস অনুগ্রহ দেখান তাহলে কিন্তু পস্তাতে হবে—

৫ জুন একটা বিশেষ বিচারসভায় এসেক্সকে ডাকা হলো। এলিজাবেথের মনে ঝড় বয়ে চলেছে—বিচারে এসেক্স নির্দোষ বলে গণ্য হোক। তাঁর স্বপ্ন—তাঁর এসেক্স আবার আগের মত হোক—এসেক্স সব দোষ স্বীকার করুক। কিন্তু—

এলিজাবেথের আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বিচারে এসেক্স অপরাধী বলে গণ্য হলো। তাঁকে সমস্ত পদমর্যদা থেকে অপসারিত করা হলো এবং তাকে বাড়িতেই বন্দী অবস্থায় রাখা হলো। ওদিকে রাজপ্রাসাদে বসে প্রৌঢ়া রাণী বিনিদ্র রাত্রিযাপন করে সমস্ত সত্তা দিয়ে কামনা করছেন—একবার—একবার এসেক্স তাঁর কাছে আসুক—সমস্ত অন্তর দিয়ে সব দোষ স্বীকার করুক—তাহলে—তাহলেই তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে কাছে টেনে নেবেন। তীব্র-তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

কোথায় এসেক্স?

উচ্চাশার পাল তুলে দিয়ে যার জীবনতরী উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে, যে তার নিজের স্বপ্ন আর দম্ভ ও গর্বের দুর্গে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করছে সে কি না বিগতযৌবনা রমণীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে? হোক না কেন ইংল্যাণ্ডেশ্বরী।

এল না এসেক্স।

ইতিহাসের স্রোত এবার উজান বইতে লাগল।

আয়ারল্যাণ্ডে এসেক্সের জায়গায় তারই বন্ধু এবং ভগ্নিপতি মাউণ্টজয়কে পাঠানো হয়েছিল। এসেক্সের গোপন প্ররোচনায় মাউণ্টজয় আরও ব্যাপক—

আরও ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল—টাইরনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ আরও নিবিড় করে তুলল। ওদিকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমসকেও খবর পাঠালো—চার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সে আয়ারল্যাণ্ডে প্রস্তুত হয়ে আছে—আপনি যদি একটু হাত মেলান, তাহলে এখুনি সব ওলটপালট হয়ে যাবে। এলিজাবেথকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে আপনার বসতে কোন অসুবিধেই হবে না। বেচারী এসেক্স তার সম্মান প্রতিপত্তি ফিরে পাবে। আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে।

এসেক্সের কপাল মন্দ। যে লোকটাকে দূত করে স্কটল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল, সে ধরা পড়ে গেল। চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সব ফাঁস হয়ে গেল। এলিজাবেথ সব শুনলেন। জানলেন। কিন্তু মুখে চাবি দিয়ে বসে রইলেন। শুধু নিঃশব্দে চারিদিকে আরও সতর্ক এবং খর নজর রাখতে লাগলেন। আর তার বিরুদ্ধে যদি অভ্যুত্থান হয়—তার দমনের সব ব্যবস্থাও করে রাখলেন। সব কিছুই করছেন করতে হয় তাই আর নিজের মনে অস্ফুটস্বরে খেদোক্তি করছেন মিথ্যা—মিথ্যা—মানুষের স্নেহ ভালবাসা সব মিথ্যা—এসবের কোন মূল্যই নেই।

এল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর। এই দিনে এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেছিলেন। ঠিক সেই দিনই এলিজাবেথ একটা চিঠি পেলেন। আর্ল অফ এসেক্সের চিঠি। আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন। নিশ্চয়ই এসেক্স ক্ষমা চেয়েছে, সব দোষ স্বীকার করেছে—করবেই—করতেই হবে। তিনি যে তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি খুললেন এলিজাবেথ। এসেক্সের শেষ চিঠি···কোন উঁচুতে আপনি আমাকে তুলেছিলেন। এখন আমাকে সম্মান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে কাদার ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছেন···চিঠি পড়তে পড়তে এলিজাবেথের চোখ দুটো ফেটে জল এসে পড়ল। কিন্তু চিঠির শেষ দুটো লাইন পড়তেই সেই জলভরা চোখেই ঝিকিয়ে উঠল আগুন—জরা ও বার্ধক্য শুধু আপনার দেহকেই আক্রমণ করেনি, আপনার মনকেও বিকল করে দিয়েছে—আপনাকে করে তুলেছে কুটিল কপট আর স্বার্থপর···

বেইমান—অকৃতজ্ঞ—দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে বললেন এলিজাবেথ। কিন্তু তাঁর আক্রোশ তাঁর ক্রোধ সব—সব ছাপিয়ে কিসের যেন ব্যথায় ভারী—ভারী হয়ে উঠল তাঁর বুক। আর ভেতর থেকে নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ পাক দিয়ে দিয়ে উঠে আসতে লাগল গলার কাছে।

এসেক্সের বাড়িতে চক্রান্তকারী সাউদাম্পটন প্রমুখদের জোর পরামর্শ চলছে—রাণীর প্যালেস দখল করতে হবে। এসেক্স নিজে যাবে রাণীর ঘরে। তাঁকে দিয়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। কে কোথায় দাঁড়াবে—কে কোন অংশ দখল করবে—তার পুরো ছক তৈরি হয়ে গেল। সেই দিনই এসেক্স

মাউণ্টজয়কে খবর পাঠালো—জেমস সাহায্য না করুন, তিনি যেন অবশ্যই সমস্ত সৈন্য নিয়ে লণ্ডনে চলে আসেন।

উচ্চাভিলাষী এসেক্স বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল যে সে কল্পনাও করতে পারেনি। রাণী সব জানেন। তারপরের যে শনিবারটা এল, সেদিন কাউন্সিলে ডেকে পাঠানো হলো এসেক্সকে।

এসেক্স এল তো নাই-ই। উল্টে রাণীর লোকদের দেখেই উন্মাদের চিৎকার করে উঠল—দেখ—দেখ—আমার শত্রুরা আমাকে খুন করতে চাইছে—কিন্তু এলিজাবেথ ইতিমধ্যেই আরও চারজন সশস্ত্র সেনানায়ককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দেখেই এসেক্সের সমর্থক জনতা* চিৎকার করে বলল—মারো—মারো এদের মেরে ফেল—

গোলমাল শুনেই বেরিয়ে এসে এসেক্স তাদের চারজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে বন্দী করে রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাস্তায় নামল। ঘোড়ার পেটে চাবুক মেরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলতে লাগল—রাণী—আপনাদের রাণী ষড়যন্ত্র করে আমাকে মেরে ফেলতে চান—সবাই শোনো—শোনো—

যেতে যেতে হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখল তার অনুগত যারা আসছিল তাদের সেই মিছিল যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে! রাণীর বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের নিজেদের আখের নষ্ট করতে চায় না—

এসেক্সের বুক ভারী হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় আরো এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মাউণ্টজয় নিজে এল না—সৈন্যসামন্তও পাঠালো না। নিজের বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, তার বাড়ি রাণীর সশস্ত্র প্রহরীদের দখলে। পিছনে নদীর ধারের ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে যেই ঢুকলেন অমনি রাণী এবং ধূর্ত মন্ত্রী সেসিলের পাতা ফাঁদে বন্দী হয়ে গেল।

এলিজাবেথ সব শুনলেন। রাণীসুলভ মর্যাদা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার এক জলন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে বসে রইলেন। কত ভয়ের কথা শুনলেন। কত গুজব তাঁর কানে এল—কেউ বলল আয়ারল্যাণ্ড থেকে বিদ্রোহী মাউণ্টজয় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আসছে—সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড থেকে জেমসের সৈন্যবাহিনীও আসছে—একটুও টললেন না রাণী এলিজাবেথ। বিচলিত হলেন না।

ইতিমধ্যে ফরাসীদূত দেখা করতে এলেন এলিজাবেথের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে গমন করে কথাবার্তা বললেন, যেন কিছুই হয়নি। কথায় কথায় এসেক্সের কথা উঠে গেল—

*আয়ারল্যাণ্ডে থাকতেই অনেক লোককে 'নাইট' উপাধি বিলিয়েছিল এসেক্স। তারা স্বভাবতই তার অনুগত ছিল। তাছাড়া আর্ল অফ এসেক্সে ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রীজে লেখাপড়া করেছিলেন। এম. এ. পাসও করেছিলেন। সুঠাম-দেহী দীর্ঘ রূপবান যুবক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করতেন। তাই তার গুণগ্রাহী ভক্ত নেহাৎ কম ছিল না।

কী অকৃতজ্ঞ কী বেইমান বলুন তো? মনের ভেতরে যে বিষ পুরে রেখেছিল তা এতদিনে ফুটে বেরুল, বলেই হাসতে লাগলেন এলিজাবেথ। মুখ ভেংচে নেচে নেচে দেখালেন, কেমন করে এসেক্স রাস্তায় নেমে লোকদের উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছিল। দমকে দমকে হাসতে হাসতেই তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। নিজেকে সংযত করলেন। কিছুক্ষণ কি ভেবে কেমন নিস্পৃহ আর উদাস কণ্ঠে বললেন সে যদি একবার একবার—আমার কাছে আসতো, আমি জিজ্ঞাসা করতাম —কে রাজত্ব করবে?—তুমি না আমি? বলেই হাসতে হাসতে আবার গড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখ দুটোয় জল টলটল করছে। হাসির আলোয় চোখের জলে অন্ধ হয়ে এল তাঁর দৃষ্টি।

ফরাসীদূত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রাণীর দিকে। বাইরে এত হাসির ছটা, কিন্তু চোখে জল কেন? হাসছেন—না কাঁদছেন!

কিন্তু এলিজাবেথ তাঁকে আর কিছু ভাববার সুযোগ দিলেন না। দরকারী আর অত্যন্ত জরুরী কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে তাকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেলেন।

আর্ল অফ এসেক্স বন্দী হলেন।

অত্যন্ত গোপনে তাঁকে লণ্ডন টাওয়ারে আটকে রাখা হলো। সারা শহর কেমন থমথমে। এলিজাবেথের প্রাসাদের চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী। এসেক্সের গুণগ্রাহী ভক্ত তো কম নেই। কখন কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে!

রাণী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। ক্যাপ্টেন লী নামে একটা লোক এসেক্স ও টাইরনের গুপ্তচরের কাজ করতো। সে ঠিক করল এসেক্সকে উদ্ধার করবে। রাত্রে যখন এলিজাবেথ শুধু তাঁর সহচারিনীদের সঙ্গে খেতে বসবেন তখন তাঁকে ঘেরাও করে বাধ্য করবে এসেক্সের মুক্তির আদেশ দিতে। কিন্তু—

ক্যাপ্টেন লীকে আর খাওয়ার ঘর পর্যন্ত যেতে হলো না। তার আগেই প্রহরীরা তাকে জাপটে ধরে বন্দী করে ফেলল। বিদ্রোহীদের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরে এসেক্স ও তাঁর ষড়যন্ত্রের সঙ্গী সাদাম্পটনকে একসঙ্গে বিচার সভায়। এসেক্স এসে দাঁড়ালো সেই পরিচিত উদ্ধত ভঙ্গীতে। সেদিন তার ঘন কালো পোশাকের আড়ালে তাঁর গৌরবর্ণ দীর্ঘ সুঠাম দেহ আগুনের শিখার মত জলজল করছিল।

ষড়যন্ত্র করার অপরাধে যখন নিজের বিরুদ্ধে একটার পর একটা অভিযোগ কিছুকে তাচ্ছিল্য তুড়ি মেরে সব শুনছিল তখন এসেক্স হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল। আবার কখনো বিস্ময়ের ভান করে বড় বড় চোখ মেলে বারকতক ওপরে তাকালো। কিন্তু বিচারে যখন তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো তখন হেসে উঠে ভয়লেশহীন কণ্ঠে বললেন—অত্যন্ত বিশ্বস্তার সঙ্গে মাননীয় রাণীকে সেবা করেছি—তাঁর আদেশ পালন করেছি। এখন যদি তিনি ইচ্ছে

করেন তাহলে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত—

যাঁরা কোর্টে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। কী আশ্চর্য নির্ভীক। জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে এমন অসামান্য রুপবান সাহসী পৌরুষের কি শোচনীয় পরিণাম।

কোর্ট থেকে এসেক্সকে নিয়ে আসা হলো লণ্ডন টাওয়ারে। নির্জন কারাকক্ষে বসে এসেক্স মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি শুনতে লাগলেন।

নির্জন নিস্তব্ধ সেই কারাগারে পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকে আর্ল অফ এসেক্স। আর সাবেকদিনের কত অজস্র অজস্র সুখস্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে যায়। তার যেন মনে হয় রাণীর সঙ্গে তার প্রেমপ্রণয়ের দিনগুলোর স্মৃতি যেন তাকে মিষ্টি গন্ধধূপের ধোঁয়ার মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে।

রাণী এলিজাবেথ।

এখনও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। স্নেহ করেন। কী ক্ষতি হয়— যদি তাঁর কাছে গিয়ে সব দোষ স্বকীর করে—ক্ষমা চায় —

নো—ইমপসিবল দুরভিলাষী, দাম্ভিক, গর্বিত এসেক্স ফুঁসে উঠল, সে কারো কাছে মাথা নিচু করতে পারবে না—করেনি কখনো—করবে না—তার চেয়ে বরং ঘাতকের কুঠারে গলা পেতে দেবে।

বাইরে রাত নামে। অন্ধকার ঘন হয়। প্রাচীন সেই কারাগারের সেই সেলের একটা পোকা ডেকে চলে—চিপ—চিপ চিপ -

নিরুদ্ধ আক্রোশে এসেক্স ছুটে গিয়ে তাকে টিপে মারতে যায়।

এটা কী। হঠাৎ সেলের ঝাপসা অন্ধকারে তার হাতে যে কী ঝকমক করে ওঠে। আরে—

আংটি সেই আংটি—রাণী এলিজাবেথের ভালবাসার অভিজ্ঞান। স্থির অপলক চোখে সেই অঙ্গুরীয়র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনে হলো—মনে হলো এলিজাবেথের সেই কথাগুলো—তোমার জীবনের কোন সঙ্কটজনক মুহূর্তে যদি এই আংটি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, তুমি যত বড় অপরাধ করো না কেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো—একটু থেমে আরও বলেছিলেন, এই অভিজ্ঞান পেলে আমি তোমার ভেতরে কোন দোষ দেখব না—শুধু ক্ষমা করবো—

গুর গুর করে উঠল এসেক্সের বুকের ভেতরটা।

পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা কি রাণীর মনে আছে? লণ্ডন টাওয়ারের এক ওয়ার্ডারের একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে আংটিটা পাঠিয়ে দিল রাণীর কাছে।

রাজপ্রাসাদ থেকে কোন সাড়া এল।

ভুল—ভুল—সব মিথ্যা—মিথ্যা অঙ্গীকার—এসব সেই স্বার্থপর কুটিল বুড়ীর কপটতা!

এল সেই দিন।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী। বুধবার ভোরে লণ্ডন টাওয়ারের ভেতরে এক নির্জন প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল ঘাতক।

এসেক্স তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছিল তার মৃত্যু যেন হয় লোক-চক্ষুর অগোচরে—একান্ত অনাড়ম্বরভাবে। এলিজাবেথও আপত্তি করেননি—সত্যিই তো অহঙ্কারী সেই সুন্দর মানুষটা সকলের সামনে ঘাতকের সামনেই বা মাথা নিচু করবে কেন? কোনদিন যে কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি। তিনি তো তাঁর আভিজাত্য আর মর্যাদাবোধকে অস্বীকার করতে পারেন না।

শেষ রাতের আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন বধ্যভূমিতে বীর পদক্ষেপে এল এসেক্স। আশ্চর্য মর্যাদাসম্পন্ন আর আভিজাত্য তার চলার ভঙ্গীতে। চোখেমুখে কেমন নির্লিপ্ত প্রশান্তি।

এসেক্সের পরনে ছিল ঘনকৃষ্ণবর্ণ পোশাক, মাথায় কালো আচ্ছাদনী। পাশে তিনজন ধর্মযাজক। মাথার টুপী খুলে উপস্থিত লর্ডসদের অভিবাদন জানালো। তারপরেই উদাত্ত কণ্ঠে বলল, সব দোষ, সব অন্যায় আমার—আমি রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলাম। দেশের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।

থেমে গেল সে।

প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল বধ্যভূমিতে।

উপস্থিত জনমণ্ডলী রুদ্ধশ্বাসে দেখছে এসেক্সকে।

আমার বয়স চৌত্রিশ—যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল এসেক্স। বড় দীর্ঘ তার সেই বক্তব্য। কখনো মনে হয়েছিল বুঝি পবিত্র কোন মন্ত্রোচ্চারণ করছে আবার কখনো মনে হচ্ছিল বক্তৃতা করছে।

জীবনের এই চৌত্রিশটি বছর আমি—আমি শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটেছি। লোভ, দম্ভ আর আত্মম্ভরিতায় আমার মন হয়ে গিয়েছিল বিকৃত। সেই বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে অনেক নোংরা এবং হীন কাজ করে শুধু আমার জীবন-যৌবনের অপচয় করেছি। আমার পাপ আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি। আমি প্রভু যীশুকে আবেদন জানাই তিনি যেন মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন—আমার আত্মাকে শান্তি দেন। আমি আমাদের মহিমাময়ী রাণীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি—বলতে বলতে এসেক্সে তার কালো পোশাকটি খুলে ফেলল। তারপর যে কাষ্ঠখণ্ডের ওপরে তার মস্তক ছেদন করা হবে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

ঘাতক তৈরি হলো।

ধর্মযাজকের অনুরোধে এসেক্স অন্তিম প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণ করল। তারপর একবার উঠে দাঁড়ালো। কী অপরূপ রূপবান সুঠামদেহী দীর্ঘকায় যুবক। কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সিংহের কেশরের মত সোনালী চুলের গুচ্ছ। পৃথিবীর সামনে এই তার শেষবারের মত উঠে দাঁড়ানো।

এসেক্স এবার সেই যূপকাষ্ঠের সামনে এসে মাথা নীচু করল। ঘাতককে শান্ত কণ্ঠে বলল আমি যখন হাত দুটো মেলে ধরবো। তখন তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে—

এসেক্স মাথা নীচু করে দেহটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে পড়ল। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো—তারপরে ধীরে ধীরে যূপকাষ্ঠের ওপরে মাথাটি তুলে দিল।

ঈশ্বর তোমার কাছে আমার সকল সত্তা সমর্পিত হোক—এসেক্সের শেষ কথা। এক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

এসেক্স তার হাত দুটোকে প্রসারিত করল। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল কুঠার। প্রথম আঘাত পড়ল। তখনো এসেক্সের দেহে মৃত্যুযন্ত্রণার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। পর পর আরও দুবার আঘাত নেমে এল। দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এসেক্সের নরম সোনালী চুলে ঢাকা রক্তাক্ত মাথাটা তুলে ধরে চিৎকার করে বলল ঘাতক, ঈশ্বর রাণীকে নিরাপদে রাখুন—রাণী দীর্ঘজীবী হোন···

এই সময় দূরে লণ্ডন টাওয়ারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা প্রেতিনীর মত দাঁড়িয়েছিলেন রাজপ্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দে রাজরাজেশ্বরী এলিজাবেথ। তাঁর মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে!

রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতা।

ধ্বনি তুলছে এসেক্সের হত্যার বদলা নেব—

॥ কুড়ি ॥

এলিজাবেথ এবার সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।

কিন্তু কে জানে আশ্চর্য কোন যাদুতে এখনও তারুণ্যের তেজে জ্বলজ্বল করছেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সেই ক্ষিপ্রগতি, দেহমনের আশ্চর্য ঋজুতা, বলিষ্ঠ অথচ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মহিমার কারণ—রাজনীতিতে তাঁর বিস্ময়কর সাফল্য। ধর্ম-আন্দোলনে বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত হতশ্রী ইংল্যাণ্ডকে মধ্যযুগের ইউরোপে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কুমারী জীবন ও তাঁর রূপ যৌবনের প্রলোভনে, অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্যে ও বাকপটুত্বে ফ্রান্স ও স্পেনকে দাবিয়ে রেখেছিলেন।

আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তার আমলেই সমুদ্রপারের দেশে দেশে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার। তাঁর সময়েই উত্তর আমেরিকার জনমান-বহীন ভূখণ্ডে ইংরেজদের বসতিস্থাপন। সেই ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চর সহস্র দুঃসাহসিক ঘটনায় পরিকীর্ণ সেইসব সমুদ্র অভিযানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল ইংরেজদের

অসামান্য সহিষ্ণুতা, বিস্ময়কর দুঃসাহস বিপুল উদ্যম এবং সর্বোপরি তাদের দৃঢ় ঐকতা। সেযুগের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নৌবিদ্যার বিশেষজ্ঞ, বহু সফল নৌযুদ্ধের নায়ক এই অভিযানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। আর রাণী এলিজাবেথ নিজে পৃথিবীর দেশদেশান্তরের সমুদ্র অভিযানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। তাই ইংরেজেরা উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিল এক নতুন ভূখণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে বসতি করেছিল। আর তাঁর আমলেই দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিকরা প্রাচ্য দেশে ব্যবসা করে ইংল্যাণ্ডের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি করার উচ্চাভিলাষে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপকমোরিন প্রদক্ষিণ করে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—সেই ব্যবসাসংস্থাই পর পর তিন তিনটি শতাব্দী ধরে ভারত-ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

তাঁর রাজসভাতেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী বুদ্ধিজীবি যেমন বার্গলে, ওয়ালসিংটন, লিস্টার, উইলিয়ম সেসিল প্রমুখদের উজ্জ্বল সমাবেশ যেমন ঘটেছিল তেমনি ছিলেন মনস্বী বিজ্ঞানী ডি (Dee), হাকলুটস (Hakluyts) এবং হারিয়ট (Hariot)। এই হাকলুট সাহেবই প্রথম লিখেছিলেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ভার্জিনিয়ার বিবরণ—আর এক নতুন পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা।

অবশ্যই বলতে হবে বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক এবং দুঃসাহসী অভিযানকারীদের সঙ্গে ছিল পুঁজিবাদী, ব্যবসায়ী এবং সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত অবস্থার মানুষ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যমের অংশীদার ছিল প্রত্যেকে। তাই রাণী এলিজাবেথের আমলেই সৃষ্টি হয়েছিল—

রেনেসাঁসের যুগ। রাণী এলিজাবেথ ছিলেন রেনেসাঁসের বরপুত্রী। ইংল্যাণ্ডের সেই নবজাগরণ যুগের ধাত্রী মহিমাময়ী এক রমণী সূক্ষ্মরুচিবোধসম্পন্ন উচ্চ-শিক্ষিতা এবং ঈশ্বর-প্রদত্ত অনেক আশ্চর্য সদগুণের অধিকারী এবং সেসব গুণ ঠিক প্রয়োজনের সময় লোকসমক্ষে প্রকাশও করতে পারতেন। তাই তো ধর্ম আন্দোলনে, যুক্তিবোধে মানবতাবাদে এবং এগিয়ে চলার দুর্মর আবেগে উত্তাল তাঁর রাজত্বকালে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সুদক্ষ নাবিকের মতই রাষ্ট্রতরীকে নির্ভুল লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন।

তাঁর আমলেই সাহিত্যসংস্কৃতিরও বিস্ময়কর বিকাশ হয়েছিল। যেন আলো-কোজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা করে এগিয়ে এসেছেন সারে, স্পেন্সর, মার্লো, বেকন, ফ্লেচার, রেমণ্ট, সার্লে এবং ওয়েবস্টার—আর সেই মিছিলের পুরোভাগে—সেক্সপীয়র।*

* সেই উচ্চাভিলাষী, উদ্ধত দীর্ঘদেহী রূপবান যুবক, এলিজাবেথের শেষ প্রেমিক আর্ল অফ এসেক্সের জীবনকে অবলম্বন করেই সেক্সপীয়র রচনা করেছিলেন হ্যামলেট। রাজপ্রাসাদের ভেতরেই অ্যাজ ইউ লাইক ইটের অভিনয় হয়েছিল।

নাটক, কাব্য, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ সমালোচনা যেন ঝরনার মত অবিরল ধারায় নেমে এসেছিল। সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য। তাঁর আমলেই ইংল্যাণ্ডের সরস্বত সাধনা সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল। রেনেসাঁসবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক র‍্যালেও বলেছেন এলিজাবেথীয় যুগের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে এবং সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য সেই প্রভাব ছিল এত শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী যে চারশো বছরের ব্যবধানে এসেও ইংল্যাণ্ডের বর্তমান প্রজন্মের জীবনচর্যায় লক্ষ্য করা যায় এলিজাবেথীয় যুগের ধ্যানধারণারই সুস্পষ্ট আভাস। যে বাড়িতে তারা বাস করে, যে ভাষায় কথা বলে, যেসব জিনিস তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োজন হয় এমন কি ইংরেজরা ছবিতে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের নমুনা তৈরি করে সে সবকিছুর ভেতরেই আছে এলিজাবেথীয় যুগের ঐতিহ্য।

কিন্তু প্রদীপের নীচেই থাকে অন্ধকার।

যিনি জীবিতকালেই কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন যিনি স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন আর নবজাগরণের উদ্দাম বাতাসে ইংল্যাণ্ডের অনাগত বহু প্রজন্মকে অনেক—অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী এলিজাবেথ কিন্তু বাইরে তাঁর রাণীর মর্যাদা ও আভিজাত্য এবং আনুষঙ্গিক ঠাটঠমক বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে কেমন দুর্বল আর অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

তাঁর মনের ভেতরে দাঁড়িয়ে যে সেই দুর্দান্ত, চঞ্চল অপরিণামদর্শী উদ্ধত ছেলেটি দিবানিশি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে তো কিছুতেই সরাতে পারেন না। যার উদ্দাম উচ্ছ্বল ব্যবহারে তিনি নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখতেন, দেখতে ভালবাসতেন সেই এসেক্স চিরকালের মত লণ্ডন টাওয়ারের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তিনি নিজের হাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ভাবতেও কষ্ট হয়। যৌবনের দুর্দান্ত সেই প্রতীক এসেক্সের যখন যেখানে আবির্ভাব ঘটেছে তা সে রাজসভাতেই হোক কি পরিষদের জরুরী অধিবেশনই হোক বা তাঁর নিভৃত শয়নকক্ষেই হোক সেখানকার বাতাস আলোড়িত হয়ে উঠেছে। সেই এসেক্সকে হারিয়ে গোটা ইংল্যাণ্ডের জনজীবনও যেন আড়ষ্ট ব্যথায় স্তব্ধ

লর্ড চেম্বারলেনের নাটুকে দলের অন্যতম দক্ষ অভিনেতা হিসেবে সেক্সপীয়র নিজে রাজা চতুর্থ হেনরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় দেখে খুশি হয়ে এলিজাবেথ সেক্সপীয়রকে দস্তানা উপহার দিয়েছিলেন। সেই দস্তানা দ্রুত রাণীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ। কিন্তু নাটকের মহানায়ক চতুর্থ হেনরীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর দস্তানা নিতে সঙ্কোচ হয় (রাণী ছিলেন চতুর্থ হেনরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী) And though now bent on this high embassy yet stoop to take up cousins glove.

হয়ে গেল। কেন যেন তাঁর মনে হলো—না না—যেদিন গেছে তা আর ফিরবে না। এবার বুঝি তাঁর এলিজাবেথীয় অধ্যায়টি শেষ হতে চলল! তিনি যেন শেষ বিদায়ের বহু—বহু দূরাগত সঙ্কেত ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।

হঠাৎ যেন ঝড়ো বাতাসে ফর ফর করে উড়ে গেল অতীতের অনেক—অনেক-গুলো পৃষ্ঠা। উড়ে গেল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে—

জন্মলগ্ন থেকেই যেন অভিশাপ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। পিতা অষ্টম হেনরী যখন আকুল হয়ে প্রার্থনা করছেন। I Pray Jesus send me a son—a prince…ঠিক তখন মা বাবার এবং গোটা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে পিতা আর্তনাদ করে উঠে ছিলেন—এবারও মেয়ে। মা অ্যানবলিন দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন।

অবাঞ্ছিত সন্তান। তাই অনাদর আর অবহেলার ভেতরেই তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর মনে হল—কিছুই তিনি করেননি। করতে পারেননি। তিনি বঞ্চিত—নির্মমভাবে বঞ্চিত। স্নেহ প্রেম ভালবাসার এই পৃথিবীতে তিনি যেন এক অভিশপ্ত প্রেতিনী। তাঁর প্রেমের তাঁর ভালবাসার মূল্য কেউ দেয়নি। না এসেক্স—না টমাস সেমুর! আর অ্যালেনকন ও ডাডলি লিস্টার এবং যারা ভালবেসেছিল তাদের তিনিই ভালবাসতে পারেন নি। সম্রাজ্ঞীর অহঙ্কার আর আভিজাত্য ও রাজ্যশাসনের কঠোর কর্তব্য দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেক—অনেক বাধার প্রহরীরা তাঁকে যাবজ্জীবন বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু—

টমাস সেমুর। তাঁর প্রথম প্রেম। প্রথম ভালবাসার অভিশাপ। আর সেই অভিশাপের জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। প্রেম ভালবাসা সম্বন্ধে তাঁকে করে তুলেছিল সতর্ক আর সাবধানী। কিন্তু সেমুর যখন তাকে নাড়া দিয়েছিল তখন সবে তের ছাড়িয়ে চোদ্দতে পা দিয়েছেন। মেয়ে পুরুষের প্রেম-ভালবাসা এবং দৈহিক সংসর্গ সম্বন্ধে কোন বোধই হয়নি।

কিছু অভিজ্ঞতা হলো—রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অষ্টম হেনরী মারা যাওয়ার পর ত্রিশটা দিনও ধৈর্য ধরতে পারলেন না ক্যাথারিন পার—তাঁর শেষতমা পত্নী। যে মহিলা আগে তিন তিনটি স্বামীকে কবরে পাঠিয়েছেন তিনি এবার টমাস সেমুরকে বিয়ে করে বসলেন! এবার অন্দর মহলে সেমুরের গতিবিধি অবাধ হয়ে উঠল। তাঁর রমণীরঞ্জন সুন্দর চেহারা মেয়েদের আকর্ষণ করতো। কে জানে হয়তো তাঁর সেই উথালপাথাল বয়সে তাঁর মনেও ঢেউ তুলেছিল লোকটা। যখন-তখন তাঁর ঘরে ঢুকে পড়তো সেমুর। হয়তো শুধু নাইটগাউন পরনে কিম্বা লেপের নিচে শুয়ে আছেন—সেই লেপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তার যৌবনচিহ্নের জায়গাগুলোতে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিত। আর অনাস্বাদিত ও রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতিতে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত। কিন্তু—

তাঁর গভর্ণেস ক্যাটে অ্যাসলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। তাঁর প্রায় পিতার বয়সী সেমুরের এই অশোভন ব্যবহারে শঙ্কিত হতেন। একদিন সেমুরকে আড়ালে ডেকে বলেওছিলেন—আপনি কী মেয়েটার সর্বনাশ করতে চান? এলিজাবেথের যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমি কিন্তু কাউন্সিলে সব বলে দেব—

মিসেস অ্যাসলে ক্যাথারিনকেও নালিশ করেছিলেন। তিনি একটি কথাও বলেননি। বলার আছেঃ বা কি। তিনি নিজেই তো অষ্টম হেনরী জীবিত থাকতেই এলিজাবেথকে সেমুরের কাছে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজের চোখেও কত দিন—কত সময় দেখেছেন তাঁরই স্বামী টমাস সেমুর নয়ালী যুবতী এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন কিম্বা দুই হাতের ওপর তাঁকে শুইয়ে চুমুতে চুমুতে তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছেন।

ক্যাথারিন মারা গেল। পথের কাঁটা সরে গেল। এবার সেমুরের মাথায় জেগে উঠল বহুদিন ধরে পরম যত্নে লালিত সেই ধূর্ত কুটিল দুরভিসন্ধি—বালক নৃপতি এডওয়ার্ডের দপ্তরে এল একটা বেনামী চিঠি—

"আপনি জানেন না আপনার রাজঅন্তঃপুরে ব্যভিচারের স্রোত বয়ে চলেছে। মহামান্য সম্রাট ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, যা ঘটনা, যা ঘটতে চলেছে আমি শুধু সেটুকুই বলছি, আপনার দিদি কুমারী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাজ্ঞী মা হতে চলেছেন। তাঁর গর্ভে টমাস সেমুরের সন্তান—She was with a Chid by Admiral Seymur…

চিঠি পেয়েই প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল রাজপ্রাসাদে।

বালক রাজা এডওয়ার্ড (রাজত্বকাল ১৫৪৭ থেকে ১৫৫৩) তখন মাত্র দুই বছর, তিনি আর কি করবেন, বুঝবেনই বা কি। পরিষদ বা কাউন্সিলে কিন্তু ঝড় বয়ে গেল। লণ্ডনের আকাশে বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ল সেই মুখরোচক কলঙ্কের কথা—কুমারী এলিজাবেথ অন্তঃসত্ত্বা…

হ্যাটফিল্ডের রাজপ্রাসাদে বসে তাঁর কানেও এল কথাটা—সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় রি রি করে উঠল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আর মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল জলের স্রোত হু হু করে বয়ে গেল। মুহূর্তে নিজেকে সংযত করলেন। মহামান্য সম্রাটকে চিঠি লিখতে বসে গেলেন—ঐতিহাসিক চিঠি—এখনও তাঁর তারিখ মনে আছে—

মহামাননীয় সম্রাট ২৮ জুন ১৫৪৯

আপনার শুভবুদ্ধি এবং মানবতাবোধের কাছে করুন আবেদন জানাচ্ছি। হয়তো আপনি শুনেছেন আমার নামে একটা ভয়ানক কলঙ্কের গুজব বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই ন্যক্কারজনক অপবাদ এবং দুর্নাম আমার চরিত্র এবং সম্মান ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে—Greatly against my Honour and

Honestic (which above all othor things esteem) আমি না কি লণ্ডন টাওয়ারে লর্ড অ্যাডমিরাল টমাস সেমুরের ঔরসজাত সন্তান কোলে নিয়ে বসে আছি—

মাই লর্ড এত বড একটা মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা আমার ওপরে চাপিয়ে আমার সম্মান এবং মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে। আমি এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আপনার কাছে আবেদন রাখছি। আপনাকে আমার জন্য বেশিকিছু করতে হবে না—আপনি শুধু আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অন্তত একবার—মাত্র একবার সুযোগ দিন। আমি আপনার রাজসভায় গিয়ে আপনার এবং সভাসদদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই—দেখাতে চাই আমি সেই কুমারী এলিজাবেথই আছি। প্রয়োজন হলে ধাত্রীবিদ্যাবিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষাও করতে পারেন। তিনিও দেখবেন আমার দেহে সন্তান ধারণের কোন চিহ্নই নেই—

অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং বিচলিত মন নিয়ে হ্যাটফিল্ড থেকে খুব তাডাতাড়ি এই চিঠি লিখছি—অতিদ্রুত আপনার উত্তর পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো—ইতি আপনার দিদি—

এলিজাবেথ

রাজসভা বা সম্রাটের রিজেন্টের কাছে থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না—

আশ্চর্য তার কলঙ্কের পক্ষে কি বিপক্ষে কেউ একটা কথা বলল না। বলল না তাঁকে কেউ একটা সান্ত্বনার কথা কিম্বা কারো কণ্ঠে প্রতিবাদের একটি কথাও উচ্চারিত হলো না। তাঁকে কেন্দ্র করে কোন শোকতাপ কি বিক্ষোভ যেমন নেই, তেমনি নেই কোন সমবেদনা বা সহানুভূতির চিহ্ন। যেন তাঁর কোন অস্তিত্বই নেই কোথাও! চোখ দুটো ফেটে তাঁর জল এসে পড়ল।*

বাধ্য হয়েই মাঁ-ক্যাথারিন পারকে চিঠি লিখল। একই বক্তব্য। কিন্তু এই

* টমাস সেমুরকে জড়িয়ে তাঁর এই কলঙ্কের সত্য কি মিথ্যা যাই হোক ইতিহাসে কিন্তু আছে এলিজাবেথের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। লজ্জা, সঙ্কোচ, অসম্ভব মানসিক চাপ তাঁর চেতনাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল। পর পর চার চারটি বছর ধরে তাঁর স্বাস্থ্যের এমন অবনতি হয়েছিল যে মানসিক বিকারও দেখা গিয়েছিল। Complete breakdown of the nerves and body and her physique reacted the brain—Frederick Chamberlin. Private Character of Elezabeth.

জানা দরকার বেনামী চিঠি লিখিয়েছিল টমাস সেমুর ট্রাইহুইট নামে তার এক অনুচরকে দিয়ে। ট্রাইহুইট নিজেই সম্রাটের দরবারে সে চিঠি পৌছে দিয়ে হাটে বাজারে পথেঘাটে বলে বেড়াচ্ছিল—কুমারী এলিজাবেথ মা হয়েছেন।…বলাবাহুল্য এসবই সেমুরের চক্রান্ত।

চিঠি পাওয়ার কিছুদিন বাদেই তিনি মারা গেলেন—

ম্যাডাম আমি কি আসতে পারি ? ফরাসী রাজদূত দরজায় উঁকি দিলেন'।

থমকে দাঁড়ালো এলিজাবেথের চিন্তাস্রোত। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বললেন—আসুন আসুন—

কথায় কথায় ফরাসী দূত বললেন—আপনার তো পৃথিবীর দেশদেশান্তরে দারুণ প্রশংসা—

কেন—কি হলো ? স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, আবার কি অন্যায় করলাম।

না—না ম্যাডাম, কোন অন্যায় নয়—এসেক্সের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে আপনি অসীম মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন—বিদেশের দরবারে আপনার ব্যক্তিত্বের—

ওসব কথা বলবেন না, কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন কণ্ঠে যেন বহু বহু দূর থেকে বললেন এলিজাবেথ, জানেন কোন উপায় থাকলে আমি এসেক্সকে প্রাণদণ্ড দিতাম না। কিন্তু—থেমে গেল এলিজাবেথ। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠল কান্নার ঢেউ। মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কেমন ঝাপসা গলায় বললেন, কিন্তু আমার তো হাত পা বাঁধা। জানেন সব ক্ষমা করা যায় কিন্তু রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহীকে কখনো—কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না—বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। গম্ভীর ব্যথায় উজান ঠেলে আর একটা কথাও বলতে পারলেন না। আবার যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বললেন, কেন—কেন যে এসেক্স রাজবিরোধী কাজ করতে গেল—

এসেক্সের কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে যেতেন এলিজাবেথ। কিন্তু কখনো এসেক্সের মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে অনুতাপ করে একটা কথাও বলেননি। নিজের হাতে চরমদণ্ড দিয়েছিলেন বলে কখনো প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেননি। তাই তখনকার এক রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন—She is only a king…she only knows how to rule…

ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের পরিবেশ যেন কেমন আরও নিথর নিস্তব্ধ হয়ে এল। এলিজাবেথ চুপচাপ চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাবেন। বুকের ভেতর থেকে সেই জগদ্দল পাথরটাকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না—না কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই চঞ্চল দুর্দান্ত অপরিণামদর্শী ছেলেটাকে—"জানেন মসিয়ো এ জীবনে আমার আর কোন আসক্তি নেই—দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই কথাটা প্রায়ই বলতেন ফরাসী রাজদূতকে—আমি বড় ক্লান্ত—অবসন্ন…

তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছিল আস্তে আস্তে। যেন পা টিপে টিপে চারদিক দেখেশুনে বেশ রয়েসয়ে তাঁর মৃত্যু এসেছিল। কিন্তু—আশ্চর্য তখনো তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। তাঁর সত্তর বছর পূর্তির দিনে তিনি কিছু জরুরী ফাইল দেখলেন। নোট দিলেন। তারপরেই হোয়াইটহলের সেই বলরুমে উদ্দামগতিতে নাচলেন। রাজদূতরা অবাক হয়ে তাঁর নাচ দেখেছিলেন।

তারপরেই কিন্তু তাঁর উদ্দাম প্রাণপ্রাচুর্যে ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। সময়

সময় যেন দপ করে জলে উঠতো তাঁর জীবনীশক্তি। এ যেন তাঁর স্বাস্থ্যের অদ্ভুত খেয়ালীপনা। আবার সেই রঙ্গরসিকতা, আবার সেই উচ্চারিত খিল খিল করা হাসির তীব্র শব্দ হোয়াইটহলের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে যাওয়া। সব চলতে লাগল সাবেকদিনের মত। কিন্তু—

দু-একদিন যেতে না যেতে হঠাৎ গভীর শোকের মত নেমে আসে নিথর স্তব্ধতা। এলিজাবেথের মনে জীবনের সবকিছুর ওপরে তীব্র বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। গভীর ব্যথার ছায়া থমথম করে তাঁর মুখে। মনে হয় তাঁর ভেতরে ভেতরে যেন নিঃশব্দ কান্না ঝরছে। একটা ভয়াবহ শূন্যতার ভেতরে তিনি সব সময় বসে থাকেন একা—একেবারে একা। যেন বসে থাকেন মহাশ্মশানের অঙ্গার আর ভস্মের ভেতরে।

এলিজাবেথের জীবনীকারদের অনেকেরই ধারণা—বৈদেশিকনীতিতে রাজ্যশাসনে তাঁর বিপুল সাফল্যই তাঁর ভেতরে প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল আর তখন থেকেই নির্জন একাকীত্ব তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। আর সেই একক জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

মনে হতো কোন ভয়ানক দুঃস্মৃতির তীব্র প্রতিক্রিয়া চলছে তাঁর মনের ভেতরে। তাই সারাজীবন ধরে যা সঞ্চয় করেছেন, সব—সব কিছু ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চাইতেন। তাঁর শেষের দিকের আচার-আচরণের ভেতরে অদ্ভুত একটা বিকার দেখা গিয়েছিল। এইরকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা নিয়ে তিনি অদ্ভুত এক রাজকীয় উদাসীনতায় যেন তাঁর সত্তাকে, মনকে মেলে ধরেছিলেন তাঁর সহচরীদের কাছে রাজদূতদের কাছে এবং সেই বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীর কাছে, যিনি তাঁর বই দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন আর সকলের কাছে যাঁরাই তাঁর কাছে আসতো। কিন্তু—

যাই করুন, কথা বলতে বলতেই কেমন আনমনা হয়ে পড়তেন আর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীর শোকে বিপর্যস্ত মানুষের মত অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলতেন শুধু একটা কথা—

এসেক্স।

তারপরেই একদিন তিনি ঘোষণা করে দিলেন কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। হাত দুটো ঝাঁকিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করে সহচরীদের কাছে বলেন—বেশীর ভাগ লোকই বড় ফালতু বকবক করে···থেমে গেলেন। তাঁর মনে হলো নিজের মনের গহনের ব্যথা বেদনাকে বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে কি হবে? তাতে মর্যাদা ডিগনিটি খর্ব হয়। সবচেয়ে ভালো—একা—একেবারে একা থাকা—

হ্যারিংটন, এলিজাবেথের এক নাতি এলেন দেখা করতে। ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, কী করুণ পরিণতি। কী মানুষ কি হয়ে গেছেন দেখলে দুঃখ হয়—

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। এলিজাবেথ দুর্বল আরো অবসন্ন হয়ে পড়লেন। কথা বলতে বলতে ভুলে যান কি বলছেন। সময় সময় কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর এক সভাসদকে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, জন, আপনি কখনো

কোন বিদ্রোহীকে দেখেছেন, বলতে বলতেই তাঁর শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল। বহু—বহুদূর থেকে অস্ফুট স্বরে বললেন, আমার মন বলছে আপনি কোথাও না কোথাও সেই রাজদ্রোহীকে নিশ্চয়ই দেখেছেন—বাদবাকী কথাগুলো আর বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এল আর তখুনি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ফেললেন বুকের ভেতরে।

হ্যারিংটন সাহেব দু'একটা ছড়া শুনিয়ে দিদিমার মনটাকে একটু হালকা করতে চেষ্টা করলেন। তাঁকে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ। কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা কণ্ঠে বললেন, সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন কি এসব ভালো লাগে বাবা—আমি—আমি ফুরিয়ে গেছি হ্যারিংটন আমি শেষ হয়ে গেছি···আমি এখন অতীত—নিস্তব্ধ শয়নকক্ষে তাঁর কথাগুলো যেন বুকফাটা হাহাকারের মত শোনালো।

নতুন বছর এল ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। এলিজাবেথ চনমন করে উঠলেন। কে জানে কোন যাদুতে আবার দপ করে জ্বলে উঠল তাঁর জীবনশক্তি। বার্ধক্যের একেবারে প্রান্তে এসেও তাঁর তেতরে যেন নতুন করে প্রাণের আবর্ত ভেঙে ভেঙ্গে পড়ল। আবার সেই নাচে গানে হাসিতে মুখর করে তুললেন হোয়াইটহল। লোকলস্কর পাত্র-মিত্র নিয়ে চলে গেলেন রিচমণ্ডে হাওয়া বদলাতে।

সেদিনটা ছিল মেঘে ঢাকা। টিপ টিপ বৃষ্টি। ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাওয়া। সেই আবহাওয়ায় কিনা এলিজাবেথ বেরিয়ে পড়লেন পাতলা একটা সিল্কের জামা পরে। পারিষদরা ভাবলেন তাঁদের মাননীয়া প্রিয় সম্রাজ্ঞী বুঝি জরা ও বার্ধক্যকে অগ্রাহ্য করতে চান। কিন্তু—

যা হওয়ার তাই হলো। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর দৈহিক শক্তি যেন কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল। না—অসুখের তেমন কোন লক্ষণ ছিল না। শুধু দুর্বলতা—অপরিসীম দুবলতা আর সেই ফিজিক্যাল উইকনেস যেন দিনে দিনে ক্রমশ বেড়েই চলেছিল—Growing physical weakness···মন জুড়ে গভীর হতাশা। কোন ডাক্তারকে কাছে আসতে দিতেন না। ওষুধ খাওয়াতে এলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। কিছুই খেতে চাইতেন না। দিন রাত শুধু নিচু চেয়ারে বসে থাকতেন। আর কিসের যেন বিষণ্ণ চিন্তার ভেতরে তলিয়ে যেতেন। এই অবস্থায়—

এলেন এক ভিজিটর। লেডি নটিংহ্যাম। নটিংহ্যাম ছিলেন পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, এসেক্সের পরম শত্রু। কথায় কথায় বললেন লেডী নটিংহ্যাম—অনেকদিন ধরে একটা কথা বলবো বলবো করেও বলা হয়নি—একটু থেমে ঢোক গিলে বললেন, আপনি যে এসেক্সকে আংটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটা আপনার কাছে পাঠানোর জন্য দিয়েছিল, সেই আংটি আমার হাতে পড়েছিল—আমি সেটা চেপে রেখে—

কী! মর্মতন্তু ছিঁড়ে ককিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মৃত্যুপথযাত্রী এলিজাবেথ। নিষ্প্রভ দুটো চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগুন। তারপরে অসহ্য—অসহ্য একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে উত্তপ্ত কঠিন গলায় বললেন,

ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন, আমি কিছুতেই করবো না—

ঠিক সেইদিন থেকেই এক দুঃসহ সঙ্কট ঘনিয়ে এল—অনেক কষ্টে কোন রকমে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন এলিজাবেথ, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। আকুল হয়ে ডাকছেন পরিচারিকাদের। তারা ধরাধরি করে চেয়ারে বসিয়ে দিতে চাইলেও আর কিছুতেই বসছেন না তিনি। নিশ্চল পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকছেন। আশেপাশের লোকরা বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দেখছেন সেই মর্মান্তিক দৃশ্য! তিনি জানতেন—একবার—একবার চেয়ারে বসলে আর কিছুতেই উঠতে পারবেন না। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েই থাকতেন—আর সেটাই তো ছিল তাঁর একান্ত প্রিয় অভ্যাস—Fabourite posture।

তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন। তাঁর সেই অফুরন্ত দুর্বার জীবনীশক্তি দিয়েই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলেন। পুরো এক পক্ষকাল চলেছিল সেই সংগ্রাম।

হঠাৎ একদিন রাণীর মহিমায় ঘোষণা করলেন আর তিনি বিছানায় যাবেন না। সেই যে চেয়ারে বসলেন বসেই রইলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রাহীন নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি। নির্বাক। নিস্পন্দ। শুধু তাঁর মুখের ওপর একটা আঙুল চাপা দেওয়া আর তখুনি কেমন ভূতুড়ে গা-ছমছম-করা পরিবেশ নেমে এল রাজপ্রাসাদে। হু হু বাতাসে কার যেন বুকফাটা কান্না আর হাহাকার বেজে যেতে লাগল। আর—

ঠিক সেই সময়—সেই নিশিরাতে মুমূর্ষু রাণী এলিজাবেথের শয়নকক্ষে কতগুলো এমন ভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল যার কোন ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।

রাণীর এক পরিচারিকা চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাতাস করছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে পাখাটা মাটিতে পড়ে গেল। নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আর্তনাদ করে উঠল—উঃ গড ভয়ে বিবর্ণ হয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

কি ব্যাপার!

অনেক কষ্টে বলল, সে স্পষ্ট দেখেছে চেয়ারের নীচে রাণীর রোগজীর্ণ শীর্ণকায় মূর্তিটার একটা ছবি পেরেক দিয়ে আটা!

আর একজন সহচরী অল্পক্ষণের জন্য রাণীর ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে গ্যালারীতে গিয়েছিল। ফেরার সময় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই দেখল রাণীর একটা কালো ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ঝড়ের বেগে করিডোর পেরিয়ে ঘন অন্ধকারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ভয়ে ককিয়ে চিৎকার করে উঠল।

রাণীমা চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের বারান্দায় এসেছেন। এবার আর এক ধরনের ভয় তাঁকে জাঁকিয়ে ধরল। টলতে টলতে ঘরে ফিরে এসে দেখল, এলিজাবেথ যেমন বিছানায় শুয়েছিলেন তেমনি নিস্পন্দ আর অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। মুখের ওপরে একটা আঙুল চাপা দেওয়া—ঠিক যেমন দেখে গিয়েছিল।

কিন্তু এই গোল ছোট চেয়ারটায় রাণী কতক্ষণ—কতদিন বসে থাকবেন।

যেমন করে হোক ওকে লম্বা করে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে—ডাক্তার পরামর্শ দিলেন।

হার ম্যাজেস্টি—তাঁর সামনে ঝুঁকে বিশিষ্ট সভাসদরা অনুরোধ করলেন—চলুন বিছানায় আরাম করে শোবেন—ডাক্তারদের কথা শুনুন—ওষুধ খান—

কোন কথা বললেন না। সম্রাজ্ঞীর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল।

শেষ পর্যন্ত সিসিল সাহস করে কড়া গলায় বললেন—আপনাকে বিছানায় যেতেই হবে ম্যাডাম। একটু থেমে আবার ঘোষণা করার মত করে বললেন—চিৎকার করে—হার ম্যাজেস্টি—সাধারণ প্রজাদের—আপনার বহুদিনের সহকর্মী সভাসদদের সুখী করার জন্যই আপনার বিছানায় যাওয়া উচিত—

কোন লাভ হলো না। সিসিল যেন বহু—বহুদূরের এক অজানা গ্রহের বাসিন্দাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন। তিনি এক চুল নড়লেন না। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর গান শুনতে ইচ্ছে হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজসভার গায়ক বাজনদাররা যে যার ইনস্ট্রুমেণ্ট নিয়ে হাজির হয়ে গেল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মুখে চাপা বিষণ্নতা থমথম করছে। কী গান আর গাইবে—গাইতে পারে তারা মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে? তারা ঈশ্বরের অপার মহিমার গুণকীর্তন করে গান শুরু করলেন।

এলিজাবেথের শুকনো মুখে ম্লান হাসির আভা যেন ঝিকিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। মনে হলো যেন নিষ্ঠাবতী আবাল্য প্রোটেস্টাণ্ট রাণী এলিজাবেথের ধর্মের ওপরে টানটা আজও রয়ে গেছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বিরক্ত হয়ে গান থামাতে নির্দেশ দিলেন। রাজনৈতিক নানা জটিলতায় ভরা কঠিন বৈষয়িক মনে ঈশ্বরচিন্তা সহজে স্থান করে দিতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে চ্যাংদোলা করে বিছানায় নিয়ে আসা হলো। সেসিল এবং অন্যান্য পরিষদের সভ্যরা তাঁর শয্যায় নুয়ে পড়ে বললেন—বলুন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে—সাকসেসর কে? বলুন হার ম্যাজেস্টি—বলুন তানা হলে যে রাজতন্ত্রের ধারাটা স্তব্ধ হয়ে যাবে—

কোন কথা বললেন না এলিজাবেথ। অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন।

ওদিকে দ্রুত—বড় বেশি দ্রুত অন্তিমসময় এগিয়ে আসছে। যদি রাণীর অনুমোদন না পাওয়া যায় তাহলে তো ক্রাউনের কোন ব্যবস্থাই করা যাবে না। রাজ্যময় শুরু হয়ে যাবে অরাজকতা, রাষ্ট্রবিপ্লব—আর ভাবতে পারলেন না সেসিল।

স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস? উঁচুগলায় মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সেসিল। পরিষদের অন্যান্য সভ্যরা রুদ্ধশ্বাসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথের দিকে। তাঁর শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগে যে তাঁকে উত্তরাধিকারীর নির্দেশ দিয়ে যেতেই হবে—রাজনীতি বড় কঠোর—বড নিষ্ঠুর।

স্কটল্যাণ্ডের নৃপতি ষষ্ঠ জেমস?

এইবার—এইবার যেন সেসিলের মনে হল আস্তে আস্তে রাণী মাথাটা নাড়লেন

সেসিলের মনে হল সম্মতি জানালেন তিনি। তারপরেই যে আঙুল দিয়ে বহু বহু চমকপ্রদ রাজকীয় আদেশ দিয়েছেন সেই তর্জনী তুলেই শেষবারের মত সম্রাজ্ঞীর মত ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তার দিদি মেরীর পুত্র স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস—

ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ বয়োবৃদ্ধ হুইটসিফট, যাঁকে যৌবনের আনন্দে টলোমলো দিনগুলোতে আদর করে এলিজাবেথ বলতেন —আমার ছোট্ট কালো স্বামী —মাই লিটল ব্ল্যাক হাজব্যাণ্ড! তিনি অন্তিমকালীন প্রার্থনা শুরু করলেন। রাণীর শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আকুল হয়ে দীর্ঘ—সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

মনে হলো যেন এলিজাবেথের রোগজীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানা যেন মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একবার বুঝি বয়সের ভারে অশক্ত হাঁটু দুটো টনটনিয়ে উঠতেই হুইটসিফট প্রার্থনা থামিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ তাঁকে নিষেধ করলেন।

সম্রাজ্ঞীর আদেশ। অতএব প্রার্থনা করে যেতেই হলো। অনেক—অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। গভীর রাত্রে তিনি মুক্তি পেলেন। দেখলেন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছেন রাণী। তিনি ঘুমিয়েই রইলেন। দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলেছিল। অন্ধকার শীতজর্জর রাত্রির একেবারে শেষপ্রহর পর্যন্ত রাণী ঘুমিয়ে রইলেন। এল—

২৫ মার্চ, ১৬০৩।

ভোরের আবছায়া আলোয় মনে হল এলিজাবেথ নড়াচড়া করছেন। উদ্বিগ্ন সভাসদরা ঝুঁকে পড়লেন। আর আরও একবার নতুন করে উপলব্ধি করলেন —চিররহস্যময় সেই স্পিরিট বা আত্মা অনেক—অনেক আগেই রাণীকে ছেড়ে তাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনো অজানা লোকে চলে গিয়েছে। শয্যায় অবলীন হয়ে আছে এলিজাবেথের রোগজর্জর ক্ষীণ দেহটার শুধু বিকৃত কাঠামোটা!

পাশের ঘরে সেক্রেটারী একা বসে রাণীর মৃত্যুকালীন বিবরণ লিখে চলেছেন সবশেষে লিখলেন—রাণীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই এল সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। অনন্তলোকের যাত্রী সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ শেষ যাত্রার আগেও রাজকীয় মহিমায় নির্দেশ দিয়ে শুধু যে দুটো দেশ দুটো জাতি—ইংলাণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডকে নিবিড় সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করলেন তা নয় টেমস নদীর অফুরান স্রোতের মতই ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের অবিরাম প্রবাহকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। তাই—

এলিজাবেথ শুকনো বিবর্ণ ইতিহাসের কোন সাদামাটা সম্রাজ্ঞী নন, ইংল্যাণ্ডের চলমান সমাজজীবনে উদ্দাম প্রাণশক্তির প্রতীক হয়ে যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।